রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়

প্রথম খণ্ড

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

আত্মজা
লপিতা বসু-কে

এই লেখকের

কাব্যগ্রন্থ : কয়েকটি সনেট
আজন্ম
জীবন-সম্পর্কিত
ঘুম ভাঙার গান (৫ম সংস্করণ)
সনেট-শতক

উপন্যাস : পুষ্পলাবী
অচেনা
আড়াল

নাটক : রায়

ছোটদের জন্য : গণ্ডীর ভেতর
দেশেব ডাক
খুন হবার পর

প্রবন্ধ : আধুনিক বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি
কাব্য-পবিচয়
অলংকার-জিজ্ঞাসা
বাংলা ভাষাব ভূমিকা

সম্পাদিত গ্রন্থ : কবিতা-শতক
শতেক-কবিতা
বারোভূতের গল্প

গোড়ার কথা

রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির যেমন বিস্তৃত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আছে, তাঁর কবি-জীবনের পরিণাম-পর্যায়ের প্রত্যেকটি কবিতার সেরকম আলোচনা নেই। অথচ কবির জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি যত কবিতা গান লিখেছেন, তাঁর জীবনের অন্য কোনো দশ বৎসরে এই প্রাচুর্য দেখা যায় নি। এই শেষ দশ বছরের কাব্যে তিনি একটি বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব দান করেছেন,—কবি কাব্য এবং দর্শনকে একীভূত করেছেন। কবি দার্শনিক-কবি হয়ে উঠেছেন। অথচ কাব্যের চমৎকারিত্ব স্বল্পমাত্রায়ও অনুপস্থিত হয় নি। কবির দার্শনিক সত্তার স্বরূপ কি, মননধারার রূপমূর্তি কেমন, দার্শনিক কবি বলার যথার্থ কোনো মানে হয় কিনা—এসব বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় এবং পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ গুণী সমালোচকেরা কেন জানি না, এড়িয়ে গেছেন, সংক্ষেপেই সে দায়িত্ব পালিত হয়েছে মাত্র। বিশেষজ্ঞেরা রবীন্দ্রকাব্যভূমির এই এলাকার সর্বত্র আলোকপাত করেন নি বলেই আমি সংকুচিত হাতে ভীরু প্রদীপের কম্পিত শিখা জ্বালাবার চেষ্টা করলাম। তাই এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীত ঘোষণা করতে আমি আদৌ কুণ্ঠিত নই যে এই বিশ্লেষণ কোনো পণ্ডিতজনের জন্যে নয়, যাঁরা রবীন্দ্র কাব্যে প্রবেশোৎসুক, তাঁদের কাছে সামান্য পথ সংকেত করে দেবার এ এক আন্তরিক চেষ্টা মাত্র।

রবীন্দ্রকাব্য সাধারণ্যে প্রচার হোক, বিজ্ঞ মানুষের মতো সাধারণ পড়ুয়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সামগ্রিক পরিচয় পাক, খুব বেশী পরিচিত অথচ পাঠ্যগ্রন্থের কয়েকটি প্রচলিত কবিতা ছাড়া সব কবিতাই সবলে পড়ুন—এই ইচ্ছাজাত দৃষ্টিভংগী নিয়েই গ্রন্থটি লেখা। তাই কাব্যরসের আস্বাদনে পাঠকদের খুব বেশী যত্নের সঙ্গে পথ দেখিয়ে চলার চেষ্টা করি নি, তাতে পাঠক-সমাজের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে, নিজে নিজে সন্ধান ও আবিষ্কার করার মধ্যে সত্যকার আনন্দ আছে। আমি শুধু খেই ধরিয়ে দেবার কাজ করেছি মাত্র। কাব্যোপলব্ধির প্রসঙ্গে কবিগুরুর কথা শিরোধার্য করেই বলি—কাব্যের কেবল একটা মাত্র বাঁধা মানে না থাকতে পারে—তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের মানুষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে। তাই কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে পূর্ণচ্ছেদ টানার কিছু নেই। গাইড বুক দিয়ে সাবালক

ভ্রমণকারীর স্বাধীন চেষ্টা প্রতিহত হতে পারে—একথা স্মরণ করেই নিজের সিদ্ধান্ত ও অভিরুচি কোথাও চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করি নি, ব্যক্ত করেছি মাত্র। কোথায় বিদগ্ধ জনের মতের সঙ্গে মিল ঘটেছে—তার উল্লেখ করেছি, যেখানে অমিল দেখা দিয়েছে, সেখানে নিজের সবিনয় সযুক্তি মন্তব্য উপস্থিত করেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রী সুনীল কুমার মণ্ডলের উদ্যম ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। তাছাড়া শ্রী সনৎ কুমার গুপ্ত কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি পাঠে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন, বন্ধুরা উৎসাহ জুগিয়েছেন, জ্ঞানীরা সস্নেহ উপদেশ দিয়েছেন। এঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না, বরং ভবিষ্যতে যেন এঁদের অকুণ্ঠ সহায়তার দ্বার খোলা থাকে, সেই আবেদন জানিয়ে রাখি। কল্যাণীয়া লপিতা বসু নিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরী করে দিয়েছে।

এখন সাধারণ পাঠক—রবীন্দ্রকাব্যে একেবারে প্রাথমিক উপলব্ধিকামী পাঠক—যদি এই গ্রন্থ পাঠ করে ঈষৎ উপকৃত হন, এবং আপন আপন চিন্তা ও উপলব্ধির আলোকে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সাহায্য-লাভ করেন, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

নিবেদক

ছন্দসী
১০/৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট
পিন কোড ৭০০০২৬

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পর্ব

অবতরণিকা

রবীন্দ্রকাব্যকে বিরাট যে কোনো সামগ্রীর সঙ্গেই উপমিত হতে দেখা গেছে। হিমালয় বা মহাসাগর উপমান হিসেবে আজ আর আমাদের মনে কোনো আলোড়ন তোলে না বা নতুন কোনো অনুভূতির সঞ্চার ঘটানোর ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। বিরাট প্রাসাদের সঙ্গেও রবীন্দ্রকাব্যের তুলনা হয়েছে; গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে রবীন্দ্র-কাব্যের যেমন বৈচিত্র্য এবং স্বাদ-ভিন্নতা, ঠিক বিরাট বাড়ির বিচিত্র স্বতন্ত্র ও সজ্জাসুন্দর কক্ষের রূপ-বিভিন্নতার মতই। রবীন্দ্রকাব্য বিরাট শাশ্বতকালের বোধিবৃক্ষসম— এ কথাও আজকাল উল্লিখিত হয়। এ উপমাটি হাল আমলের। বটগাছের শিকড় যেমন মাটিতে বিস্তৃত থাকে, ধরিত্রী মায়ের কাছ থেকে প্রাণরস আহরণ করে, তেমনি এর শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-পল্লব প্রভৃতি আকাশের দিকে পরিব্যাপ্ত— অনন্ত, অসীমের সঙ্গে মিতালি করার আকুলতায় যেন মহান্ আগ্রহ নিয়ে মহাশূন্যের দিকে আকুল হয়ে জেগে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের সামগ্রিক আলোচনার সংক্ষিপ্ত ফলশ্রুতি হিসেবে কিন্তু এই উপমাটিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, বরং একটু তাৎপর্যপূর্ণই বলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন সুদীর্ঘকাল ব্যাপ্ত। ‘কড়ি ও কোমল’ গ্রন্থের প্রকাশকাল থেকে ‘আরোগ্য’ গ্রন্থের প্রকাশ পর্যন্ত সময় বড় কম নয়। ‘কড়ি ও কোমলে’র পূর্বেকার গ্রন্থাবলী সম্পর্কে কবি নিজেও খুব বেশী মনোযোগ দেখান নি, প্রস্তুতি-পর্বের কবি-মানসের পরিচয় সে সব বইতে সমুজ্জ্বল, তবু সেগুলিকে নিয়ত আলোচনার বস্তু হিসেবে কবি গ্রহণ করতে এক রকম নিষেধ করেছেন। প্রস্তুতি পর্বের গ্রন্থ

সম্পর্কে, বিশেষ করে 'সন্ধ্যাসংগীত' গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে— এই রচনাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা না করে কচি আমের গুটির সঙ্গে তুলনা করলেই উচিত কাজ হবে, কারণ—"তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল।"[১] কিন্তু অন্যত্র কবি স্পষ্টতঃ বলেছেন—"কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এই জন্য ওগুলো হয়েছে ঢেউখেলা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আবা বাঁকা, ওরা মূর্ত হয়ে ওঠে নি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারে নি। সেইজন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্য রচনা ভালোমন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।"[২] তাই 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থকে আদি সীমারেখা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থকাল থেকে তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত সময়ের বিস্তার বড় কম নয়। কোনো কবির পক্ষেই এই সুদীর্ঘকাল একটি মনন ধারার পরিপোষকতা করা সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তো নিশ্চয়ই নয়। বারবার তিনি "নতুন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি"[৩] বলে বেরিয়ে পড়েছেন।

রূপের বদল যেমন তাঁর কাব্যের অঙ্গসজ্জা করেছে, তেমনই প্রগতিশীল ভাবনা চিন্তার সংবেদন কবিতাগুলিকে নবীনতায় ঋদ্ধ করে তুলেছে। তাই তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের এক একটি বিশিষ্টতা আমাদেরকে মুগ্ধ করছে। গোড়ার দিকে প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী একরকম ছিল, আবার শেষের দিকের কাব্যে দেখি কবি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক বক্তব্যেরও অতীত এক ইঙ্গিত আরোপ করেছেন। প্রেমেরই লীলা-বৈচিত্র্য কত বিভিন্নভাবে ধরা পড়েছে, দেহকেন্দ্রিক প্রেম

দেহাতীত হয়ে রতির পথ অতিক্রম করে আরতির ফুল হয়ে ফুটেছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারাবাহিক চেতনা কবির মনে জন্মলাভ করে, কবিজীবনের অগ্রসরণের সাথে তা নির্দিষ্ট এক পরিণতিতে এসে হাজির হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যের দুটি পর্ব। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকের কাছে কবির প্রথম জীবনের কবিতা যত বেশী আদৃত এবং যেমনভাবে পরিচিত তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতা কিন্তু ঠিক ততখানি নিবিড় হয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে নি। প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের এবং শক্তির যাবতীয় সম্পদ নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয়েছে। ফলে পাঠকমানসে কবির সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা স্পষ্ট হবার সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যের তেমন বিস্তৃত আলোচনা হয় নি। ফলে এই সময়ের কাব্যগ্রন্থগুলি 'সানাই' 'পত্রপুট' 'পরিশেষ' কি 'আকাশ প্রদীপ' কিংবা 'আরোগ্য' বা 'রোগশয্যায়' বা 'শেষ লেখা' তেমন করে জনপ্রিয় হয় নি, যেমন হয়েছে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'কল্পনা', ''চিত্রা' কি 'মহুয়া'। অথচ শেষ পর্যায়ের কবিতায় কাব্য-সম্পদের প্রাচুর্য যেমন—তার প্রকাশের বৈচিত্র্য-বৈভবও কম নয়, তার ওপর তাঁর কাব্য-ভাবনার অসামান্য ঔজ্জ্বল্য দার্শনিকতার গভীর সম্মোহে নতুন ধরনের একটি আস্বাদ উপস্থিত করেছে। আর তার সঙ্গে কবির মননের পরিণতির একটা ছোপ লেগেছে। প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থের রোমান্টিক চেতনার প্রবাহে শেষ দিককার কাব্যের আধ্যাত্মিক মননের একটি স্রোতোরেখা এসে মিশেছে। প্রথম পর্যায়ের কাব্যের অনুভূতি প্রবণতার সঙ্গে তাঁর কবিজীবনের গোধূলি-পর্যায়ের কাব্যে চিন্তা-প্রবণতা এসে এক হয়ে গেছে। প্রথম জীবনের কাব্যে কবির আকুলতা রয়েছে সৌন্দর্যসুধা পান করতে, রূপের চিন্তা এবং সৌন্দর্যের পিপাসাই কবিকে আকুল করেছে—আর শেষের পর্যায়ের কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় কবি সৌন্দর্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন—সৌন্দর্যকে পান করার জন্যে নয়; সৌন্দর্য-ধ্যান এখানে তাঁর সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসায় পরিণত

হয়েছে। রূপ-সৌন্দর্যের অতলে তলিয়ে তিনি অরূপের সঙ্গে রূপের সম্পর্ক নির্ণয়ে আকুল হয়েছেন। এই দুটি পর্যায়ের দুটি করে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করছি।

(১) হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতট তলে
শ্রান্ত রূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে। অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মত। সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ নদীতীরে
অরণ্য শিয়রে। যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে।[৪]

(২) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপ শিখা--
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লীস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে—
নাহি পায় সীমা।[৫]

(৩) আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'.
সুন্দর হল সে।[৬]

(৪) ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে, পথ ভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তারপরে ভাবি মনে,
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার।'

উভয় পর্যায়ের কবিতায় এইটুকু স্পষ্ট হয় যে কবির উপভোগ অনুভাবনায় এসে পরিণত হয়েছে। রূপের অমৃত আস্বাদ দার্শনিক জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। রূপ তত্ত্ব হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় স্তরের একটি স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করে উপায় থাকে না। তাঁর কবিকর্মের অন্তর্লীন গতিশীলতা তাঁর কাব্যকে একটা বিশেষ পরিণতি দিয়েছে, সৌন্দর্য-চিন্তা দার্শনিকতায় রূপ নিয়েছে। এই হলো মোটামুটি স্তর-বিভাগ. সূক্ষ্মভাবে রবীন্দ্রকাব্যকে অনেক স্তরে অনেক পর্যায়ে বিন্যস্ত করা চলে। সেকথা স্বীকার করেও এই স্থূল বিভাজনা অনস্বীকার্য।

প্রথম যুগে কবি প্রকৃতি, পৃথিবী, মাটি, মানুষ সব কিছুকেই বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, রোমান্টিক কবির বিস্ময়, অস্থিরতা ও ভাবাবেগ—সব কিছুই পুরোপুরি কবিকে লালন করেছে কিন্তু বহির্জগৎ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রাজ্যের সঙ্গে কোথাও কবি নিজস্ব মন্ময় চিন্তাশীল সত্তাকে মিশিয়ে দেন নি ; সোনার ধান নিয়ে সোনার তরণী চলে গেছে। কিন্তু কবি যান নি ; তিনি নীরব দর্শকের মতো স্থিতিশীল স্থাণুত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। এ যুগের কাব্যে তাঁর অনুভূতি-প্রবণতা প্রাধান্য লাভ

করেছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে কবি নিজেকেও জগতের গতির সঙ্গে চলনশীল বলে উপলব্ধি করছেন। অকারণ অবারণ চলায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অচলও সচল হলো। পর্বত বৈশাখের মেঘের মতো গতিমান হলো। অনুভূতির জায়গায় এল চিন্তাপ্রবণতা, দ্বিতীয় পর্যায়ের এটাই বৈশিষ্ট্য।

আগেই বলেছি যে যদিও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে রবীন্দ্রকাব্যের স্তর বিভাগ বহু—তবু আমরা রবীন্দ্রকাব্যের দুটি পর্বকে স্থূল একটি চিন্তা-রেখা দিয়ে এভাবে ভাগ করে নিলাম। যে কথা বলছিলাম যে প্রথম ভাগের কাব্যের রূপ-সৌন্দর্য, তত্ত্বগত সমাবেদন, এবং কাব্য-চিন্তার উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনার অভাব নেই; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ নেই, শ্রদ্ধেয় বহু সমালোচক এই পর্যায়ের কাব্যগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করে বলেছেন তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতা দার্শনিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যের যে দুটি পর্বের কথা বলা হলো—সেই স্থূল পর্ব-বিভাজন আজকের পাঠকসমাজে একরকম স্বীকৃত এবং সুনির্ধারিত। প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার। এখানে আমরা শুধু তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাবলী নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। সমালোচকেরা বলেছেন এই পর্বে কবি দার্শনিক হয়েছেন এবং তাঁর কাব্য দার্শনিকতার দ্যুতিতে উজ্জ্বল। এক কথায় বা মাত্র একটি গণ্ডীতে তাঁর শেষ পর্বকে নির্দিষ্ট করার প্রয়াস আমার নয়। সমুদ্রের সামগ্রিক রূপের বৈভব যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি সে অসংখ্য বীচিমালা নিয়ে সমুদ্রের দেহ সেই অগণিত তরঙ্গভঙ্গের বৈচিত্র্য এবং রূপ-ভিন্নতাও সমান নয়নানন্দকর, প্রত্যেকটি ঢেউ-ই কিন্তু অন্যটির থেকে স্বতন্ত্র, হয় বর্ণে না হয় আবৃত্তিতে, হয় জলোচ্ছ্বাসে নয় স্রোতের গতির সমধর্মিতায়। তেমনি রবীন্দ্রকাব্যসমুদ্রের প্রত্যেকটি কবিতাই স্বতন্ত্রভাবে আস্বাদ্য, যদিও সমগ্রতায় তারা একটি অবিচ্ছিন্ন বোধকে পুষ্টিদান করছে। এইজন্যেই

আমার চেষ্টা হবে শেষ পর্বে প্রত্যেকটি কবিতার রসাস্বাদনে পাঠককে সাহায্য করা, রস নিঙড়ে পাঠকের ইন্দ্রিয়লোকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া নয়। আমি কবিতার মোটামুটি পরিচয় ও আলোচনাকেই প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করবো, কবি-মানসের জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথার অবতারণা এবং বিশ্বচিন্তার বিশ্লেষণ আমার লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা সর্বপ্রথমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সেই কথাটি এই যে রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েও শেষ পর্যায়ের কাব্যে তার বৈচিত্র্য, সরসতা ও নবীনতার অভাব ঘটেনি। ইংরাজী কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, টেনিশন, ব্রাউনিং দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের শেষ জীবনের কাব্যে নবীনতা এবং ঔজ্জ্বল্যের অভাব ঘটেছে; অথচ রবীন্দ্র-নাথে বৈচিত্র্য ও নবীনতা রয়েছে। বিশেষ করে প্রকাশ বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-নাথ শেষ বয়সে গদ্য কবিতা রচনা করেছেন, কাব্য ও দর্শনকে একীভূত করেছেন, ব্যক্তি-চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক দায়িত্ব পালনার্থে গণ-মানসের আত্মীয় হয়ে কথা বলেছেন, পীড়িত আর্ত মানুষের সেবক হয়েছেন, তুচ্ছ সাধারণ বস্তু এবং বিষয়কে অসাধারণ ও অসামান্য মহিমার গৌরবভাগী করেছেন, সৌন্দর্য ধ্যান করতে করতে তিনি সৌন্দর্য জিজ্ঞাসায় অভিনিবিষ্ট হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি বার্ধক্যেও কিরকম অম্লান ছিল, সে সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন—"সবচেয়ে আমার আশ্চর্য লেগেছিল তাঁর অদ্ভুত প্রাণশক্তি। তিনি যেন প্রতিদিনই বেড়ে উঠেছেন, পরিণত হয়েছেন। সাহিত্য প্রকরণের কয়েকটি দুরূহ নিরীক্ষা শেষ জীবনেই সম্পন্ন করেন—যখন নতুন পথ চলার সাহস মানুষ হারিয়ে ফেলে। তিনি ছন্দ মিল বর্জন করে যখন গদ্যছন্দে মন দিলেন, তখন তিনি প্রায় সত্তরের কোঠায়।"[৮]

বীন্দ্রনাথের এই শেষ পর্যায়ের কবিতাকেই গোধূলি পর্যায়ের কবিতা

বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কবির জীবন-গোধূলিতে লিখিত কাব্য সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা, এবং বিদায়কালীন অস্তগামী অগ্নি-সংকাশ সূর্যের নাম চিত্রভানু। চিত্রভানু রবীন্দ্র-জীবনের গোধূলি পর্যায়ের রূপকার্থকে ব্যঞ্জিত করে থাকে, তাই গোধূলি পর্যায়ের কবিতাকে 'চিত্রভানু রবীন্দ্রনাথের কবিতা' বলাও অসমীচীন হয় না।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের গোধূলি পর্যায় বলতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়-বিভাগ করা যায় কি করে? তাঁর সমগ্র কবি-জীবনের ব্যাপ্তি থেকে দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে লেখা কবিতাগুলিকে যদি চিহ্নিত করা যায়—তাহলে কালানুক্রমিক একটা হিসেব বা নিরিখ হিসেবে 'গোধূলি-পর্যায়' কথাটিতে একটি অর্থ বা তাৎপর্য আরোপ করা চলতে পারে। কিন্তু সেটি সমীচীনতার দিক থেকে কতদূর টেঁকসই হবে—সে সম্পর্কে সংশয় আছে। একটা কথা ঠিক যে গোধূলি-পর্যায়ের কাব্য কবির জীবন-কালের শেষের দিকের বিশিষ্ট সময়-নির্দেশের মধ্যে রচিত, কিন্তু সে সময়ের উভয় প্রান্তের সীমারেখা কতদূব পর্যন্ত প্রসারিত? এক প্রান্ত আমরা নিঃসন্দেহে ঠিক করে নিতে পারি—তাঁর মরজীবনের অবসান পর্যন্ত লিখিত কবিতাবলী। অর্থাৎ লোকান্তরিত হবার পব প্রকাশিত তাঁর 'শেষ লেখা' গ্রন্থ পর্যন্ত ঐ দিকের সময়-সীমা নির্দিষ্ট। কিন্তু কবে থেকে? অর্থাৎ এই দিকের—গোধূলি-পর্যায় শুরুর এই প্রান্তের সীমা-রেখা কবে থেকে?

মৃত্যুর জন্যে কবি যখন থেকে তৈরী হয়েছেন—তখন থেকেই কি আমরা ধরতে পারি যে কবির কাব্য-জীবনে গোধূলি কালের ছবি জেগে উঠেছে? তাঁর কবি-জীবনের যে ধূসর কপিল সন্ধ্যার বর্ণ-বিভঙ্গের স্নেহ-মাধুর্য ও স্মৃতি রোমন্থনতার বিধুর সৌন্দর্য ধরা পড়েছে—তখন থেকেই তাঁর কাব্য-জীবনে গোধূলির বর্ণাঢ্যতা এসেছে বলে সহসা আমাদের মনে হতে পারে। কবি মনে মনে তৈরী হচ্ছেন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে, তাঁর বয়সও বাট পার হয়ে গেছে, তিনি অন্তরে যেন মৃত্যুর পদ-সঞ্চারও শুনতে পেয়েছেন—তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও

তিনি তাই 'পূরবী' অর্থাৎ বিদায় বেলার বা সন্ধ্যাকালীন বিষণ্ণ রাগিণীর কথা স্মরণ না করে পারেন নি।

'পূরবী'তে তিনি ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি—

দেখ নাকি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূববীব ছন্দে রবিব
শেষ বাগিণীব বীন।
এতদিন হেথা ছিনু শামি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গান হাবা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সাবা হয়ে এল দিন।

এই 'পূরবী' গ্রন্থ থেকেই কবি পৃথিবীর কোল থেকে বিদায় নেবাব কথা স্পষ্টতঃ বলতে শুরু কবেছেন। সুবিখ্যাত 'লীলা সঙ্গিনী' কবিতায় কেন, 'যাত্রা' কবিতায়ও তাঁর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবাব বেদনা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

কবি বলেন,

"যাত্রী আমি, চলিব
রাত্রির নিমন্ত্রণে।
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির
উৎসব প্রাঙ্গণে।
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার
আনন্দ দীপগুলি।"

'ছবি' কবিতায় তিনি শান্তসিন্ধু বুকে পশ্চিমগামী একটি তরীর আলেখ্য এঁকে শেষে বলছেন—

তুই হেথা কবি,

এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে
বাঁচাইতে চায়।

এ ছাড়া 'উৎসবের দিন', 'পদধ্বনি', 'শেষ', 'সমাপন', 'শেষ বসন্ত' 'বৈতরণী', 'অবসান' প্রভৃতি কবিতাতেও কবি জীবন-গোধূলির একটি বিষণ্ণতাকে বা সেই বিষণ্ণ বেদনার একটি সুরকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে মনে আসতে পারে যে এই যুগ থেকেই—বিশেষ করে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে গোধূলি পর্যায় শুরু হয়েছে।

কিন্তু আমি বলবো না—এ [illegible] নয়। একথা ঠিক যে 'পূরবী' থেকেই কবির মৃত্যুচিন্তা কাব্যে রূপ গ্রহণ করেছে—তিনি উপলব্ধি করেছেন—তাকে এই পৃথিবী ও প্রকৃতির লোক থেকে বিদায় নিতে হবে, তাই পৃথিবীর প্রতি মমতায় তাঁর মন বেদনায় ভারাতুর হয়ে উঠেছে। এ যুগ থেকেই তাঁর কাব্যে অস্তরাগের বর্ণচ্ছটা কখনো কপিশ, কখনো রক্তরাঙা, কখনো বা স্বর্ণপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবু রবীন্দ্রকাব্যের এই যুগ থেকে গোধূলি-পর্যায় শুরু হয় নি। কারণ তাঁর কাব্যে বক্তব্যে এই মহাযাত্রার চিন্তাজনিত এক বেদনা বিহ্বলতা ছাড়া আর কোথাও ত' কোনো পরিবর্তনের চেহারা নেই। কি ভাব-সম্পদে আর কি বাক্‌বিন্যাসে—কোথাও এই ঋতু বদলের কোনো লক্ষণ বিপর্যয় বা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না। শব্দ-পারম্পর্য সম্পর্কে কবির মননে নতুন রূপ সাধনা কিংবা টেকনিক কোনো নতুন চিন্তা বা প্রকরণের কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। আঙ্গিক এবং চিন্তা, আকৃতি ও প্রকৃতি, রূপ ও মর্ম, ফর্ম এবং ম্যাটার—কোনো দিক থেকেই তাঁর কাব্য-স্রোত নূতন বাঁকে মোড় ঘোরে নি। 'পূরবী' গ্রন্থের প্রযুক্তি প্রকরণেরও নতুনত্ব নেই। এমনকি, জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়ে বিগত যৌবনের সৌন্দর্যসুধায় উজ্জ্বল মাধুর্য-মণ্ডিত রসোচ্ছল দিনগুলি ফিরে পাওয়ার জন্য কবির যে ব্যাকুলতা, তার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা যে যৌবনলীলার অক্ষয় সম্পদকে

অটুট রেখে উপভোগ করা, রূপরসগন্ধময় প্রকৃতিকে আস্বাদ করার স্বপ্নাতুর অভীপ্সা প্রভৃতি চিন্তাভাবনা তাঁর ধারাবাহিক কাব্যজীবনের একটি পূর্ণতার ইঙ্গিত বেশী করে বহন করে আনে--পরিবর্তনের সূচনা থাকলেও বদলের মোহাবিষ্ট নবীনতার ছাপ নেই। তাই 'পূরবী' থেকে রবীন্দ্রকাব্যে গোধূলি-পর্যায় শুরু হয়েছে বলা সঙ্গত ও সমীচীন হবে না, যদিও 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রকাব্যের অধ্যায়ে একটি পর্বাঙ্ক শুরু হয়েছে—এমন কথা বলা বোধহয় অযৌক্তিক নয়

ঠিক একই কারণে 'মহুয়া' গ্রন্থটিকে গোধূলি-পর্যায়ের বাইরে চিহ্নিত করা চলে না। 'পূরবী'র পরের বই 'মহুয়া', কিন্তু কবির যৌবনরাগের উচ্ছল লীলা বিলাসের বহু ছবিও এখানে বন্দী হয়ে রয়েছে। 'মহুয়া' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে একটা বিশেষ ব্যতিক্রম। শেষ চৈত্রের উত্তপ্ত নিদাঘ-ক্লান্তিলোপে নব বসন্তের সকাল পুষ্পের সৌরভ বিকীর্ণ হয়েছে 'মহুয়া' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'মহুয়া'কে আকস্মিক, অকালিক প্রভৃতি বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। যৌবন ও প্রেমের যে উচ্ছল গান তিনি যৌবনকালে গেয়ে এসেছেন, বৃদ্ধ কবি সাতষট্টি-আটষট্টি বছর বয়সে এসেও সেই যৌবনশ্রী প্রেমের চেতনা নিয়ে উচ্চকণ্ঠে গান ধরেছেন। সর্বশ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অপূর্বকুমার চন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কাব্যরসিক কয়েকজন বন্ধু ১৩৩৫ সালে কবিকে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনুরোধ করেন যেন কবি তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করে বিয়েতে উপহার দেওয়ার যোগ্য একটি কাব্য-সংকলন সম্পাদন করেন। কবি তখন তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে উপযোগী কবিতা সঙ্কলন করে নামকরণ করলেন—'বরণডালা'। কিন্তু এই বরণডালা গ্রন্থটি বোধহয় কখনো প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"এদিকে পুরাতন প্রেমের কবিতা বাছিতে বাছিতে কবির মনে, প্রেমের যে ফল্গুধারা শেষের কবিতা রচনাকালে উৎসারিত হইয়াছিল তাহাই এখন প্রবল স্রোতোধারায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।"[৯] রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা আজীবন লিখেছেন, কাজেই বৃদ্ধ বয়সে

প্রেমের এই আবেগকে অস্বীকার বা অমর্যাদা করেন নি। ‘মহুয়া’র কবিতা এই ভাবেই অসময়ে সৃষ্ট হয়েছে, এবং তাই কবি নিজে প্রশান্ত-চন্দ্র মহলানবীশকে এক পত্রে জানিয়েছেন যে ‘মহুয়া’র কবিতাগুলি তাঁর হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না, বরং সেগুলি আকস্মিক। সুতরাং ‘পূরবী’র পরে লেখা হলেও ‘মহুয়া’য় রবীন্দ্রনাথের যৌবনবোধ বিধৃত, এবং ‘পূরবী’র পরে এই যৌবনরস সম্ভোগের বলিষ্ঠ এমন কাব্যই প্রমাণ করে দেয় যে ‘পূরবী’র মধ্যে যে-মৃত্যু চিন্তার রূপায়ণ ঘটেছে—তা সাময়িক, এবং তা কখনোই গোধূলির শেষ রক্তরাগ নয়, মেঘাচ্ছাদিত আকাশের ক্ষণিক নীলিমার বর্ণহীনতা মাত্র। সুতরাং ‘পূরবী’ এবং ‘মহুয়া’র রচনাকালকে কোনোক্রমেই গোধূলি-পর্যায়ের পূর্বপ্রান্তের কালিক নিরিখ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না।

‘মহুয়া’র পরের বই ‘পরিশেষ’। এই গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং কবিও এখানে স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেছেন যে তাঁর কাব্য-জীবনের তরী শেষ ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকেই তার গোধূলি-পর্যায় শুরু হয়েছে; অর্থাৎ গোধূলি-পর্যায়ের শেষ যেমন ‘শেষ লেখা’ গ্রন্থে—তেমনি সেই পর্বের শুরু ‘পরিশেষে’।

‘পরিশেষ’ থেকে কেন রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি-পর্যায় শুরু হয়েছে তার উত্তরে আমি শুধু এই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণের দিকে দৃষ্টি দিতে বলবো না: কারণ এর আগে ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থে মৃত্যুচিন্তা রয়েছে—এবং নাম-করণও সমাপ্তিসূচক শব্দের ব্যবহারে একটা শেষ ঘোষণা করছে। ‘পূরবী’রও আগে ‘চৈতালি’ কি ‘খেয়া’—কাব্যগ্রন্থেও সমাপ্তির ইঙ্গিত রয়েছে। শেষ সূচক শব্দ দিয়ে বইয়ের নামকরণ হলেই যে শেষ-জীবনের কাব্য শুরু হলো—একথা ঠিক নয়। এবং এই কারণে ‘পরিশেষে’র নাম-করণ সমাপ্তি সূচক বলেই যে এখান থেকে গোধূলি-পর্যায়ের কাব্য শুরু হলো—তা বলা সংগত নয়। আর একটি কথা। পরিশেষের আগেও যেমন, পরেও তেমনি—অনেক কাব্যগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে—যাদের নামে সমাপ্তির ইঙ্গিত রয়েছে, যেমন—‘শেষসপ্তক’, ‘প্রান্তিক’,

'সেঁজুতি' প্রভৃতি গ্রন্থের নামের দিক থেকেই যদি কবিজীবনের কাব্য-ধারার একটি পর্যায়ের সূচনা চিহ্নিত করতে হয়, তবে 'পবিশেষ' গ্রন্থটি বেছে নেব কেন, তার আগের বই বা পরের বই—যখন সমাপ্তির দ্যোতনায় যাদের নামকরণ, সেই সব বইয়ের একটাকে কেন বেছে নেব না? সুতরাং 'পবিশেষ' গ্রন্থটি নামকরণের দিক থেকে গোধূলি-পর্যায়ের শুরুর বই বলে চিহ্নিত করা হয় নি! নিশ্চয়ই এব আলাদা একটি তাৎপর্য আছে।

এই 'পবিশেষ' কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবির ধ্যানধারণা এবং চিন্তা, উপলব্ধি, ভাবাবেগের প্রকাশ-ব্যঞ্জনা ও প্রকরণ—একটা নতুন চেহারা গ্রহণ করেছে। কবি যেন পূর্বপথ পরিক্রমা শেষ করে এক নতুন জগতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। কবি নিজের ভাবনালোকে একটি নূতন তাৎপর্য আরোপ করেছেন। মৃত্যুচিন্তা তাব কাব্যে পূর্বে অনেকবার আমরা দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এখনকার মৃত্যুচিন্তা তাকে দার্শনিকতার উপলব্ধিতে নতুনভাবে দীক্ষিত করেছে। এই গ্রন্থ থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত এই দার্শনিকতা ও চিন্তাশীলতার কাব্যায়ন একই ধারায় বয়ে চলেছে। তাই 'পবিশেষ' গ্রন্থ থেকেই তাঁব কাব্যজীবনে গোধূলি-পর্যায় শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। 'পবিশেষে' কবি ঘোষণা করলেন—

যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিম পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে!
অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটে
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি?
বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা
জীবনের হেরিনু মহিমা।[১০]

এই কবিতাটি রচিত হয় ৩০শে চৈত্র ১৩৩৩ সালে। ঠিক এর পরের দিন একটি পত্রে রানী দেবীর কাছে কবি লেখেন যে এবারে তাঁর জীবনের নূতন পর্যায় আরম্ভ হলো, আর সেই পরিচয়কে বলা যেতে পারে 'শেষ অধ্যায়।'[১১]

'পরিশেষ' গ্রন্থের আরো কয়েকটি কবিতা—সেগুলিতে এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

রবি প্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
...তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর-প্রহরে
বিশ্বরস সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক সকল সন্দেহ
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা।'

কিংবা,

দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের
নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে।

'পূরবী'র মৃত্যুচিন্তার কবিতাগুলির থেকে যে এই কবিতাগুলির সুর-স্বাতন্ত্র্য, একটু লক্ষ্য করলেই তা সহজে বোঝা যায়। 'পূরবী'র মৃত্যু-চিন্তায় সন্দেহ আছে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়িত হয়ে আছে। কবি আসন্ন মৃত্যুর

চিন্তায় কাতর; কিন্তু সেই কাতরতায় একটি রোমান্টিক প্রলেপ পড়েছে—কবির মৃত্যুচিন্তা ক্ষণিক; এবং এই পরিণাম চিন্তার ফসল হিসেবে কবি বস্তুজীবন এবং পৃথিবী ও প্রকৃতিকে বিস্মৃত হন নি বা জাগতিক তথ্য ও সত্য সম্পর্কে দার্শনিক অনুভূতি প্রবণতায় নিমগ্ন হন নি, তাই 'পূরবী'র মৃত্যু চিন্তা তাৎক্ষণিক; মৃত্যুভাবনায় ক্লান্ত কবি পুনরায় মাটি মায়ের কোলে ফিরে এসে ধরণীর সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে অতি সহজে সংযুক্ত করতে পারেন। তিনি সহজেই বলেন—

আজকে খবর পেলাম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন,
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ দেবতার।
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।[২৪]

এমন কি 'পূরবী'র প্রেম বর্ণনা পূরবীতেও এই মর্ত্যজীবনের সংবেদনশীল আকর্ষণই কবির বক্তব্য। তা ছাড়া 'পূরবী'তে যেমন করে কবি নিজের যৌবন সুখভোগের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন, প্রেমের বিচিত্র মহিমা উপলব্ধি করেছেন—যাতে তিনি নিজেকে গৌরবদীপ্ত ও ধন্য মনে করেছেন।

কিন্তু 'পরিশেষে'র মৃত্যুচিন্তার মধ্যে ধরণীর প্রতি এমন মায়াময় অনুরাগের আকর্ষণ নেই। 'পূরবী'র পর সাতটি বছর কেটে গেছে—কবি এখন সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন, নিজের কায়িক তথা বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে এখন তিনি আর সন্দিহান নন, তিনি বুঝেছেন মহাকালের ডাক আসছে, এবং এই গ্রন্থ রচনাই হয়তো তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ; সুতরাং মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কবিকে বিচার করতে হয়েছে জীবনকে, মৃত্যুকে, সুন্দর প্রকৃতিকে। এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত হয়ে জগৎ-স্রষ্টারও স্বরূপসম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পর্কে কবির জিজ্ঞাসা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি আর

পূর্বের মমতায় আবিষ্ট হয়ে জগৎ ও জীবনের অমৃতলোকে ফিরতে পারেন নি। মৃত্যুচিন্তা এখানে তাৎক্ষণিক নয়, কবির মনে এর স্থায়িত্বের পরিচয় আছে। এই কারণেই 'পরিশেষ'কে আমরা কবির গোধূলি-পর্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছি।

রবীন্দ্রকাব্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই গণজীবনের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনার প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন; মানুষ হিসেবে সাধারণ্যে তাঁর যে প্রেম ও প্রীতি—তার একটি ধারা ত' তাঁর সমগ্র কবি-সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাছাড়া তিনি, বিশেষ করে শেষ জীবনে গণজীবনের চিন্তাকে তাঁর কাব্যে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন। সাধারণ মানুষেরই তিনি একজন, এবং এই একজন হিসেবে তিনি পতিত ও পীড়িত মানুষদের মুক্তি কোথায়, এবং কেমন করে তা সম্ভব—সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন। 'সেঁজুতি'তে তিনি বলেছেন—তাঁর শেষ পরিচয় এই যে তিনি আমাদেরই লোক, সাধারণ মানবগোষ্ঠীরই একজন তিনি।[১৫]

গোধূলি-পর্যায়ের কাব্যে আমরা দেখি কবি এখানে মর্ত্যলোকের জীবন-লীলার একটা হিসেব-নিকেশের মোটামুটি পরিচয় উপস্থিত করেছেন। তিনি কে, কবি হিসেবেই বা তাঁর সত্তা কি, তাঁর মূল্যায়ন কেমন হবে, কোন্ আদর্শ কবে কোন্ পথে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে—এই জাতীয় জিজ্ঞাসাই কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি বিশিষ্ট সুর। অভ্যাসবশতঃ পুরাতন দিনের স্বপ্নবিহ্বল আতুরতা বা রোমান্টিক অভীপ্সাও মাঝে মাঝে কবির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে—তা নিতান্ত অভ্যাসের মোহে, কিন্তু নতুন সুরই এখানে প্রবল ও প্রধান। আর এখানে থেকেই তিনি এই বিশিষ্ট সুরেই গান করেছেন শেষ পর্যন্ত। সুতরাং 'পরিশেষ' থেকেই তাঁর পরিণাম-পর্যায়ের কাব্য শুরু হয়েছে বলা কিছুমাত্র অসংগত নয়।

শেষ পর্বে কবিকে দার্শনিক বলে চিহ্নিত করেছেন সবাই। অসীম এবং অশেষ পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে কবির চেতনা শেষ পর্যায়ের কবিতায় ধরা

পড়েছে। 'জন্মদিনে'র প্রথম কবিতা, 'নবজাতকে'র 'কেন' কবিতা কিংবা 'শেষ লেখা' বইয়ের প্রথম কবিতাগুলি উদাহরণ হিসেবে চট করে মনে পড়ছে।

গোধুলি-পর্যায়ের কাব্যের আর একটি সুর হচ্ছে কবির স্মৃতি-অনুধ্যান। জীবন-সন্ধ্যায় কবি ফেলে আসা সুদূরকে স্মরণ করছেন। পৃথিবীকে তিনি ভালবেসেছেন, মর্ত্যপ্রীতি তাঁর কবিজীবনের অক্ষয় প্রকাশ, আজ কবির সে সব কথা মনে পড়ছে। এতাবৎকাল তিনি যে সৌন্দর্য-সুধা পান করেছেন, রূপ-সৌন্দর্যের যে অমৃত বিতরণ করেছেন—কবির সেই সৌন্দর্যলোকের অনুধ্যান 'পরিশেষ' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। 'পরিশেষ' গ্রন্থের 'বিচিত্রা', 'আমি', 'তুমি', 'প্রণাম', 'ভীরু', 'বোবার বাণী' কবিতাগুলি স্মর্তব্য। 'পুনশ্চ' গ্রন্থে 'তীর্থযাত্রী', 'বালক', 'পুকুরধারে' প্রভৃতি কবিতার প্রধান বক্তব্য যদিও চিরন্তন সৌন্দর্য সাধনা —তবু এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে কবির স্মৃতি-অনুধ্যান রয়েছে। 'আকাশ-প্রদীপ' গ্রন্থ তো' স্মৃতিচারণায় পূর্ণ। 'শ্যামলা'র প্রেম কবিতাগুলির কয়েকটিতেও স্মৃতিরোমন্থন রয়েছে। 'ছড়ার ছবিতে'ও বাল্যকালের ধূসর আবছা স্মৃতি আছে।

কবি তাঁর শেষ দশ বছরে যেমন আত্মসচেতন হয়েছেন, দার্শনিক চিন্তা কবির কল্পনাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করিয়ে দিয়েছে, তেমনি বস্তুজগৎ থেকেও কবি একেবারে অনুপস্থিত হতে পারেন নি, বাইরের জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে কবির সংবেদনশীলতা নিশ্চিহ্ন হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাই যে বহির্জগতের ঘটনাবলী কবিকে এই যুগে বিশেষ করে বিচলিত করেছে। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে তিনি মাঝে মাঝে কাতর হয়েছেন, সাময়িক ঘটনায়ও তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।—এবং এই সময়কার বহু কবিতায় তাঁর সেই দুঃখ, বেদনা ও বিক্ষোভের রূঢ় অথচ কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে। 'পরিশেষে'র 'প্রশ্ন', 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি', প্রভৃতি কবিতার কথাই আমি বলছি। 'প্রান্তিকে'র শেষ দুটি

কবিতাও—সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক। 'আকাশ প্রদীপে'র 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' বা এই জাতীয় আরো অনেক কবিতা আছে। 'নবজাতকে'র 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি মিউনিক প্যাক্টের পরে রচিত হয় এবং ইয়োরোপের, চীনের, ইথিওপিয়ার তৎকালীন ঘটনাবলীর আলোয় এটিকে বুঝতে হবে।

এই পর্যায়ের কাব্যে কবির শব্দ ও ছন্দের বিশেষ একটা বদল আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, তেমনি কবির বক্তব্যেও একটি নতুন দিগন্তের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। সে হলো কবির কাব্য-কৌশলের ছাঁচে গড়া গল্প বলার পদ্ধতি। গাথা বা আখ্যায়িকামূলক কাব্য ইতঃপূর্বে বহু কবি লিখেছেন কিন্তু সেখানে কাব্যের মেজাজ ও কবি-মননের অনুভবময়তাই প্রাধান্য লাভ করেছিল কিন্তু এই পর্যায়ের আখ্যায়িকা কাব্যে কবির কাছে আমরা পেলাম গল্পরসেরই সংহত কাব্যরূপ। তাঁর বিখ্যাত 'ক্যামেলিয়া' কবিতার কথা একবার স্মরণ করা যাক, যেমন সংহত এর গল্পরূপ, তেমন কাব্যকথার নিপুণ আঁটসাঁট বাঁধুনি। রবীন্দ্রনাথ কবি, ঠিক তেমনই তিনি গল্পকারও,—এই পর্যায়ের বহু গল্পকবিতা সেই কথারই সাক্ষ্য দেয়। পূর্বের কাহিনীকাব্য কতকটা নীতিগর্ভ, কতকটা ধর্মসংক্রান্ত উপকথা, কেউ বা কাব্যময়। কিন্তু ইদানীংকালের গল্প-কবিতায় কাব্যধর্মের সঙ্গে গল্পরস এবং নাট্যীয় চমকের বিশেষ মেলবন্ধন ঘটেছে। এছাড়া বিবিধ সুরের বহু ও বিচিত্র কবিতা ত' আছেই। যুদ্ধবিরোধী কবিতাও এই পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট সুর। এই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার কথা স্মরণ করে কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করেন, 'সেঁজুতি', 'প্রান্তিক', 'নবজাতক', 'জন্মদিনে' প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু কবিতা আছে।

শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ জনগণের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন, মানুষের দুঃখ সুখের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে তাঁর মনোযোগ দেখা গেল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলি শিবিরে বন্দীদের ওপর বৃটিশ শাসকদের বর্বর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি অংশ

নিয়েছিলেন, 'প্রশ্ন' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এবং এই কবিতার মাধ্যমেই তিনি ইংরাজ শাসকদেব প্রতি ধিক্কার হেনেছেন।

রাশিয়ায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত কবি তাঁর অন্তর্জীবনের সমস্যা নিয়েই বিব্রত ছিলেন, তখন কোনো অত্যাচার অবিচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তাঁর মনে ব্যথা বাজতো। কিন্তু ১৯৩২ সাল থেকে দেখি কবি মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন, পীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিতদের বেদনাতে তিনি কাতর বোধ করেছেন। শুধু উচ্ছ্বাসমূলক বক্তৃতাধর্মী কথার উচ্চারণেই তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করলেন না; 'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'বাঁশি' শীর্ষক কবিতা লিখে হরিপদ কেরানীর অন্তর্জীবনের গভীর বেদনাকে মহিমময় করে সহানুভূতি জানালেন, এই কনিষ্ঠ কেরানী সামাজিক শূন্যতার রোমান্টিক জীব নয়, সমাজবিন্যাসের অন্তর্গত সামাজিক বাস্তব মানুষ। 'একজন লোক', 'সাধারণ মেয়ে' থেকে শুরু করে সাঁওতাল রমণী—দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ নারী পর্যন্ত অতি তুচ্ছকেও তিনি অসামান্য মাহাত্ম্যে গৌরবান্বিত করেছেন। 'পত্রপুটে'র 'আফ্রিকা' কবিতায় তিনি সভ্যকার দূত হিসেবে পীড়ক শ্বেতাঙ্গদের নৃশংসতার নিন্দা করে বলেছেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার মানুষদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। চীন দেশে জাপানী আক্রমণের প্রতিবাদও তাঁরই কণ্ঠে এ সময় ধ্বনিত হয়েছে। কে জানে হয়তো রাশিয়া ভ্রমণেব ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর কণ্ঠে নূতন আশা ও বিশ্বাস ধ্বনিত হয়ে থাকবে, তাছাড়া তাঁর জনতামুখী মনোভাব বদলের আর কি কারণ দেখানো যাবে? সমালোচকেরা একথা লিখেছেন যে "আশি বছরের বৃদ্ধ কবি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অবশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নকে মেনে নিলেন একান্ত আপন বলে।"[১৬]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে সর্বহারার সঙ্গে একীভূত হয়ে এই পর্বে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন—এমন কথা বলাও ঠিক হবে না, এবিষয়ে ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে "রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম সোভিয়েট অনুশাসিত মানবধর্ম নয়। 'মহা বা চির-মানবের'

যে আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে তিনি 'মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে' আহ্বান করেছেন তা মূলত আত্মিক সাধনার ফল, অর্থ নৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কথা তাতে বড় বেশি নেই।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ সহজ, সামান্য ও সাধারণকে এই পর্বে মর্যাদা দান করেছেন, কিন্তু তা তিনি করেছেন—তাঁর মননের প্রবণতার উপযোগী করে। রাজনৈতিক মতবাদের প্ররোচনায় তিনি উচ্চকিত হন নি বটে, তবে সর্বহারা অবহেলিতের প্রতি মমতায় তাঁর মন বেদনাহত হয়েছে। তাঁর কাব্যে এই পর্বে যে পালাবদল হয়েছে, কাছের মানুষ, অবহেলিত মানুষ, তুচ্ছ ও সামান্য ব্যক্তি-মানুষও মর্যাদার আসন পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও ঘোষণা করেছেন যে মার্কসিজমের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে এবং তাতে যদি তার জাত বদলিয়ে না যায়—তবে তাতে আপত্তির কারণ নেই,[১৮] তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ যতটুকু রাজনৈতিক, তার চেয়ে ঢের বেশী শাশ্বত এক মূল্যমানের কাছাকাছি।

'জন্মদিনে' গ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতায় অবশ্য তিনি বিনয়ের মাধ্যমে (কিছুটা ব্যথিত বা অভিমানাহত হয়ে?) বলেছেন যে তাঁর কবিতা বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হয় নি। তবু তিনি 'ওরা কাজ করে' কবিতা লিখেছেন এই সময়ে, এবং সে কবিতাটির আন্তরিকতা নিয়ে আশা করি কেউই প্রশ্ন তুলবেন না। 'শিশুতীর্থ', 'শুচি', 'রংরেজিনী' প্রভৃতি 'পুনশ্চে'র কবিতাগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তুচ্ছ অবহেলিত, সমাজ-সংসারের ঔজ্জ্বল্যরিক্ত নিঃস্ব মানুষের চিত্রও কবি অপূর্ব মমতায় অঙ্কিত করেছেন। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'একজন লোক', 'সহযাত্রী', 'ছেলেটা', কিংবা 'সেঁজুতি'র 'তীর্থ যাত্রিণী' 'শ্যামলী'র 'তেঁতুলের ফুল' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মশাই এক জায়গায় বলেছেন—"শেষযুগের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য রচনাভঙ্গী",[১৯] ছন্দের নবীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই কথা

উক্ত হয়েছে মনে হয়। 'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সব গ্রন্থেই কবির রূপ-মার্জনার বহু কলা কৌশল আমরা দেখতে পাই; কখনো গদ্যছন্দে, কখনো পদ্যে, কখনো পয়ারে, কখনো বা ধ্বনিপ্রাধান্যে তিনি লিখেছেন, এবং সঙ্গে নতুন নতুন কল্পনাখচিত অলংকরণের কারুকার্য। যে কথা তিনি বলতে চান—সেইভাবের অনুষঙ্গ বা অনুযায়ী রচনার মাধ্যম তিনি তৈরি করে নিয়েছেন এই শেষের পর্বে। 'আরোগ্য' গ্রন্থের কবিতাগুলি মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে তিনি দ্যুতিময় তানপ্রধান মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কাহিনী কাব্যে গল্পরসের বিন্যাসে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করেছেন; গদ্য ছন্দে মিলের অভাব পূরণ করার জন্যে অলংকৃত ভাষা ব্যবহার করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছেন।

তবে ভঙ্গীই সব নয়, কবির উপলব্ধিও অনেকখানি ধরা আছে। বলার কথা তাঁর ফুরিয়ে যায় নি, প্রতি গ্রন্থে—এমনকি প্রত্যেকটি কবিতায় কাব্যসৃষ্টি করেছেন। যেখানে স্মৃতিচারণা আছে, যেখানে তাঁরই আগের কোনো লেখার নবরূপায়ণ ঘটেছে, সেখানেও কাব্য সৌন্দর্যের ঘাটতি হয় নি। প্রত্যেকটি কবিতার স্বতন্ত্র আলোচনাকালে আমরা তার প্রমাণ পাবো।

শেষ পর্বে কবির গদ্যছন্দের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক' এবং 'শ্যামলী'তে তিনি গদ্যরীতির নতুন ছন্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের তুচ্ছতাকেও কাব্যের বিষয়বস্তু করতে চেয়েছেন—ফলে তাকেও বদল করতে হয়েছে তাঁর বিন্যাস। এই ছন্দ বিষয়ের আলোচনা আমরা যথাস্থানেই করবো। কবি নিজেও এই ছন্দ সম্পর্কে ওকালতি করেছেন, তাঁর মতেরও যথার্থতা কতদূর—তাও আমাদের দেখতে দোষ কি!

পরিশেষ

'পরিশেষ' গ্রন্থ রচনাকালে কবির বয়স সত্তর বছর অতিক্রম করেছে। মৃত্যুচিন্তা তাঁর মনকে বেশী গভীরভাবে স্পর্শ করেছে—এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই মৃত্যুচিন্তায় কবি কোনোরকম ভীত বা কাতর হন নি। পক্ষান্তরে, তিনি আত্মস্বরূপের জিজ্ঞাসায় অধীর হয়েছিলেন, এবং তার ব্যক্তিক ও আধ্যাত্মিক স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে ব্যাকুল বোধ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের স্বরূপ কি? ঈশ্বর ও মানুষের যথার্থ সম্পর্ক কি? এই জাতীয় দার্শনিক প্রশ্নের সমীক্ষায় তাঁর কবি-মন চিন্তান্বিত হয়েছে। একথা তিনি তো' স্পষ্টই জানেন যে মৃত্যু শেষ নয়, রূপ পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর অলাতচক্র পরিক্রমনর মাধ্যমে প্রাণী ধীরে ধীরে চিরমুক্তির দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু এই মৃত্যুর যথার্থ স্বরূপ কি? যে ব্যক্তি-জীবন সজীবতায়, মমতা ও কারুণ্যে, অনুভব এবং সংবেদনে এমন উজ্জ্বল, মৃত্যুর স্পর্শে তা লীন এবং হিমশীতল—এ কোন্ জাদু? এই ব্যক্তি-জীবনকেই বা চেনবার যথার্থ অভিজ্ঞান কি? এই জীবনের সঙ্গে তার অন্তর্লগ্ন সত্তারই বা কি পরিচয়—সে প্রশ্নও কবিকে আকুল করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্য পৃথিবীতে, প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে তাঁর যে বিচরণ—তারই বা যথার্থতা কি—তাও যেন বাহ্য সজ্ঞান কবিব জানা থাক—এমন একটি ইচ্ছা বিকীর্ণ হয়েছে কবির কাব্যে। এই জীবনের আয়ুর শেষ পথ-পরিক্রমায় তিনি এসে পৌচেছেন, তাই তাঁর শেষবারের মতো এমন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার আকুলতা! এই বুঝি তাঁর শেষ প্রশ্ন, এই বুঝি তাঁর শেষ উপলব্ধি, এই বুঝি তাঁর শেষ বাণী! কবি এরপর আর সময় ও সুযোগ পাবেন না—তাঁর এই নব জাগ্রত দার্শনিক চিন্তাজাত ফসল ভাণ্ডারে তুলে রেখে যেতে। তাই তিনি এই গ্রন্থের নাম রেখেছেন—'পরিশেষ'।

মৃত্যুর শাসনে কবি ভীত নন, সত্যের-স্বরূপ জানার জন্যে তিনি ব্যাকুল। মৃত্যুর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের কবি-কর্ম ও কবিসত্তার বিচার করেছেন যেমন, তেমন এই জগৎ ও জীবনের স্বরূপ কি—তা জানতে চেয়েছেন। একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। প্রণাম, জন্মদিনে, পান্থ, বালক, চিরন্তন, তে হি নো দিবসাঃ, অগ্রদূত, সাথি, আলেখ্য প্রভৃতি কবিতায় যেমন কবির সারাজীবনের কবিত্ব ও কবি-স্বারূপ্যের বিচার ও বিশ্লেষণচিন্তা রয়েছে—তেমনই জগৎ, জীবন ও সৃষ্টিলোক সম্পর্ক কবির জিজ্ঞাসা ও বিচার রয়েছে—অপূর্ণ, আছি, বর্ষশেষ, আহ্বান, দীপিকা, কানামাছি, আরেকদিন, দীপশিখা, রাজপুত্র, প্রতীক্ষা শূন্যঘর, দিনাবসান, ধাবমান, পুরাণ বই, বিস্ময়, অগোচর, সান্ত্বনা, ছোটোপ্রাণ, মৃত্যুঞ্জয় আগন্তুক, প্রাণ, জরতী, শান্ত, জলপাত্র আতঙ্ক প্রভৃতি কবিতায়।

এছাড়া কবি এযুগের বহু সমসাময়িক ঘটনার ওপর তাঁর চিন্তার আলোকপাত করেছেন। সে বিষয়েরও কিছু কবিতা আছে। যে সব ঘটনায় তিনি বেশীরকম পীড়িত ও বিচলিত হয়েছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্লোকের ভাবনাকে তিনি প্রকাশ করেছেন কয়েকটি কবিতায়। যেমন—প্রশ্ন, বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি, বধূ ইত্যাদি।

কবি 'পরিশেষ' গ্রন্থে তাঁর আত্মলীন প্রেমের অনুভূতি ও স্মৃতি রোমন্থন করেছেন;—তাঁর জীবন-দেবতামূলক যে সমস্ত কবিতা আমরা ইতঃপূর্বে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে পেয়েছি ও তাঁর লীলানুসারী অভিষঙ্গের সঙ্গী হিসেবে যে 'তুমি'-কে দেখেছি এতাবৎকাল—তারই স্বরূপ-সাধনার মধ্যে দিয়ে কবির পুরাণো স্মৃতি-চারণার উপলব্ধি দেখতে পাই—বিচিত্রা, আমি, ছদ্ম, নির্বাক, প্রণাম, ভীরু, বিচার, মিলন. মেবার রানী প্রভৃতি কবিতায়।

বিবিধ সুরের কবিতাও আছে 'পরিশেষে'। শুধু 'পরিশেষে' কেন, রবীন্দ্রনাথের সব কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই একটি কি দুটি বা তিনটি প্রধান ও বিশিষ্ট সুর—এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিচিত্র ধরনের ও বিভিন্ন সুরের বিবিধ কবিতার অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে। একই সময়ে বা পর্বে রচিত

কবিতাপুঞ্জ নিয়েই তাঁর এক একটি কবিতার বই সৃষ্ট হয়েছে, বিষয়ানুক্রমিক হিসেবে কবি তাঁর কবিতাগুলিকে সাজান নি। কালানুক্রমিক নিরিখকে প্রাধান্য দিয়েই তিনি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, এক সময়ে রচিত কবিতাগুচ্ছ তাই একটি বইতে স্থান পেয়েছে। সেই জন্যে সব কাব্যগ্রন্থেই একটি বিশেষ মূল-সুরের সঙ্গেই একাধিক সুর ধ্বনিত হয়েছে; বিবিধ বিষয় ও সুরের কবিতাও সেই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'পরিশেষে' বিবিধ সুরের কবিতাও স্থান পেযেছে—মুক্তি, দুয়ার, লেখা, নতুন-শ্রোতা, আশীর্বাদ, মোহানা, দুর্দিনে: ভিক্ষু, আশীর্বাদী, অবুঝ মন, পরিণয়, মানী, পথের সাথী, আশ্রম-বালিকা; নিরাবৃত, অব'ধ, যাত্রী, আঘাত ইত্যাদি।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যভ্রমণে যান এবং তখন তিনি দ্বীপময় ভারতের কয়েকটি শহর ও দেশ দেখে কয়েকটা কবিতা লেখেন—সেই কবিতাগুলি 'পরিশেষে'র একটি বিশেষ সম্পদ। যেমন সিয়াম, শ্রীবিজয় লক্ষ্মী বোরোবুদুর—এই জাতীয় কবিতার মধ্যে 'বলিদ্বীপ' নাম দিয়ে যে কবিতাটি কবি মায়ার্স জাহাজে বসে লেখেন—সেটি 'সাগরিকা' নামে সংস্কৃত হয়ে মহুয়া কাব্যগ্রন্থে ইতিহাস-চেতনার পটভূমিতে প্রেমের কবিতা হিসেবে সংকলিত হয়েছে। (সাগরিকা কবিতাটি তিনি ব-লি-দ্বীপকে লক্ষ্য করেই লেখেন। অনেক ব্যাখ্যাতা এই কবিতাকে কবির অন্তর্জীবনের প্রেমিক সত্তার প্রতি কবির উক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু কবিতাটা রচনার পটভূমির কথা স্মরণ করলে সাগরিকায় বালি ও ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাই আছে মনে হয়।) 'পরিশেষে'র অনেক কবিতাই কবি প্রকৃত দ্বীপগুলিতে ভ্রমণের সময় জাহাজে লেখেন। কবিতাগুলির নিচে তারিখ ও স্থানের উল্লেখেই তা বোঝা যায়।

'পরিশেষে'র বিশিষ্ট সুরের একটি কবিতা হলো 'প্রণাম'। এই কবিতাটি দিয়েই 'পরিশেষ' শুরু হয়েছে। নিজের স্বরূপ এবং কবিকৃতির বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যে কবির আকুলতা ছিল—একথা আমরা আগেই

আলোচনা করেছি। 'প্রণাম' কবিতায় কবি নিজের কাব্যকীর্তির বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনের প্রভাত বেলা থেকেই তিনি কাব্যসৃষ্টির প্রেরণায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। তারপর সুদীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করে এসেছেন, তাঁর সহযাত্রী দুর্লভ ধন-লালসায় কোন্ দুর্গম-পথে চলে গেল, কবি শুধু কোন্ এক গভীরেব মূর্ত স্পর্শের জন্যে আকুল হয়ে কাব্যবীণা বাজিয়ে চলেছেন, ফাল্গুনে তরুর মর্মে আত্মপ্রকাশেব যে বেদনা, কবি সেই সৌন্দর্য প্রকাশের বেদনাকে কাব্যবীণায় সুরমূর্তি দান করে চলেছেন। বিরাট ও অনন্ত যে বিশ্বসত্তা—তাঁরই স্পর্শের জন্যে কবি এই সাধনা করে এসেছেন। যশ, অর্থ, খ্যাতি—বাস্তবজীবনের এই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তিনি বড় কিছু বলে মনে স্থান দেন নি।

যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোরকোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ কবেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুব ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য-সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়ারৌদ্র, সে-দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে।

বিশ্বপ্রকৃতি চাইছে নিজেকে মূর্ত করতে, আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে, এ জন্যে প্রকৃতিব অন্তরে একটি নিগূঢ় বেদনার স্রোত বয়ে চলেছে, কবি সেই অব্যক্ত বেদনাকেই রূপদান করাব জন্যে বীণা ধরেছেন, কাব্য লিখছেন।

'বিচিত্রা' কবিতায় কবি 'পূরবী'-যুগের লীলাসঙ্গিনীব দোসরকে পেয়েছেন বলে মনে হয়। হারানো সেই লীলাসঙ্গিনীরই যেন স্মৃতি-অনুবর্তন। এই গ্রন্থেব 'কৈশোরিকা' কবিতারও সগোত্র এটি। এখানে কবি নিজের জীবনধারার স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছেন।

তাঁর জীবনদেবতা বা লীলাসঙ্গিনী তথা 'বিচিত্রা সঙ্গিনী' তাঁকে কেমন করে বিচিত্র জীবনপথ পরিক্রমার মধ্যে টেনে এনেছেন, কেমন করে তাঁকে দিয়ে লীলাবিলাসের চঞ্চল আসরে নামিয়েছেন—সেই কথা ব্যক্ত করেছেন—

আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে।

কিংবা,
জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।

কবি তাঁর কাব্যপ্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী জীবনদেবতার কাছ থেকে কবি-জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমার যে অনুভূতি ও রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের স্পর্শ পেয়েছেন—আনন্দ-বেদনার আস্বাদ জেনেছেন—কবি এই কবিতায় সেই ইতিহাসের কথা বলেছেন।

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু কখনো আঁখিজলে।

এই কবিতাটির মেজাজ বিগতকালের, বক্তব্যেও গোধূলিপর্বের নবীনতা নেই। বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোকে মুগ্ধনেত্রে কবি এই বিচিত্রা-রূপিণীকেই লীলাসঙ্গিনী হিসেবে পূরবীপর্বের স্মৃতিরই অনুধ্যান করেছেন।

কবির সত্তর বছরের জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই

উপলক্ষে তিনি 'পরিশেষ' গ্রন্থে সংকলিত 'জন্মদিন' কবিতাটি লেখেন। এখানে কবি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং এই সময়ে তাঁর অন্তর্লীন একটি আকাঙ্ক্ষার কথা এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বসত্তার স্পর্শ কবির একান্ত কাম্য, কবি পৃথিবীর এই ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিচিত্র রূপ-সাধনার মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত অরূপকে স্পর্শ করতে চান। বিশ্বসত্তারই অভিব্যক্তি হলো এই ইন্দ্রিয়গত রূপরসবর্ণগন্ধের প্রাকৃত জগৎ—কবি এ জন্মের ধূসর গোধূলি-লগ্নে বিশ্বরস-সরোবরে দেহমন ভরিয়ে নিতে চান। বিশ্বসত্তার বহিঃপ্রকাশই কবির কাছে তপস্বীরূপে ধরা পড়েছে, কবি তাকেই আহ্বান জানাচ্ছেন—কবির অর্ঘ্য গ্রহণ করতে। সহজ করে বললে এই রকম দাঁড়ায়—কবির অন্তরে যে সত্তা বাস করছে—যার অস্তিত্ব কবিকে সচকিত করে তুলেছে—সেই সত্তার কি ইচ্ছা সংক্ষেপে যাকে আমি একটু আগেই বলেছি যে কবির অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা—তাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। কবির সত্তা এই সুন্দর ধরণীর বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ উপভোগ করতে চান, বিশ্বসত্তার আনন্দপূত স্পর্শই তাঁর কাম্য। অর্থাৎ অংশ চায় পূর্ণকে ধরতে। সেই আংশিক সত্তা কাজ চায় না, খ্যাতি চায় না,—সেই সত্তা শুধু বিশ্বরসসাগরে ডুব দিয়ে ভালবেসে যেতে চায়।

আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধূলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি ওঠে যে-সহজ গানে
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে।

'পান্থ' কবিতার সুরও ঠিক এই রকম, কারণ জন্মদিন কবিতাটি লেখার পরদিনই তিনি এই কবিতাটি লেখেন ; তাঁর নিজের কবিসত্তা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এখানেও ব্যক্ত হয়েছে। তিনি মুক্তিপিয়াসী নন, আবার তিনি সাধকও নন। তিনি শুধু কবি। তিনি বলেছেন—

আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

তিনি নিজের অন্তর্লগ্ন সত্তাকে মহাপথিক বলে এই কবিতায় সম্বোধন করে বলেছেন যে এই মহাপথিক জন্ম জন্মান্তর ধরে চলেছেন, তাঁর মন্দির নেই, স্বর্গধাম নেই, চরম পরিণাম নেই, অনন্ত পথের পথিক ; কবির বহিঃসত্তাও এই পথে পাড়ি জমাতে চায়, কবিও এই পৃথিবী লোকে সকলের সঙ্গে চলতে চান, মুক্তি সাধনার দীক্ষা নিয়ে মানবলোক এবং প্রকৃতিলোক থেকে বিদায় নিয়ে নিরুদ্ধ যোগাসনে মুদ্রিতনেত্র হতে চান না। তাঁর প্রাণ যেন নদীপ্রবাহ। তিনি পৃথিবীর পারের দিকে। মনুষ্যলোকের তীরের স্পর্শ নিয়ে, আলোয় ছায়ায় চিত্রিত হয়ে সেই প্রাণপ্রবাহ বয়ে চলেছে। কবি এই প্রবাহেই ভেসে যেতে চান!

এই সময়কার ভাষণে এবং দু-একটি চিঠিপত্রে কবির এই রকমের একটি অভিব্যক্তি রূপলাভ করে। তিনি এবারকার জন্মদিনে অর্থাৎ 'পান্থ' কবিতাটি রচনার পরদিনই ('পান্থ' কবিতাটি লেখার তারিখ হলো ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৮) যে ভাষণ দেন—সেখানে তিনি বলেছেন যে তাঁর একটি মাত্র পরিচয় আছে, সে আর কিছু নয়, তিনি কবি মাত্র। "বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই তাঁর কাজ"।—এই ভাষণের একটি বড় অংশ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর লিখিত 'কবি-কথা' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে।[১]

'অপূর্ণ' কবিতাটিতে দার্শনিক মনের একটি উজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাই। মানবজীবনের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মনে যে চিন্তা জেগেছে—এখানে তিনি সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। এই কবিতাটির ভঙ্গীতে

কবি নিজের জীবন বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গেই মানুষের জীবনযাপনের দুঃখ-সুখ, প্রেম-অপ্রেম, আশা-নৈরাশ্যের একটি অনুভূতিময় চিত্র উপস্থাপিত করেছেন।

এই কবিতাটি কবি যখন লেখেন তখন এর নাম ছিল 'জন্মদিন', পরে প্রথম ও শেষ স্তবক বাদ দিয়ে তিনি এটি 'অপূর্ণ' নামে 'পরিশেষে' গ্রথিত করেন। "দার্জিলিং বাসকালে 'জন্মদিন' নামে একটি কবিতা লেখেন, প্রথম স্তবক বাদ দিয়া উহা অপূর্ণ নামে 'পরিশেষে' মুদ্রিত হয়; কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে এটিকে ধরা যাইতে পারে।"[২] কিন্তু ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে দেখা যাবে 'জন্মদিনে' কবিতাটির শুধু প্রথম স্তবক নয়, শেষের দুটি স্তবক আছে,—সেগুলিও 'পরিশেষে' বর্জিত হয়েছে।

কবি এই 'অপূর্ণ' কবিতায় পার্থিব জীবন-ধারণের রীতি বিশ্লেষণ করে সাধারণ জীবনের স্বরূপ বিচার করেছেন, তার সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের ছবি এঁকেছেন, স্বপ্ন-প্রেম, কামনা-বাসনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা—সব কিছুর কথাই এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

সংসার আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়-গোচর, কিন্তু মনের কল্পনা দিয়েও সংসারলোককে গড়ে নিই। এবং এটাই সত্য যে দৃষ্টি, শ্রুতি ও স্পর্শগম্যতার বাইরে যে বস্তু—তার জন্য এক গভীর আর্তি আমাদের মনকে গড়ে তোলে। আজ যা সত্য মনে হয়, কাল তার রূপান্তর ঘটতে পারে। আজ তর্কে যাকে প্রতিষ্ঠা করি, কাল সংশয়ে বা সন্দেহে তাকে বর্জন করতে পারি। এই ভাবে সত্য মিথ্যার ভাঙা গড়া চলে. জীবনের স্বপ্ন, প্রেম, জয়, পরাজয়—সব কিছুরই ওলোট-পালোট ঘটে, নিরুপাধিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিত বলে কোনো কিছুর আভাস শক্ত হয়ে দানা বাঁধে না; নিয়তই আমাদের ধ্যান ধারণার বদল চলতে থাকে।

হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,

কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব-তরে
কত-না আকাশ যাত্রা কল্পপক্ষ ভরে।

আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। মানব মনের এই অভীপ্সাই মানুষকে কর্মে প্রেরণা দেয়, আকাঙ্ক্ষা রচনায় শক্তি যোগায়, মানুষকে মানুষের মূর্তি দেয় : এই মানব-মূর্তিকেই কবি এখানে 'তুমি' বলেছেন।

কত জয়, কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

যে চিন্তা মানুষকে চালনা করে, সেই যেন রূপায়িত হয়ে বিশ্বসৃষ্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, ইচ্ছারই রূপ বদল ঘটেছে, আর ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

যে-চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
গড়িয়া প্রতিমা।
অসংখ্য এ রচনার উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

এই যে ইচ্ছা—মানুষকে চালনা করছে, তার স্বরূপ ত' আমরা ঠিক জানতে পারি না। সে ব্যক্ত হয়েও যেন কিছুটা অব্যক্ত, ধরা দিয়েও সে অধরা। ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে সে ইচ্ছার পূর্ণরূপ লাভ করার আগেই মানুষ লোকান্তরে চলে যায়, মৃত্যুর সামনে সেই ইচ্ছা তখন খণ্ডিত হয়। তাই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়, সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

কিন্তু এই অপূর্ণতাই কি সত্য ? জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার পর মহা-জীবনের যে ইঙ্গিত রয়েছে, সে জীবনের সত্য কি মিথ্যা ? যদি এই

অপূর্ণতাই চির সত্য হয় তাহলে আমাদের দুঃখের সান্ত্বনা কোথায়? অপূর্ণতা আপন বেদনায় যদি পূর্ণের আশ্বাস না পায়—তবে কি হলো? রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী, তিনি তাই অপূর্ণতার পারেও পূর্ণতা দেখেন—

ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধমূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

'আমি' কবিতার মধ্যে কবি জীবনদেবতার স্বরূপ সন্ধান করেছেন। আমাদের একথা অজানা নয় যে কবি প্রথমে সৌন্দর্যের মধ্যে এবং পবে প্রেমের মধ্যে অসীমের স্পর্শ পেয়েছেন। অরূপ প্রকৃতির জগতে সুন্দবের রূপ ধরে এসেছেন—'সোনার তরী এবং চিত্রা'র যুগের সৌন্দর্য-ধ্যানের মধ্যে এই চিন্তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। পরে প্রেমের মধ্যেই তিনি অসীমকে উপলব্ধি করেছেন। গোড়ার দিকের কাব্যে এই অসীমের প্রতি কবির অনুভূতি আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা যেন অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই 'পরিশেষ' গ্রন্থ থেকে কবি অসীমকে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন, তাঁর রহস্যময়তা নেই, আভাস ইঙ্গিত নেই, উপলব্ধি এখানে স্পষ্ট, অসীমকে কবি ভাবিক সত্যে নয়, বাস্তব সত্যের মধ্যে দিয়েই বুঝেছেন। 'আমি' কবিতাটিই আমার এই বক্তব্যের উদাহরণ। এখানে আমাদের কবির ঈশ্বর (তথা জীবনদেবতা) আব লীলাবাদী ঈশ্বর নন, উপলব্ধ আত্মার স্বরূপ বিশেষ। তাই তিনি প্রথমেই অসীম সম্পর্কে, কবির আত্মায় যিনি সর্বদা বিরাজমান সেই অনন্তরূপী ঈশ্বর সম্পর্কে (অনেকে এঁকেই জীবনদেবতা বলেছেন) প্রশ্ন তুলেছেন—তিনি কি তাঁকে ঠিক জানতে পেরেছেন। কবিব ব্যক্তিক সত্তার অতীত হয়েও এই অসীম সর্বত্র বিরাজমান।

যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে

সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনার পেরেছে জানিতে।

কবিতাটি একাধিকবার পড়লে অন্য একটা মানে মনে জাগে। ভাববাদী এই ব্যাখ্যার বাইরেও তখন কবিতাটির আরো একটি সুন্দর বিশ্লেষণ উপস্থিত করা যায়। আয়ুর পরিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ মানব-সত্তাকেই কি আমরা 'আমি' বলে চিহ্নিত করবো? বাইরের বিবিধ কর্মের মাধ্যমে এই আমিত্বের রূপ ধরা পড়ে, জন্মলগ্নে এর শুরু, মরণে এর শেষ।

ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

তবু অতীত স্মৃতি-সত্তায় আমিত্বকে আমরা উপলব্ধি করি, তাই মনে হয় —আমার সীমায় আমিত্ব বন্দী নয়। যে-আমি ছায়ার আবরণে লুপ্ত হয়েছে, সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময় পরিচয় কবি পেলেন। সুতরাং মানুষের আমিত্ব ক্ষুদ্র বন্ধনের দ্বারা গণ্ডীবাঁধা নয়, কবির বাণীতে সেই-আমি নতুন রূপলাভ করেছে।

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নাম কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে
সর্বত্রগামীরে।

মানুষের আমি যে শুধু তার জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী কালের ঘটনাবলীর যোগফলের পটভূমিতে ধরা পড়া বাইরের চেহারামাত্র নয়, অতীত

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা মানব-ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত বোধের সত্তাস্বরূপ।

'তুমি' কবিতাটিও জীবন-দেবতামূলক, তবে অতীতাশ্রয়ী। আগের 'আমি' কবিতার সুরই এখানে ধ্বনিত হয়েছে। মনে হয় একটি অপরটির পরিপূরক। তবে 'তুমি' কবিতার মধ্যে আত্মলীন প্রেমের রোমান্টিক চেতনার স্মৃতি-রোমন্থন দেখা যায়। যে কল্পিত নারীমূর্তি কৈশোর ও যৌবনে কবিচিত্তে রসের প্রেরণা দিয়েছে—কবি এখনো তাকে স্মরণ করছেন। কিন্তু পদ্ধতির রূপ বদলেছে। এই জীবনদেবতা এখন কবির অন্তর্লগ্ন সত্তায় স্থিতিলাভ করেছে, অর্থাৎ কবিতেই যেন মিশে গেছে।

একটু আগেই বলেছি যে কবি এই 'পরিশেষ' থেকে জীবনদেবতার স্বরূপকে স্পষ্ট করে চিনতে পেরেছেন। অতীতকালের প্রেমের বিচিত্র বিভঙ্গ যে মূর্তি গ্রহণ করে তাঁকে আপনার করে লীলাসঙ্গিনী রূপে তাঁর জীবনের সুখে দুঃখে একান্তভাবে লীন হয়েছিল, সেই নারীমূর্তি এখনো কবির চিত্তে আছে বটে তবে কবির কাছে সেই মূর্তি এখন অন্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। সেই মূর্তি অনাদি, অনন্ত, কবিই ভঙ্গুর, কবিই ক্ষণস্থায়ী।

> আমার নয়নে তব অঞ্জনে
> 		ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
> তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
> 		উদ্গাথা সুপবিত্র।
> অতল তোমার চিত্তগহন,
> মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
> তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
> 		অনিত্য আমি নিত্য
> মোর ফাল্গুন হারায় যখন
> 		আশ্বিনে ফিরে লহ।

তব অপরূপে মোর নবরূপ
তুলাইছ অহরহ।

একদা কবি তাঁর লীলাসঙ্গিনীর স্বরূপ না জেনেও তাঁর সঙ্গে একই তরীতে পাড়ি জমিয়েছিলেন, কবি তখন প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্যবৈচিত্র্যে তাঁর মূর্তি প্রতিবিম্বিত দেখেছেন, কবির গানে তাঁরই সুর-সৃষ্টি ঘটেছে; কবির সারা দিনমানে এই নারীই গান করেছেন, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে কবি তাঁর মূর্তিকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছেন না। অর্থাৎ মৃত্যুর সান্নিধ্যে এসে কবি জীবনদেবতার বাহ্যিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। কবির তাই প্রশ্ন—যে মূর্তি তাঁর বহুপরিচিত—আজ কোন্ আঁধারে সে গুপ্ত হলো? যে নারীমূর্তি নব নব ছন্দে তাঁর সংগীত সমৃদ্ধ করেছে—কবির সেই হাসিকান্না সুখদুঃখের বিবিধ অনুভবের ছন্দ কোথায় লুপ্ত হলো? কবি কেন তাঁর চেনা সুখকে দেখতে বা জানতে পারছেন না? কবি নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তার সারাজীবন ব্যাপ্ত করেই যে জীবনদেবতার অধিষ্ঠান, কবি যেহেতু তাঁকে একান্তভাবেই নিজের মধ্যে চেয়েছেন,—তাই কবির 'তুমি' এখন আর ভিন্ন সত্তা নন। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করছেন—

আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়।

আগে 'বিচিত্রা' কবিতায় যে সুর শুনেছি, 'তুমি' কবিতার মধ্যে সেই সুরেরই অনুরণন। অবশ্য কবি এই সময় চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন, এবং ছবি আঁকায় গভীর মনোযোগ দেন, ছন্দোদাত্রী জীবনদেবতা কি এখন সুপ্ত—এই রকম একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিতও এই কবিতায় যে নেই—তা নয়। এই আলোকেও কবিতাটির একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে।

'আছি' কবিতায় কবি নিজেকে মাটির মানুষ ভেবেছেন—অতি সাধারণ

মানুষ যেমন করে জীবনকে উপলব্ধি করে—কবি তেমন করে নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। প্রকৃতির জগতে গাছপালা যেমন বাহ্যিক দিক থেকে একান্ত সত্যবস্তু, কবি নিজেকেও ঠিক তেমন সত্যবস্তুরূপে ভেবেছেন। তিনি পার্থিব বা প্রাকৃতিক দৃশ্যবস্তু ছাড়া অন্য কোনো প্রজ্ঞালোকের তুরীয় বোধের সামগ্রী—একথা আজ আর তিনি স্বীকার করতে চান না। তিনি প্রকৃতিলোকের ওই ছাতিম গাছটার মতোই অস্তিত্বসম্পন্ন, মাটিরই মানুষ; এখানে তিনি সেই কথাই ঘোষণা করছেন—

ওই যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি;
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।

'বালক' কবিতাটিতে সহজ প্রাণের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। কবি আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অতীত বালককালের স্মৃতি-স্বপ্ন মনে করার প্রয়াস পেয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জীবনের চলমানতার বাস্তবিক দিকের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। আজ তাঁর সত্তর বছর বয়স পার হয়েছে, আসন্ন মৃত্যুর সীমানায় তিনি প্রবেশ করতে চলেছেন। তাই আজ অন্তরের জানালা দিয়ে তিনি পিছনের ফেলে আসা পথখানি বিচার করেছেন। 'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থের স্মৃতিচারণা থেকে এখানে স্মৃতি রোমন্থন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর মনে পড়ে—যখন তিনি বালক ছিলেন—তখন কত না দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে উঠতো, আজো বয়সের ভারে যখন তিনি শ্রান্ত, তখনো অভিজ্ঞতার মারফত মনের জানালা দিয়ে কত না দৃশ্যবস্তু এসে জড়ো হয়েছে। আজ বাইরের দৃশ্যপটের পার্থক্য ঘুচে গেছে মনের চেতনার পর্দায়, আকাশের নীল বনের সবুজ ছায়া—সব একাকার হয়ে গেছে। কবি উপলব্ধি করছেন—মনের কোনো এক দেবতা তাঁকে এই রকম বিমনা করেছেন। একটা সহজ আত্মতন্ময়তার সুর এই কবিতাটিকে

স্নিগ্ধ এবং কোমল করে তুলেছে।

'পরিশেষে'র 'বর্ষশেষ' কবিতাটির সুর কিন্তু পূর্ববর্তী কবিতাগুলি থেকে কিছুটা পৃথক। 'বর্ষশেষ' বললে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা'য় গ্রথিত 'বর্ষশেষ' কবিতাটি বেশী সময় চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু সেটির রচনাকাল হলো ১৩০৫ সালের তিরিশে চৈত্র ; আর এই 'বর্ষশেষ' কবিতা তার আটাশ বছর পরে অর্থাৎ ১৩৩৩ সালের ৩০শে চৈত্র লেখা। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কবি জীবনের ফেলে আসা সমগ্র পথরেখাখানির দিকে তাকিয়েছেন, তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে, জীবন-সূর্য পশ্চিম আকাশে, কিন্তু কবি এই সময়ই পূর্ব ও মধ্য গগনের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করলেন। দুঃখের রোমন্থন আজ আনন্দরূপে প্রতিভাত।

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।
কত দিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে।

যাঁরা মানবশ্রেষ্ঠ—কবি যে তাঁদেরই আত্মীয় বলে জেনেছেন। এই পৃথিবীতে তিনি মনুষ্যজন্ম পেয়েছেন—এজন্যে তিনি ধন্য। ছোট্ট পরিবেশ থেকেও তিনি বৃহৎকে দেখেছেন, ধূলির আসনে বসেও ভূমার সাধনা করে গেছেন, সীমিত জগতের মধ্যে বসেও তিনি অসীমকে উপলব্ধি করেছেন।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

কবি তাই মৃত্যুকে অনুরোধ করছেন—সব অবগুণ্ঠন মুক্ত করে দিয়ে সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলতে। এই 'বর্ষশেষ' কবিতা প্রসঙ্গে রানী দেবীকে লেখা একটি চিঠি পড়া দরকার—কারণ বর্ষশেষের মানসিক উপলব্ধির কথা তিনি ঐ পত্রে ব্যক্ত করেছেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের তেরো নম্বরে ঐ চিঠিখানি সংকলিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

'মুক্তি', কবিতাটিকে 'পরিশেষে'র যুগের কবিতা বলা চলে না। অতীত-চারী কবির মন—এই 'মুক্তি' কবিতাতে তার প্রকাশ। কবি চির-সুন্দরের কাছে সাহস চান, শক্তি চান,—যে শক্তি বা সাহস অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজেই যা কুঁড়িকে ফুলে পরিণত করে, প্রকৃতির প্রকাশকে সহজেই পূর্ণ করে তোলে, কবি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে যাতে ভুলে গিয়ে সহজ সুন্দরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন—সেই অক্ষুব্ধ সাহস এবং বিস্মৃত শক্তি প্রার্থনা করছেন।

'মুক্তি'র দু নম্বর কবিতায় দেখি কবি নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চান। ('খেয়া' রচনার সময়কার প্রতীক্ষমাণ কবিকে মনে পড়ে যায় যেন) নিজের জীবনের বেলা পড়ে এসেছে, দিন যেমন নির্ভয়ে অন্ধকার রাত্রের মধ্যে পথ মনে করে নেয়, তেমন ভাবেই কবি নিজেকে বের করে নিয়ে সুন্দরের সাহচর্য চান। অলক্ষ্যের পথে মহাসমুদ্রের পথে কবি তার দয়িতের সান্নিধ্য কামনা করেন। এই সুরটি রবীন্দ্রকাব্য পাঠকদের কাছে অপরিচিত নয়।

'আহ্বান' কবিতায় কবি জীবনদেবতাকেই সম্বোধন করেছেন। এই কবিতাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকসমাজে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গেছে। নিজের অন্তর-সত্তাকেই কবি ডাক দিয়েছেন এবং এ সত্তাকেই আমরা জীবনদেবতা বলে অভিহিত করতে পারি। কবি এতাবৎকাল প্রকৃতির স্নেহশীতল সাহচর্যলাভ করেই কাল কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন জীবনদেবতা ভয়াল ভীষণ ভেরি বাজিয়ে কঠোর পথে ডাক দিতে চান—মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার কাজে পৃথিবীর পীড়িতকে সেবা

করার জন্যে আহ্বান জানাতে চান। কবি এখানে মানবজীবনের সত্যকারের কাজের স্বরূপ চিত্রিত করতে চান। তাই জীবনচর্যার যে আদর্শ এতদিন কবিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, কবি এখন তা থেকে সরে গিয়ে নতুন পথে জীবন-সত্য ও নতুন কর্তব্যবোধের মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন।

ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিভিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।

ছোট্ট 'দুয়ার' কবিতাটির মধ্যে কয়েকটি সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। কবির, অন্তরের সম্পদ কবি দেখতে পান নি বা উপলব্ধি করতে পারেন নি,—হৃদয়ের দুয়ার ছিল খোলা, তবু সংশয় তাঁকে সেই দুয়ার দিয়ে প্রবিষ্ট হতে নিরস্ত করেছে। আবার এই বিরাট ও পরিব্যাপ্ত পৃথিবীই যেন অনন্ত লোকে প্রবেশের দুয়ার, সেই পথ দিয়ে অনন্তের কাছে যাওয়া যায়। ভাবলোকেব পথ হতে দেবলোকের পথে নিয়ে আসাই যেন দুয়ারের কাজ, বীজ থেকে অঙ্কুর, ফুল থেকে ফল তাই যেন দুয়ারের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে রূপ লাভ করে। দুয়ারে স্পষ্টতার মধ্যে, পরিচয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করায়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও মানুষ যে অমর-লোকে যায়—সেই মৃত্যুও যেন দুয়ারের মতো। জীবলোক আর মুক্তিলোকের মাঝেই এই দুয়ার। মৃত্যু চিন্তা কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি সুর এই 'দুয়ার' কবিতাটিতেও পরোক্ষভাবে সেই সুর বিধৃত হয়েছে।

জীবন ও মৃত্যুর প্রতি কবির বর্তমানে কি দৃষ্টিভঙ্গী তা কিন্তু 'দীপিকা'য় দেখা যায়। জীবন প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করে এগিয়ে যায়: অন্ধকারকে মুছে দিয়েই রাত্রির তারার মালা জ্বলে। তেমনি এই জীবন বিরুদ্ধ শক্তিকে হারিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে নব চেতনার, আনে নতুন গতি, পুরানোকে মুছে দিয়ে নতুনকে স্থান করে দেয়। প্রকৃতির

জগৎ বস্তুজগৎ এক কথায় বহির্জগৎ, আজ আছে, কাল নেই ;—এই নশ্বরতার মধ্যে প্রাণধারার চিরচলমানতা ধারাবাহিকভাবে বয়ে চলেছে। তাই প্রাণকে কবি নদীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন পথিক তটিনীর মতোই এই প্রাণ, কত নতুন বিচিত্র দেশগ্রাম অতিক্রম করে মরণ মহাসাগরের মধ্যে গিয়ে মিশেছে। নদীর মতোই প্রাণের শাশ্বত অভিযাত্রা চলছে। মৃত্যুকে কবি শেষ পরিণতি ভাবতে পারেন নি, প্রাণ নটিনীর নব নব তান তিনি বহু জন্মের মধ্যেই শুনেছেন। জীবনকে তিনি অসীমেরই অংশবিশেষ বলে ধরে নিয়েছেন।

জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে সেথা মেশে বারিধার
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
ছুটিছে পথিক তটিনী।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণনটিনী।

কালধর্মে পুরাতনের স্থান বড় পাকা নয়, নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে নেপথ্যে সরে যেতে হয়। এই হলো প্রকৃতির নিয়ম। মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়া হয়, পূজা শেষে নিরঞ্জন হয়। এবং বিসর্জনের মধ্যে দিয়েই সেই প্রতিমা আবার ধূলিস্ম প্রাপ্ত হয়। অনাগতযুগের শিল্পী সেই ধূলিকণা দিয়েই আবার নতুন শিল্প রচনা করবে, নতুন ছাঁদের নতুন প্রতিমা গড়বে। প্রকৃতির জগতেও আমরা দেখি যে পুরানো পাতা ঝরিয়ে দেবার পর নবপত্র ও পল্লবোদ্গমের আয়োজন শুরু হয়। 'লেখা' কবিতার এই ভাব।

'নূতন শ্রোতা' কবিতাটির মধ্যেও এই ভাব। কবি বলেছেন যে তাঁর খেলার আসর যখন ভাঙতে চলেছে—তখন তার নাতি নন্দগোপালের খেলা জমে উঠেছে। নতুনের স্থান করে দিতে হয় পুরাতনকে,—এই

হচ্ছে কালধর্ম। কবি এজন্যে প্রস্তুত।

আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি,
আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।

বালিদ্বীপের পথে জাহাজে বসেই কবি 'নূতন শ্রোতা' কবিতার প্রথমাংশ লেখেন, দেশে ফেরার পথে লেখেন শেষাংশ।

এই কবিতা রচনার প্রায় মাস দুয়েক আগে কবি 'নূতন কাল' শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন। 'যাত্রী' গ্রন্থে কবি এই নূতন কাল কবিতাটির পটভূমি হিসেবে দুচারটি কথা বলেছেন,—এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'নূতন কাল' কবিতাটির ভাবও তাতে সহজে ধরা যাবে। বর্তমান কালকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে, অতীত-চারিতার অসম্ভব প্রীতির জন্যে নতুন কালকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বালিদ্বীপে বাংলি রাজের কোনো এক আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসবে কবি নিমন্ত্রিত হয়ে গেছেন। রাজবংশের কার যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের কোনো চিহ্ন ছিল না, কারণ রাজার মৃত্যু হয়েছিল অনেক দিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা স্বর্গে দেবলোকে প্রবেশের অধিকারী, সেই জন্যেই এই উৎসবের আয়োজন। অতীত কালের পদ্ধতি বজায় রেখে অন্ত্যেষ্টি উৎসবের আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে, বর্তমান কালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করার জন্যে। এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমানকালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত—মনে থাকা উচিত—তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।

এই ভাবটাকে আমি একটি ছোট কবিতায় লিখেছি"।[৩] সেই ছোট কবিতাটিই হলো এই 'নূতন কাল'। 'পরিশেষ' গ্রন্থের সংযোজন অংশে ২১৪ পৃষ্ঠায় 'নূতনকাল' কবিতাটি রয়েছে।

'আশীবাদ' কবিতাটি নিতান্ত সাময়িক, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে কবির আশীর্বাণী। নবীন প্রাণের নির্বারিত স্রোত চিরদিন অসত্য, অন্যায় ও অকল্যাণকে দূর করে নিজের জয়যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কবি নিজেকে এখানে স্থিতধী স্তব্ধ প্রাচীন সরোবরের সঙ্গে উপমিত করেছেন।

দেশে ফেরার সময় ইরাবতী নদীর মোহনায় কবি দেখেন যে অসীম সমুদ্রের সঙ্গে মাটি ঘেষা নদী ইরাবতীর মিলন হয়েছে। সমুদ্রের গায়ে নীল জলে মেটে রঙ ঘুলিয়ে উঠেছে মোহনার মুখে খানিকটা জায়গায়। তটের সঙ্গে মিশে মাটির গন্ধে ধরা দিয়ে সমুদ্র বিলাসে উদ্বেল হয়েছে বটে, কিন্তু এই ঘোলাটে জলে তারার স্বচ্ছ আলো প্রতিবিম্বিত হবে না, এ যেন ইচ্ছা করে স্বাধীন সমুদ্রের বাঁধন পরার খেলা। বিরাট যে, অসীম যে, সে যে কখনো বন্ধনের বা সীমার ক্ষণ চেতনায় বাঁধা পড়ে না। সমুদ্র ইচ্ছা করেই এই মিথ্যা পরাজয়ের খেলা খেলছে! 'মোহানা' কবিতার ভাব হলো এইরকম।

নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়
মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।
বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল।
এ লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,
একটুখানি মাটির লাগে নেশা।
বিপুল তব বক্ষ 'পরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ।
ধুলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।

কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষ জাল।

১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ বক্‌সাদুর্গের রাজবন্দীরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। কবি তখন দার্জিলিং ছিলেন—তাঁর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি 'বক্‌সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটি লিখে পাঠান। ("বক্সা দুর্গের বন্দী যুবকদের দ্বারা ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কবিব উদ্দেশে তাঁরা অভিনন্দন পাঠ, 'জনগণমন' গান এবং 'শেষবর্ষণ'-এর অভিনয় করেন। দার্জিলিঙে তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র কবির হস্তগত হয় বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি কবি তাঁহার সম্ভাষণ পাঠাইয়া দেন ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮")[৪]

কবিতাটির বক্তব্যও সুন্দব এবং উপযোগী। রাত্রি অন্ধকাব ধরে আছে বটে, কিন্তু সূর্যের বন্দনার দ্বারা রাত্রিকে লজ্জা দেওয়া হলো। রাত্রি বাইরেটাকে আঁধারে ভরে রাখতে পারে, কিন্তু প্রাণকে পারে না। পাখি খাঁচার মধ্যে বাঁধা থাকতে পারে, কিন্তু তার গান গাওয়া বন্ধ করা যায় না। বহিঃশক্তি বাইরেটাকে ঢাকতে পারে, কিন্তু মনকে বাঁধতে পারে না। মনের সৃষ্টিশক্তি ও স্বাধীন চিন্তা বাইরের পর্দা দিয়ে ঢাকা যায় না। অঙ্কুর মাটি ফুঁড়ে আকাশে ওঠে। প্রাণ দিয়েই মানুষ প্রাণের মূল্য অর্জন করেছে—এই সাধনার পথকে রুদ্ধ করা যায় না।

'দুর্দিনে' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্র-মানসের একটি বড় পরিচয় বিবৃত হয়েছে ; কবি প্রত্যহের জীবনচর্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। যদিও মাঝে মাঝে দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, নিশিনিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি তাঁর চেতনাকে আহত করেছে—তবু সেই—প্রাত্যহিক জীবনযাপনের লাভ লোকসান অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। এই যে বাস্তব দুঃখ-দুর্যোগ-জর্জর জীবন—তাকে প্রাধান্য না দিয়ে চিরন্তন জীবনধারার একটি গতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত আশা ও বিশ্বাস পোষণ করে বস্তুজগতের ক্ষণিক বেদনাকে মুছে ফেলার সাধনা—রবীন্দ্র কাব্যধারার একটি বড়

কথা। 'হুর্দিনে' কবিতাটির মধ্যে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

বাস্তব সংসারের হুর্দিনের সামনে মানুষকে পড়তেই হয়, কিন্তু নিত্য-দিনের এই লাভ লোকসানকে যদি বড় করে না দেখা যায়, যদি মনে-প্রাণে চিরন্তনের বাণীকে সার্থক করে তোলা যায়, তাহলে জীবনে ক্লেদ অনেকটা কমে। দৈন্য হুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, আবর্জনা দূরে যায়, ভয় সংশয়—সব কিছু ডুবে যায়, নিখিলে ব্যাপ্ত বিরাটের স্পর্শে আপন অন্তর পবিত্র হয়ে সুন্দর হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে।

সাময়িক ঘটনার দ্বারা কবি বিক্ষুব্ধ হন—এবং 'প্রশ্ন' কবিতাটি সেই বিক্ষুব্ধ বেদনারই প্রকাশ। মেদিনীপুরের হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর গুলি চলে এবং গুলিতে কয়েকজন বন্দী নিহত হন, বেশ কয়েকজন আহত হন। কবি ব্যথিত হন এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে মনুমেণ্টের ধারে এক প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং সুদীর্ঘ একটি ভাষণ দেন। ১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসীতে এই বিষয়ে সংবাদ আছে।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হন। লণ্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিলে যোগ দেবার জন্যে তিনি ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে যান, সেখানে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে তিনি ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে দেশে ফিরলেন। এবং ইংরেজ সরকারের ওপর দেশব্যাপী বিক্ষোভ ঘনিয়ে ওঠে। ৪ঠা জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

ঠিক এই সময় কোলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি-উপলক্ষে দেশবাসী বিরাটভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জয়ন্তী উৎসব বন্ধ করেন।

"রবীন্দ্রনাথের মনে ভরসা ছিল মহাত্মাজী এই পীড়িত দেশে মুক্তি আনিবেন কিন্তু তাহার মধ্যে যে বাধা কত তাহা কেহই জানিতেন না। মহাত্মাজীর এই অপ্রত্যাশিত বন্ধন কবিকে সেদিন খুবই বিচলিত করিয়াছিল। দেশের নানা অশান্তির ব্যাপারে মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত;

তিনি সেই সময়ে লেখেন 'প্রশ্ন' (পরিশেষ)।"[৫]
ঈশ্বর প্রেরিত শান্তিদূতের ওপর যে নির্যাতন চলছে—তার কি কোনো প্রতিকার নেই ? প্রচণ্ড অন্যায় ও অত্যাচারের রথচক্রে সকলেই পিষ্ট, পরম কারুণিক মানবপ্রেমিক ঈশ্বর কি তাদেরও সমানভাবে ভালো-বেসেছেন ? কবি এই প্রশ্ন করছেন।
'ভিক্ষু' কবিতায় কবি নিজের অন্তরকেই ভিক্ষুরূপে কল্পনা করছেন। যতক্ষণ এই সংসারের বাহ্য সৌন্দর্য কুড়োবার জন্যে মন সচেষ্ট থাকে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই আন্তর জীবনের অমেয় শান্তির ভাণ্ডার দেখতে পাই না। ভিক্ষুক চেষ্টা করে বাস্তব জগতের ধনরত্নে তার ঝুলি পূর্ণ করতে, কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে তার চিত্ত নির্মল হয়ে উঠতে পারে না। তারার কাছে আলোর কণা ভিক্ষা চেয়ে রাত্রি ত' অন্ধকারের সাগর পার হতে পারে না, পরিপূর্ণ দান আসে প্রভাত আলোকে, তেমনি মন যদি বাহ্যজগতের তুচ্ছ ধনরত্নের জন্যে মত্ত হয়—তা হলেও ত' মনের অভ্যন্তরে যে গোপন রাজার রাজত্ব, সেখানকার প্রসন্নতা লাভ করতে পারা যায় না।
শ্রীযুক্ত অমল হোমের মেয়ে অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে একটি ফরমায়েসী কবিতা হলো 'আশীর্বাদী'। কবি তখন দার্জিলিঙে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং এ সময় তাকে বহু ফরমায়েসী লেখা লিখতে হয়। 'আশীর্বাদী' এই জাতের কবিতা। কবি এখানে বলছেন যে শিশুর নির্মল মন ও দেহ যেন প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে লাভ করা যায়—কবি এই অরূপের ছোঁয়া এই শিশুর মধ্যেও ধরতে পেরেছেন। কবি এই অমৃতরস পান করার জন্যেই আকুল। কবি কামনা করছেন শিশুর চিত্তের সরল নির্মল প্রাণধারা থেকে যে অমর সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে—কবিও যেন তাঁর সারা জীবনের সাধনায় ঐ সংগীতকেই পুষ্ট করতে পারেন।
যদিও 'আশীর্বাদী' কবিতা রচনার প্রায় বছর পাঁচেক আগে 'অবুঝ মন' কবিতাটি লেখা—তবু এই দুটি কবিতার মধ্যে সমধর্মী একটি সুরের গুঞ্জন করছেন। যুক্তিতর্কের বেড়াজালে শিশুর মন ভারাক্রান্ত নয়।

প্রকৃতির উদ্দাম জীবন-প্রবাহের মধ্যে সেই মনও একটি বিন্দুবিশেষ। এ যেন বিধাতারই সৃষ্টি। কবি শিশুর এই অবুঝ ভোলা মন উপলব্ধি করছেন। মানুষের মধ্যেও এই অবুঝ মন বাসা বেঁধে রয়েছে। মানুষের সমগ্র ইতিহাসের প্রয়াস ডিঙিয়ে সে অন্তরের পথে এই মনকে বিকীর্ণ করে দিতে চায়, বাস্তব সংসার ছাড়িয়ে তার মন কখনো বা তেপান্তরের মাঠ বন পেরিয়ে যায়, স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে দিয়ে এই জগৎ-সংসারকে একান্ত বিচিত্র করে তোলে।

'পরিণয়' কবিতাটি সাময়িক তাগাদার ফসল। সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহোপলক্ষে রচিত। বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে ইনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। মূর্তিমান আনন্দ আজ এই বিবাহের মধ্যে দুটি নব-পরিণীত জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই আনন্দ প্রেমেরই প্রতিরূপ। এতদিন কল্পনায় ও শিল্পসাধনায় এর অস্তিত্ব ছিল—এখন এ বাস্তব হয়ে দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বীপময় ভারত বেড়িয়ে ফিরছেন—সেই সময় পেনাঙ বন্দরে বিজয়া দশমীর ঠিক আগের দিন ব্যাপকভাবে ঝড়জল শুরু হয়, কবি তখন 'চিরন্তন' কবিতাটি লেখেন। তিনি অনন্ত জীবনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন– বিশ্বের যা কিছু রমণীয় ও সুন্দর -তার সঙ্গে অসীমকালের অনির্বচনীয়তার একটি গভীর যোগ আছে। বাল্য-কালে গঙ্গাতীরে নিভৃতে পল্লীচ্ছায়ে কোকিলের গানের মধ্য দিয়েই কবি সেই অসীম সুন্দরের সুর শুনেছিলেন।

এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের 'পরে।
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন-মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীম কালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, "তুমি আমার প্রিয়।"

আজ পৃথিবীব্যাপী মারামারি-হানাহানি, হিংসাদ্বেষ; আধিপত্যে মানুষ আজ দিশেহারা। কবি এরই মধ্যে পরম শান্তির বাণী, অনির্বচনীয়ের বাণী শুনতে পেলেন কোকিলের ডাকে। এই বাণীই চিরন্তন—আর যা কিছু তা শাশ্বত নয়। চিরদিনের সৌন্দর্য সাধক কবি চির-সুন্দরের শাশ্বত অভিব্যক্তির স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

'কন্টিকারি' কবিতাটিতেও কতকটা এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যা তুচ্ছ বা অবহেলিত—তাও অসীমের জয়গানে মুখরিত—একথা কবির চেয়ে আর বেশী করে কার উপলব্ধি? ধূলিকণাটিরে তুচ্ছ কবে দেখলে মিথ্যায় ঘেরে। 'কন্টিকারি'তেও কতকটা সেই কথা। কন্টিকারি এক বকমেব কৌলিন্যহীন বৃক্ষলতা। প্রকৃতির বুকে যে সব বৃক্ষলতা আপন গৌরবের আনন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছে—কবি তা দেখে বিস্মিত হয়েছেন, এবং প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে বসে তিনিও শিল্পসৃষ্টিব মাধ্যমে অনন্তকে স্মবণ করেছেন।

আজ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কবির সে কথা মনে পড়ছে, বিশেষ করে মনে পড়ছে একটি কন্টিকারি দলের গাছকে যে মাটির সঙ্গে বাঁধা থেকেই অনন্তের অভিনন্দন রচনা করে গেছে। শেষপর্বের কাব্যে কবি তুচ্ছকে উচ্চতার মঞ্চে বসিয়েছেন। এই সময়ের এটি তাঁর একটি প্রিয়ভাব।

'আরেক দিন' কবিতাটির মাধ্যমে কবি নিজেব বর্ষীয়ান্ জীবনেব একটি প্রচ্ছন্ন বেদনাকে রূপায়িত করেছেন। পঁচিশ বছর আগে কবির প্রয়োজন ছিল সংসাবে, বাস্তব জগতেব একজন আবশ্যকীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই তিনি থাকুন—তাঁর তখন প্রয়োজন ছিল—আজ যেমন নবীন জীবনের অধিকর্তাদের আছে, তাদেরকে কেন্দ্র করে দুঃখ সুখ, স্নেহপ্রেমের আবর্ত রচিত হয়, তেমনি কবির একদা কদর ছিল। কিন্তু আজ তিনি মৃত্যুর সীমানালোকে এসে পৌঁছেছেন—এখন আর তাঁর প্রয়োজন নেই—এই বেদনাই এখানে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন পথিকে,—
'মাথা খেয়ো কাল কোরো না দেরি।"
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ-বছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকর-ঢালা পথের 'পরে ডাক-পিয়নের পদধ্বনির সুরে।

কবি উপলব্ধি করছেন—সে দিন আর নেই, 'তে হি নো দিবসাঃ'তে। মায়ার্স জাহাজে বসে ভারত মহাসাগরের বুকে কবি বৃহত্তব ভারতে পাড়ি জমাতে জমাতে এই কবিতাটি লেখেন। আজকের সাগর জলে আলোছায়ার যে লীলাখেলা, তা একদা কবিব প্রাণকে উদ্বেল করে তুলেছিল, সেই সময়ের প্রতিবেদন আজ কোথায় গেল? কবি নিজের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। কবি তখন ত' নিজের আনন্দ বেদনার উপলব্ধিকে অজানা কোন্ অনন্তের উদ্দেশে সমর্পণ করতেন! কবি আজ এই স্মৃতির বেদনায় পীড়িত।

'দীপশিল্পী' কবিতাটিতেও মৃত্যুর বেদনা কবি স্পর্শ করছেন—দেখতে পাওয়া যায়। কবি বেশ বুঝতে পারছেন যে তাঁর আর সময় নেই। তাঁর জীবনের শেষ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যেই আজ তিনি একটি দীপ রচনা করলেন, সেই দীপে দীপ্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে বিরাজ করে— শিখার মধ্যে যেন সত্যকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহলেই কবি নিজের জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করবেন।

'মানী' কবিতাটিকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কবি নিজের অন্তরলোকের দেবতাকে ডেকে এই প্রশ্ন করছেন যে আভিজাত্যের বেড়াজালে বাঁধা থেকে সম্মানের উঁচু বেদীতে বসে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি শুধু মিথ্যা স্তুতিতেই বেঁচে আছেন। সহজ প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথ গোধূলি-পর্যায়ের কাব্যে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কাছে আত্মীয়রূপে এসে হাজির হচ্ছিলেন। এই সময়ে তাঁর পরিচয় ঘোষণা করার সময় তিনি আন্তরিকভাবেই বলেছেন যে তিনি জনসাধারণের লেখক—এই হোক তাঁর শেষ পরিচয়। আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে নয়; সৌন্দর্যের পূজারী হিসাবে তুরীয়মার্গের কবি বলেও নন, তিনি জনগণের কবি—এই চিন্তাই এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টির আলোকেও 'মানী' কবিতাটির ব্যাখ্যা করা দরকার। এখানে তিনি বলেছেন যে যাঁরা গর্বোদ্ধত, সাধারণ মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে যাঁরা বাঁচেন—তাঁরা প্রাণহীন সম্মানে ভূষিত হন, রঙ করা নিষ্প্রাণ পুতুলের মতোই পূজা পান, সত্য ও সজীবতার সাক্ষাৎ পান না। রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণ মানুষের কবি—এখানে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে!

পরিশেষের যুগে কবি মাঝে মাঝে স্মৃতিলোকে শরণাশ্রিত হয়েছেন। 'রাজপুত্র' কবিতাটি যৌবনবোধের প্রতীক। রূপক বা রূপকথার ছলের কবিতা। এই রূপকতার আড়ালে কবির মনকে ধরা যায়। কবির মন এখানে স্মৃতিভারাতুর। তিনি নিজের অন্তরে আজ বহু আগেকার যুগে ফেলে আসা বিস্মৃত যৌবনের প্রচণ্ড আবেগকে স্মরণ করতে পারছেন। মৃত্যু তাঁর কাছে আসছে—এই নিষ্ঠুর সত্য কবির কাছে ধরা পড়েছে, ঠিক এরই সঙ্গে সঙ্গে কবি উপলব্ধি করতে পারছেন যে তার যৌবনও যেন তাঁর কাছে বাণী পাঠাচ্ছে, তার অন্তরের জাড্য, শৈথিল্য দূর করে নবজীবনের উদ্দাম আবেগে যৌবন নতুন করে তাঁকে গড়তে চায়। নিজের যৌবন সম্পর্কে কবি এখানে নতুন এক দৃষ্টিতে তাকালেন।

'অগ্রদূত' কবিতাটিকে সমসাময়িক ঘটনার ভিত্তিতে বিচার করলে এর এক মানে দাঁড়াবে, আবার কবির অন্তর-জীবনের তত্ত্বকথার দিক থেকে আলোচনা করলে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ হয়ে দাঁড়াবে। কবির অন্তরের অথবা অরূপের সাধনা চলেছে রূপের মাধ্যমে। তিনি রূপের পদ্মেই অরূপ মধু পান করেছেন—এ ঘোষণা তাঁর কাব্যে নতুন বা আকস্মিক

নয়। এখানেও সেই সুরের ছোঁয়াচ রয়েছে। কবি নিজের অন্তরকেই পথিকরূপে সম্বোধন করে বলেছেন যে তিনি একাই নিজের জীবনপথে পরিক্রম করে চলেছেন। তিনি অনন্ত অসীমের স্পর্শ পেয়েছেন, অদেখার দেখা পেয়েছেন—যে পথে কারুর পায়ের চিহ্ন পড়ে নি, সেখানে তিনি পরিভ্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। দুর্গমতা দুঃসাধনা এবং দুর্লজ্ঘ্যতার পথেই তিনি এগিয়েছেন। সেই পথে নিজের বিশ্বাসই তাঁর পাথেয়-স্বরূপ ছিল।

কিন্তু এই 'অগ্রদূত' কবিতাটিকে বাস্তবানুগ ঘটনার ভিত্তিতে পাঠ করবার জন্যে রবীন্দ্রকাব্যের রসিক বোদ্ধারা ইঙ্গিত করেছেন। দ্বিতীয় গোল-টেবিল ব্যর্থ হবার পর স্বদেশে ফিরে এসে মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হন,—এবং এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে ব্যথিত এবং বিচলিত করে। কোলকাতায় এ সময় তাঁর সত্তর বছরের যে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—তা' তিনি জোর করেই বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ-ভাবে তখন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না—কিন্তু তিনি জীবনে কখনো ভীরুতা, দুর্বলতা, অন্যায় অসত্য, অনাচার প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি জীবনব্যাপী শ্রেয়োবোধকেই উপাসনা করেছেন, কিন্তু এই শ্রেয়োবোধকে লাভ করতে গেলে শুধু পলায়নপর মনোবৃত্তি বা ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেয়োসাধনায় ব্রতী হওয়াকে তিনি নিন্দা করেছেন। বলের সঙ্গে বীর্যের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে এই শ্রেয়কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এজন্য ত্যাগ করতে হবে, প্রয়োজন হলে মৃত্যুকেও বরণ করতে হবে। ভীরুতাকে, অত্যাচার সহ্য করার মূঢ়তাকে তাই তিনি বারবার ধিক্কার হেনেছেন। তাঁর নাটকে ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে আমরা কি এই কথা পাই না? বলা বাহুল্য মহাত্মা গান্ধীর শক্তি, সাহস এবং বলিষ্ঠতার সঙ্গে সংগ্রাম করার দুর্বার কামনা তাই কবিকে মুগ্ধ করেছিল। এই মহাত্মাজী যখন কারারুদ্ধ হলেন—তখন স্বাভাবিকভাবেই কবি আমাদের পঙ্গু পরাধীন জীবনের নির্ভীক অগ্রদূত-রূপী মহাত্মাজীকে স্মরণ করে এই কবিতাটি লিখতে পারেন।

নব জীবনের সংকটপথে
হে তুমি অগ্রগামী
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না,
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী—'আছে আছে।'

'প্রতীক্ষা' কবিতাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কবি অন্তরের স্পর্শলাভের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষিত রয়েছেন। প্রভাতে অরুণালোকে পবিত্র স্নানের জন্যে যেমন সন্ন্যাসী সমুদ্রতটে প্রসন্ন আলোর আকাজ্ক্ষায় প্রতীক্ষানির্বিষ্ট থাকেন, তেমনি কবির চিত্ত আজ মৃত্যুর তট প্রান্তে এসে অনন্তের স্পর্শলাভের জন্যে ব্যাকুল। কবি সেই স্পর্শ পেয়ে ধন্য হবেন। এখানে কবি অখণ্ড বা অসীমকেই 'তুমি' বলে ভেবেছেন এবং তাঁরই প্রতীক্ষা করছেন।

পুরানো সুরের জীবনদেবতামূলক কবিতা হলো 'নির্বাক'। জীবনদেবতার কাছে কবি এক প্রার্থনা নিয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনদেবতার কাছ থেকে তো' কোনো প্রত্যুত্তর পাচ্ছেন না। তাঁর দেবতার চোখের ভাষায় যে কথা মুদ্রিত ছিল তাও কবির জানা হলো না। কবি নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে নিবাক হয়ে রইলেন। কবিতাটির ছন্দ-নবীনতা লক্ষ্য করার বিষয়। কবি এখানে একটু নতুনত্ব করেছেন—ধ্বনিমাত্রিক তালের সঙ্গে অক্ষর চেতনাকে মিলিয়েছেন।

'প্রণাম' কবিতাটিও জীবনদেবতামূলক। কবি জীবনদেবতার কাছ

থেকে স্বীকৃতি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তাঁর স্বীকৃতি যে কবির কাছে অলংকার-বিশেষ। জীবনদেবতা কবিকে যে উজ্জ্বল আলোক-ধারায় স্নান করালেন, যে জয়টিকা এঁকে দিলেন—তার তুলনা যে নেই। কবি নিজের পরিচয়কে এই জীবনদেবতার মধ্যে ও মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চান।

কিন্তু এই 'প্রণাম' কবিতা সম্পর্কে একটি কথা আছে। এটিও কারারুদ্ধ গান্ধীজীকে স্মরণ করে লেখা বলে অনুমিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশাই সেই অনুমানের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন—"পরিশেষে তিনটি কবিতা অগ্রদূত, শান্ত ও প্রণাম;—আমরা যদি বলি কারারুদ্ধ গান্ধীজির স্মরণে রচিত তবে কি খুব কদর্থ হইবে? পাঠকগণকে এই পটভূমিতে কবিতাত্রয়কে পড়িতে অনুরোধ করিয়া রাখিলাম।"[৬] এ সম্ভাবনা বা এই জাতীয় অর্থ একেবারে যুক্তিহীন নয়।

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তি সমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে শুভ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্নান;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের 'পর।

'শূন্যঘর' কবিতাটিতে বর্ষীয়ান কবির শেষ দিককার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথের মনোবিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি ধীরে ধীরে দার্শনিক হয়ে পড়ছেন, বিশেষ করে এই শেষ পর্যায়ের কাব্যে। 'শূন্যঘর' কবিতাটিতেও একটি গভীর দার্শনিকতার উপলব্ধি রয়েছে। কবি সুন্দরের উপাসক, কিন্তু এখানে

যেন একটি চিন্তালোকের একজন উচ্ছল প্রাণবান্ সাধক বিশেষ। তাই কাব্যের চাল হয়েছে হাল্কা ; এমন কি বয়স্ক রসিকজনের লঘু মেজাজ এবং সহজ একটি উপভোগ্যতার রসকবিতাটির সর্বত্র উপস্থিত। কাব্য ভাষার বুননও স্বচ্ছ। খাঁটি তৎসম শব্দ সংস্কৃত বিভক্তি রক্ষা করে ব্যবহার করতেও কবি এখানে যেমন নির্দ্বিধ, তেমনি হিন্দী 'বহুৎ' শব্দটি বেশ সহজেই বসিয়েছেন। আবার 'ফিলজফার' কি 'মাইক্রোব্' বা 'কারনেশান' প্রভৃতি ইংরাজী শব্দ প্রয়োগের স্বাভাবিকতাও এখানে লক্ষ্য করার বিষয়।

কবির মনে হচ্ছে এই বহির্জগতের প্রতিবেদন বুঝি মায়িক প্রতিভাস, আমরা দেখছি বলেই এ জগৎ আছে, আসলে বস্তু সত্য বলে এর মূলে কিছু নেই। বস্তুর সত্তাসাগরের তলায় ডুব দিলেই বোঝা যায় থাকা না থাকা একই কথা। মহাকালের গহ্বরের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরে কবিও এই সত্য উপলব্ধি করছেন। নাই-গহ্বরেই তো এই বিশ্ব-সংসারটা ডুবে রয়েছে।

> কালের প্রান্তে চাই,
> ওই বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই
> ফুলের বাগান কোথা তার উদ্দেশ,
> বসিবার সেই আরামকেদারা
> পুরোপুরি নিঃশেষ।
> মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
> তুচ্ছ তুচ্ছ মাল্লী একেবারে সব মিছে।
> ক্রেসান্থেমাম্ কারনেশানের
> কেয়ারি সমেত তারা
> নাই-গহ্বরে হারা।

শুধু মানসিক ভ্রান্তির প্রলেপ মাখিয়ে নাস্তিক্যকে অস্তিত্বের পর্যায়ে এনেছে। এ যেন কতকটা বৈদান্তিক মত! কবি-সত্তার দ্বিতীয় চিন্তার দ্বারা তিনি আরো গভীর সত্য উপলব্ধি করতে পারছেন—যা আছে

তার মধ্যেই তো বিরাট 'নেই' লুকিয়ে আছে, অর্থাৎ এই বর্তমান জগতের মধ্যেই সমগ্র ভবিষ্যৎ জগতের অস্তিত্ব রয়েছে—(যা আপাতঃ দৃষ্টিতে নেই। অতীতকালের কবি যেমন আজকের কবিতে পরিণত, তেমনি আজকেব কবি আবাব প্রতিমুহূর্তেবও বটেন।

যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালেব যে ছিলাম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেহ।
বাঁধিয়া বেখেছে এই মুহূর্তজাল
সমস্ত ভাবীকাল।

সতি:, এই পল বা মুহূর্তই তো বিবাট ভবিষ্যৎকে বেঁধে বেখেছে। তাই সংসাবকে কবির বড় বিচিত্র ঠেকে—

ঘরে যদি কেহ রয়
নাই বলে তাবে ফিলজফাবেব
হবে নাকো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে কবে, 'এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।'

১৩৩৩ সালে বৈশাখ মাসে কবির ৬৫তম জন্মদিনকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে সেবার বেশ খানিকটা সমারোহপূর্ণ উৎসব হয়েছিল। বহু বিদেশী মনীষী এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে সমাবিষ্ট হয়ে কবিকে অভিনন্দিত করেন। এই উৎসব ও আনন্দের মধ্যে কবি তাঁর জন্মদিনকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। 'দিনাবসান' কবিতাটির মধ্যে সেই দেখার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উৎসবের এহ উল্লাস তাঁর ভালো লাগছে না।—

তাঁর মৃত্যুচিন্তা মনে প্রকট হয়ে উঠছে, তাই বাইরের এই গোলমাল তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর ঠেকছে! 'দিনাবসান' কবিতায় কবির মৃত্যু-চিন্তা রয়েছে—আর সেইজন্যেই এত সহজে তিনি তাঁর স্মৃতি-সভার বাহ্যিক আড়ম্বর সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে শোকের সমারোহের কোনো দরকাব হবে না তাঁর জন্যে, এবং কোনো সভা-পতিরও প্রয়োজন হবে না। তিনি নিসর্গলোকেরই একজন বাসিন্দা ছিলেন, প্রাকৃত জগৎ তাঁর জন্যে শোকসভা বসাবে, সেঁউতি যূথী জবা ক্ষণে ক্ষণে কবির স্মৃতিসভা ডেকে আনবে।

বর্ষা-শরৎ-বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরি
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন পাবে
স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
আলিম্পনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমাব মৌন করবে পূর্ণ
পাখির কলরবে।

কবির স্মৃতি কবির গানেব মধ্যেই থাক, প্রকৃতির বিচিত্র সুন্দর দৃশ্যবস্তুর মধ্যেই সঞ্জীবিত থাক। যখন তাঁর পায়ের চিহ্ন এই মাঠে পড়বে না—তখন যেন আমরা না ভাবি যে তিনি এখানে নেই, প্রকৃতির সর্বত্রই তিনি আছেন এবং থাকবেন, সকল খেলায় তিনি খেলা করবেন। এই প্রসঙ্গে এই ধারার কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা—যেমন 'স্মরণ' ('যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়' ইত্যাদি 'সেঁজুতি' গ্রন্থে, গান—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' ইত্যাদি অবশ্য স্মরণীয়।

'পথ সঙ্গী' কবিতাটি কবি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী এবং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে লেখেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

হচ্ছেন প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে। ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে কবি পারস্য ও ইরানে বেড়াতে যান। সে সময় এঁরা দুজন এবং প্রতিমা দেবী কবির সঙ্গে ছিলেন। জীবন-পথের সঙ্গীদের উদ্দেশে পঁচিশে বৈশাখ কবি ৭২তম জন্মদিনে এই কবিতাটি বিদেশে বসে—তেহরানে—লেখেন। এই কবিতায় কবি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন যে তাঁর জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু তাঁর পথ-সঙ্গীদের জীবন কল্যাণময় হোক!

'অন্তর্হিত' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বেদনার প্রকাশ রয়েছে। কখনো কখনো কবি যদি কাব্য প্রেরণার ঘাটতি উপলব্ধি করতেন—তখনই ভাবতেন, কাব্যলক্ষ্মী বুঝি তাঁর প্রতি সদয় হন নি। তখনই কবি এই জাতীয় বিষণ্ণতা বোধ করেছেন। এই কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে একদা তাঁর কাছে সোহাগভরে কাব্যলক্ষ্মী এসেছিল, কিন্তু কবি তাকে যোগ্যসমাদরে আপ্যায়ন করেন নি, আজ কবির উপলব্ধি হলো যে সেই কাব্যলক্ষ্মী অন্তর্হিতা!

এর পরের তিনটি কবিতা বিবাহোপলক্ষে রচিত। এদের প্রথম কবিতাটি হলো 'আশ্রম বালিকা': শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহে কবির আশীর্বাদ। প্রকৃতি-প্রীতির রসে এই কবিতাটি ভরপুর। শ্রীমতী সেন প্রকৃতির সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করেছে, আজ তার বাণীতে যেন তারা নূতন বাণী যোগ করে। মমতা সেনের যে অন্তরখানি প্রকৃতির জগৎ থেকে প্রাণরস আহরণ করেছিল, সে যেন আজ এই জীবনের শুভ উৎসবে তার নূতন সংসারকে প্রাণ দিয়ে কাজ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে, মাধুর্য দিয়ে, কল্যাণ দিয়ে রচনা করে।—কবি এই আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয় কবিতাটির নাম বধূ। অমিতা সেনের বিবাহে কবির আশীর্বাদ। বর্তমানের তটদেশ ছুঁয়ে অতীত হতে ভবিষ্যতের দিকে ইতিহাস-সাগরের গতি। বর্তমানের কালবেলাভূমিতেই কীর্তিরূপ পর্বত আপন মাহাত্ম্যে মাথা উঁচু করে আছে। এরই মধ্যে বৃহতের সঙ্গে লঘুর,

স্থৈর্যের সঙ্গে চঞ্চলতার লীলা। দুটি হৃদয়ের মিলনে কবির মনে হচ্ছে—

ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে
দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে,
নরনারীহৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইতিহাসে।

'মিলন' কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ উপলক্ষে লেখা। শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্র হচ্ছেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা। ডাঃ মৈত্র ছিলেন মেয়ো হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক, এবং কবির বহুকালের বন্ধু। এঁর বাড়িতে সাহিত্য-মজলিশে কবি প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। এই কবিতাটিও কবির প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় বহন করছে। দুটি পাখির মিলনে আনন্দ অভিব্যক্ত হয়; অসীম আকাশের অবাধ মুক্তিতে পাখায় পাখায় মিলন সার্থক হয়, সেখানে থাকে অফুরন্ত গতির অনন্ত আবেগ, অজস্র খুশি. তেমনি পাখির সুরে ঝরে পড়ে সেই আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ। পাখার মিলন অসীম আকাশে, সুরের অভিব্যক্তি মর্ত্যে সীমিত জীবনের ছন্দে। ভিন্নদিকে ওড়া দুটি পাখি একই মিলনের রাগে অনুরণিত ও একই জীবনের আর্তিতে কাতর হয়ে মেঘলোকে এক অনির্বচনীয় নীরবতায় মিলিত হলো,— উভয়ের জীবনের গতি অসীমের দিকে. কিন্তু প্রাণের আবেগ তাদেরকে অকূল শূন্য থেকে ধরায় নামিয়ে কুলায়ে বসিয়ে দিলে। কবি শ্রীমতী ইন্দিরাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন—

এলে নামি ধরা-পানে
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে।

'স্পাই' কবিতাটি কাহিনীমূলক: 'পুনশ্চ' বা 'শ্যামলী'তে ছোট গল্পের আমেজে লেখা যে সব চমকপ্রধান কবিতা—'স্পাই' কবিতা তাদেরই সগোত্র; এটি অবশ্য সমিল ছন্দে লেখা। 'পুনশ্চে'র মধ্যে বিবিধ গল্পের

কাহিনী-কবিতা আছে, 'স্পাই' কবিতায় তাদেরই অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। নাটকীয় চমকের দ্যুতিতে এই কবিতাটি উজ্জ্বল।

মানুষকে আমরা বাইরের আচার ব্যবহারের অথবা জনরবের মাপকাঠি দিয়ে যে বিচার করি—তা সব সময় যথার্থ নয়। ব্যাধিগ্রস্ত কবিকে দেখার জন্যে হাজার লোকের আগমন ঘটেছে, তার মধ্যে একজনকে—(তার নাম সতীশ) মনে হয়েছে স্পাই, তাকে দেখা যায় সে কবির কথা গোপনে টুকে টুকে নিচ্ছে। তার নীরবতা, তার গোপন আচরণ তাকে স্পাই বলে সন্দেহ করতে সাহায্যই করেছে। কবির কাছে তার এই সংশয়যুক্ত পরিচয় জ্ঞাপন করা হলে কবি ভাবলেন—

হবেও বা ভক্তিনম্র নিরীহ ওই মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেমনি হেয় হয়
ঘৃণা করব, কেন করব ভয়।

কিন্তু বছর খানেক পরে কবি যখন পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে এলেন, সকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, এল না শুধু সতীশ। কবি তার খোঁজ নিতে গিয়ে জানলেন যে সে দেশসেবার অপরাধে আলিপুরে জেলে অনশনে প্রাণ উৎসর্গ করেছে। আরও জানা গেল কবির কাছে এসে সে যে নীরবে এবং গোপনে যা লিখতো—তা কোনো রিপোর্ট নয়।

দেশের কথা বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি, সুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হত ধুলো।
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।

'ধাবমান' কবিতাটি পরিশেষ গ্রন্থের এক বিশিষ্ট কবিতা। এখানে এক-দিকে মৃত্যুর উপলব্ধি, আর একদিকে জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

মৃত্যুর খুব কাছে কবি উপনীত হয়েছেন, জীবনের শেষ প্রান্ত থেকে কবি যেন মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পাচ্ছেন। তবু প্রাণমন চায় এই সংসারে বেঁচে থাকতে। ('যেতে নাহি দিব' বলে মানবী শিশু-কন্যা থেকে মাতা বসুন্ধরা পর্যন্ত সকলেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, কিন্তু তবু 'যেতে দিতে হয়')। সংসারে শুধু যাবারই বন্যা; এই পারের অর্থাৎ এই সংসার-সাগর-তীরের সব কিছু নিঃশেষে ওপারে অসীমের বা অজ্ঞানতার দেশে ভেসে চলে।

সংসার যাবারই বন্যা, তীব্র বেগে চলে পরপারে
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে।

অস্তিত্ব বা সত্তা ক্ষণিকের জন্যে ফুটে ওঠে, যেন এই আছে, এই নেই: মহাকালরূপ সমুদ্রের ওপর 'নয়' 'নয়'—এই বাণী শুধু ফেনিয়ে উঠছে। তবু এই যে নেতিবাচক শূন্যতা, এই যে সর্বধ্বংসী বিনাশ—তার মধ্যেও অস্তিত্বের হাসি— তা সে যতই ক্ষণিক হোক, ভালো লাগে। কবি তাই বলছেন—

মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান,
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।

আমরা বাস্তব জীবনে এই ক্ষণিকের অস্তিত্বকে বড্ড বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু বিদায়ের রথ যখন আসে—তখন সব কিছু ফেলে যেতে হয়। সংসার পিছনে পড়ে থাকে।

কবি নিজের মৃত্যুসীমানায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছেন যে জীবন-পরিধির অন্ধকূপ পরিত্যাগ করলেই অসীমের সীমানাহীন রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পরিচিত পৃথিবীর জন্যে যে বেদনা বোধ—সেই শোকের বুদ্বুদ অশোক-সমুদ্রের মধ্যে লীন হয়ে যায়। ধাবমান জীবনের স্বরূপই হলো এই রকম।

এই গেল এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কবিতাটি রচনার তারিখ দেখে এই কবিতা সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করি। এটি রচনার পেছনে কি জানি আমার মনে হয় কবির ব্যক্তিগত বেদনার ঈষৎ স্পর্শ আছে। ১৯৩২ সালের জুন মাসে (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ) পারস্য থেকে ফিরে এসে কবি শুনলেন যে তাঁর একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্র জার্মানীতে কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই নীতীন্দ্র হচ্ছে কবির ছোট মেয়ে মীরা দেবীর পুত্র। মীরা দেবী সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে আদৌ সুখী হন নি। কবি তাঁকে পৃথক একটি বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন— এবং তাঁর জন্যে প্রতি মাসে অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই পৃথক বাড়িতে মীরা দেবী তাঁর ছেলে নীতীন্দ্র এবং মেয়ে নন্দিতাকে নিয়ে থাকতেন। সেখান থেকে নীতীন্দ্র যান জার্মানীতে পুস্তক প্রকাশ ও মুদ্রণ ব্যাপারে বিশারদ হতে। জার্মানীতে গিয়ে নীতীন্দ্র খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুখের খবর পেয়ে মীরা দেবী জার্মানীতে যান। কবি এই খবর শুনে বিশেষভাবে ব্যথিত হয়ে পড়েন। কবি-মনের এই বেদনার ছায়াপাত কি ঘটে নি এই কবিতায়—বিশেষ করে তিনি যখন বলেন—

> ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফূর্তি
> শাশ্বতের দীপশিখা
> উজ্জ্বলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।
> অতল কান্নার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,
> প্রিয়ের হৃদয়বিনিময়।
> বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্যমদ
> ধরণীর সৌন্দর্য সম্পদ।

'ভীরু' কবিতাটির মধ্যে প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন রয়েছে। কবিতাটিতে উল্লিখিত 'গরবিনী' বলতে কবি তাঁর অন্তরস্থিত বিচিত্ররূপিণী লীলা সঙ্গিনীকেই বুঝেছেন। 'পরিশেষে'র প্রথমেই 'বিচিত্রা' শীর্ষক কবিতায় আমরা তাঁকে দেখেছি। তা' ছাড়া—এই গ্রন্থের 'আমি', 'তুমি',

'নির্বাক', 'প্রণাম' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও কবির অন্তর্লীন প্রেমানুভূতির পরিচয় রয়েছে। আলোচ্য 'ভীরু' কবিতাটিতে সেই সুরেরই অনুরণন। নিজের দয়িতের জন্যে যে প্রেম-প্রীতি কবি জীবনভোর বহন করেছেন—তা যে তিনি যোগ্যের কাছে সমর্পণ করতে পারেন নি। জীবনের বেলা বয়ে এল, তিনি বুঝলেন যে তাঁর প্রেম মাটিতেই মলিন হলো: সাহসভরে তিনি পারেন নি নিজের প্রেমকে উদ্ঘাটিত করতে, আজ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভীরুতার জন্যে নিজেরই আক্ষেপ হচ্ছে।

'বিচার' কবিতায় কবি তাঁর প্রাণের মধ্যে অবস্থিত যে পথিক আছেন (অর্থাৎ পথিকরূপী জীবন-দেবতা)—তাঁকে সম্বোধন করেই বলছেন যে শিল্পীর প্রথম কাজ হলো নিজেকে প্রকাশ করা, নিজেকে অসীমের সঙ্গে একাত্ম করে তোলা, শিল্প দিয়ে, গান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে প্রকৃতির রাজ্যে যদি একটা অনিবার্য স্থান করে নিতে পারে। বর্ষার ঘাস সবুজ রঙে নিজেকে সাজায়,—সে যে অসীমেরই গান গায়। অপরাজিতা ফুল ফোটে, সে যে আকাশ থেকে মাটিতে বাণী বয়ে নিয়ে আসে, সে যে মাটির বন্ধু হয়। পথিকও যেন তার অন্তরখানিকে উন্মুক্ত করে উজাড় করে দিয়ে যান। একথা কবির শিল্পীসত্তা সম্পর্কে যতখানি খাটে, সাধারণ মানুষের প্রতি কবির দার্শনিক উপদেশ হিসেবেও ঠিক ততখানি খাটে। মানুষ নিজের অন্তরখানি ফুলের মতো বিকশিত করুক, আকাশে বাতাসে অনন্তের যে অনাহত সুর বাজছে—সেই অখণ্ড সুরলোকে তার মনের বীণা বাজাক, কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোনটা কালো, কোনটা সাদা—তার বিচার দরকার নেই।

'পুরানো বই' কবিতাটিতে কবি কালের গতিমানতা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছেন। একটি বইয়ের যথার্থ মর্যাদা নির্ভর করে যুগধর্মের আব-হাওয়ার ওপর। একদিন যা প্রিয়, আগামী দিনে তারই আস্বাদন হয়তো পানসে লাগবে, বই পুরানো হয়, হয়তো পাঠকের চেয়ে বেশীদিন টিকেও থাকে, কিন্তু পাঠক ত' চলে যায়, তার রুচিও কালের অগ্র-গমনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। নতুন যুগ নবীন রুচিকে প্রবর্তন করে।

কাল প্রাচীনকে, প্রাক্তনকে বিবর্ণ করে দিয়ে যায়।

'বিস্ময়' কবিতায় কবি বলছেন কাল ত' চলে, থেমে থাকে না। পৃথিবীর বস্তুসত্তাকে টেনে নেয় নিজের বুকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে দীর্ঘস্থায়ীকে মনে হতে পারে বুঝি বা কালের সহচর, কিন্তু তাকেও যেতে হয় অবশেষে। কালের কপোল তলে কত মহাদেশ, কত তারা—নিঃশেষ হয়েছে। কত জাতি, কত বীর, কত সভ্যতা—জেগেছে, ডুবেছে—তার ইয়ত্তা নেই। এই সব বস্তুসত্তা বিলীন হচ্ছে অনন্তের কোলে। কবি বিস্ময় উপলব্ধি করছেন—তিনিও বুঝিবা অনন্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কবি অসীমকে যেন অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, স্পর্শ পেয়েছেন। তিনি যেন হিমাদ্রির সঙ্গে, সপ্তর্ষির সঙ্গে, সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে, বিরাট ও অনন্তের সঙ্গে লগ্নীভূত। তবু কবি জানেন—একদিন কালের অদৃশ্য রথ শব্দহীনভাবে তাঁকেও তুলে নেবে।

'অগোচর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তার পরিচয় রয়েছে। এই পৃথিবীর সব কিছুর আড়ালে যে বিরাট, অনন্ত আছে তাকে ত' চেনা যায় না। সংসারে মানুষের এই যে বিচিত্র মেলামেশা, এই যে কলগুঞ্জন, এ ত' ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, কোথায় গিয়ে মেশে—তা কে-ই বা বলতে পারে! বাস্তব সংসারে যেটুকু জানা যায়, যেটুকু চেনা যায়, কবি তাকেই প্রিয় সম্বোধন করে বলছেন 'হে প্রিয়, তোমার যেটুকু জেনেছি তা মধুর, কিন্তু যা জানি না—তা যে তারও অশেষ বহুশতগুণ। আর তা যে অদৃশ্য ও অশ্রুত থেকে গেল রহস্যজালে আবৃত হলো;'

হে প্রিয়, তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি,
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ কবি--
তার বহুশতগুণ অদৃশ্য অশ্রুত
রহস্য কিসের জন্য বদ্ধ হয়ে আছে,
কার অপেক্ষায়।

মহাকাল বা চিরন্তন হচ্ছে কবির "চেনা-অপরিচিত"। তাকে ডেকে কবি বলেছেন যে এই মহা-অপরিচিতই বুঝি আমাদের অন্তরের অজানাকে ভালবাসে। তার কাছেই অজানা অথবা ধরা দিয়েছে।
মানুষ পথিক, সে চলেছে জানা হতে অজানার পথে, নির্দিষ্ট হতে অনির্দিষ্ট পথে। সেই চলনশীল মানুষের মনের অজ্ঞাতসারে যে রহস্য জমা হচ্ছে—তা কবিকে উতলা করে তুলেছে।
'সান্ত্বনা' কবিতায় কবি প্রশান্ত চিত্তে মনের দুঃখ বেদনার ব্যাপারে সান্ত্বনা খুঁজছেন। প্রতিকারহীনভাবে মানুষ দুঃখ বহন করে, ব্যথিত হয়। প্রতিকার নেই ভেবে সেই দুঃখকে দুঃসহ বোঝা মনে করে। প্রার্থনা জানায় কিন্তু দুঃখ কমে না, প্রার্থনার ব্যর্থতায় চিত্তদৈন্যই শুধু বাড়ে। কবি মাটির দিকে তাকালেন নিদাঘের তাপ ও শ্রাবণের ধারা নীরবে সহ্য করছে। এই সহনশীলতার পর গাছে ফুল ধরবে, মাটিতে সবুজের আস্তরণ পড়বে। কবি সহিষ্ণুতার এই অপূর্ব রূপ দেখে আশ্চর্য হলেন। বিশ্বের সবত্র যেন কোন্ অদৃশ্য লোক চিরসুন্দর গানের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত দুঃখবেদনাকে জয় করে নিচ্ছে।
'ছোটাপ্রাণ' কবিতাটি রূপকধর্মী বলা চলে। মানুষ মাত্রেই এই সংসারকে ভালবাসে। স্নেহে প্রেমে, আবেগে-আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দে-বেদনায়—বাস্তব জীবনের সমস্ত উপলব্ধিকে সে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু মহাকাল রুদ্রের বেশে এই সংসারের অজ্ঞ, জ্ঞানান্ধ, ছোট্ট শিশুর মতো অসহায় কচি প্রাণে কেন আঘাত হানে, কেন বাস্তব সংসারে মৃত্যুর যবনিকা টেনে দেয়, কবির এই বিহ্বল জিজ্ঞাসা এখানে বাণীরূপ লাভ করেছে।
কবির একটি বিশিষ্ট দার্শনিক ধ্যান 'নিবাবৃত' কবিতায় ধরা পড়েছে। এই পৃথিবীতে মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না, উপলব্ধ হয় না। যতদিন মায়াময় এই সংসারে মানুষ আবদ্ধ থাকে, ততদিন জাগতিক উপলব্ধির আস্তরণে তার মনও ঢাকা থাকে। বাইরের মানুষটি আশা-নৈরাশ্যে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে আছে জড়িয়ে, ভেতরের মনটি মানুষের বাইরের

এই রূপকেই দেখে থাকে, একে নিয়ে মন মেতে ওঠে, খেলা করে। কিন্তু লোকান্তরে মন যদি মায়ামুক্ত হয়, তখন সে বিরাট সত্যকে জানবে, এই সংসারের মাধুর্যের আবরণকে সে তখন ভালবাসবে না। অথচ এখন কবির কাছে ভাল লাগছে আলোছায়া মেশা এই যে মায়ার সংসার—এই ত' ভাল। অপূর্ণতার মধ্যে, মায়ার মধ্যেই মর্ত্যের পাত্র ভরে কবি অমৃত পেয়েছেন। (তিনি যে আগেই রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান করেছেন। 'পূরবী'র 'কঙ্কাল' কবিতাটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে।) পূর্ণতা বড় নির্মম, বড় রূঢ়, কারণ সে যে স্তব্ধ, সে যে অনাবৃত।

পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে,
স্মৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি
সে মায়াতে বেঁধেছিনু মর্তে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর,
অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু,
মর্তপাত্রে পেয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে-যে স্তব্ধ অনাবৃত।

'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতাতে কবি বলছেন যে দূর থেকেই আমরা ভয় করি ধ্বংসকে, অবসানকে, সবশেষে মৃত্যুকে। মনে করি ধ্বংস-দানবই ত' এই পৃথিবীকে শাসন করছে। মৃত্যুর বিধান অমোঘ, তার শাসন বড় নিষ্ঠুর। তাই মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে বড় বলে ভুল হয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে মানুষ নিজেকে যদি ব্যাপ্ত করতে পারে সংস্কৃতিতে, সভ্যতার অম্লান আলোয়—সে তবে নিঃসন্দেহে মৃত্যুঞ্জয়। ধ্বংস-দানব বাইরেটা নষ্ট করতে পারে, কিন্তু শিল্প ও সংস্কৃতির রাজ্যে যে সৃষ্টি—তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কবি তাই বলছেন যে তিনি নিজের কীর্তিতে

মৃত্যুকেও জয় করেছেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।

'অবাধ' কবিতাটি সম্পর্কে একটু কথা আছে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে মহাত্মাজী ২৮।১২।৩১ তারিখে দেশে ফেরেন, এবং ৪।১।৩২ তারিখে গ্রেপ্তার হন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'প্রশ্ন' কবিতাটি ('ভগবান তুমি যুগে যুগ দূত পাঠায়েছ বারে বারে' ইত্যাদি) লেখেন। দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। সেবার যৌবন-চাঞ্চল্যের উদ্দামতা দেখে কবি এই 'অবাধ' কবিতাটি লেখেন। এই প্রসঙ্গে 'বলাকা'র 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি স্মরণীয়, এবং যৌবনাবেগের দিক থেকে উভয় কবিতার স্বাধর্ম্যও তুলনীয়।

মুক্ত প্রাণের অবাধ আনন্দে দুর্নিবার গতিতে তরুণ দল ছুটছে। ওদের গতিচ্ছন্দই ত' অতীতের জঞ্জাল স্তূপকে সরিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির চির নবীনতার সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব। ওরা শুধু এগিয়ে যেতেই জানে। কবি নিজের স্থবির চিত্তের দিকে তাকিয়ে বলছেন—এই তারুণ্য-প্রবাহের কাছ থেকে ছুটে চলে যা। অথবা, এরকম মানেও করা যেতে পারে যে কবি ভীরু পঙ্গু সংশয়ীকে ডেকে বলছেন—এই উদ্দাম গতির পথিকদের থেকে তুই দূরে সরে যা।

'যাত্রী' কবিতায় কবির দার্শনিক মননের প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়। এই সময় কবির পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় চলছিল। বন্যা হয়ে গেছে তাঁর জমিদারিতে, প্রজাদের সমূহ ক্ষতি এবং সর্বনাশ হয়েছে। জমিদারিতে আদৌ আয় নেই। তাঁর একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্র জার্মানীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ('ধাবমান' কবিতা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমি এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি)।—সব মিলিয়ে কবির মনে যে বেদনা জমেছে—তারই একটু ছায়া আছে এই কবিতায়।

কাল সর্বধ্বংসী, সব কিছুকে মুছে দেয়। এই কালের প্রভাবে এসে বাস্তব সংসারের সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। অবশ্য সময় শুধু আমাদের বস্তুকে হরণ করে ক্ষান্ত হয় না, বস্তু হারানোর বেদনাকেও মুছে দেয়।

যে-কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা
একে একে পাখি যায়, গানের পসরা
কোথাও হয় না শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ণ
বিপুল সংসার।

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সে চলে যায়। নিখিলের যে কোনো সম্পদই এমনধারা ক্ষণস্থায়ী। অবশ্য প্রাকৃতিক প্রবহমানতার জন্যে এক পাখির গান তার পরে অন্য পাখির কণ্ঠে বিধৃত থাকায় প্রকৃতি কখনো গানশূন্য পরিবেশে থাকে না। (এ যেন কীটসের Ode to a nightingale কবিতার সেই Immortal bird-এর গানের মতো।) প্রকৃতি বা বসুন্ধরা ধারাবাহিকতার জন্যে রিক্ত বা শূন্যঋদ্ধি না হলেও নিখিলের বস্তু বা সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে ক্ষয়শীল, কালের অখণ্ডতার তুলনায় তা ক্ষণস্থায়ী। কাল সেখানে তার প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিজের মতো অক্ষুণ্ণ করে রাখতে পারে না। আমরা এখানে নিজেদের অহংকার নিয়ে থাকি, মৃত্যুতে লীন হই, কালের বেড়াজালে আটকা পড়ি। কিন্তু নিখিল তো বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা পরিমেয় নয়। সেখানে লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ নেই, সেখানে সব সমান। হাসিকান্না সেখানে এক বীণাতন্ত্রীর তারে বাজছে, একই সংগীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, একই শমে এসে ঠেকছে। মহান্ ও বিরাট একটা উপলব্ধি

মনকে ভরিয়ে তোলে। মৃত্যুর প্রান্তে যে শান্তি বৈরাগ্যের মধ্যে স্তব্ধ ও আত্মসমাহিত, সেই শান্তির আশ্রয় হচ্ছে নিখিলেরই অচঞ্চল স্থিতিরই আরেকটি স্বরূপ। তাই মানবিক জীবনের প্রাত্যহিক দুঃখ সুখ ও ক্ষয় ক্ষতিকে ভুলে নিখিল প্রদর্শিত সমাহিত শান্তির আশ্রয়ে স্থান নেওয়াই শ্রেয়।

'মিলন' কবিতাটি জীবনদেবতা মূলক। জীবনদেবতা এতদিন কবির লীলাভিসাবের বন্ধু হিসাবেই গণ্য হতো। কবি এখন উপলব্ধি করছেন যে তাঁর সত্তা তাঁর মনের মধ্যে অধিষ্ঠাতা জীবন দেবতার সঙ্গে একীভূত হয়ে মিলে গেছে। কবি এই জীবনদেবতার অস্তিত্ব ছাড়া নিজেকে অন্য কোনো রকম চিন্তা করতে পাবছেন না। সংসারের কর্মজাল ছিন্ন করে পার্থিব জীবনের সকল ভার ফেলে রেখে কবি জীবনদেবতাব স্বরূপে লীন হতে চান। বাস্তবলোকেব সমস্ত কোলাহল শেষ করলেই জীবন-দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়—তখন দ্বন্দ্বহীন ও বন্ধহীন ভাবে এই বিশ্বে বিচবণ করা সম্ভব।

'আগন্তুক' গদ্যচ্ছন্দের কবিতা। 'পুনশ্চ-পত্রপুট-শ্যামলী-শেষ সপ্তক' পর্বে কবি যে রীতির ছন্দ সাধনায় নিযুক্ত হবেন—তাবই পূর্বাভাস রয়েছে 'আগন্তুক' কবিতায়। কবি উপলব্ধি করছেন যে তাঁর যুগ শেষ হয়েছে এবং তাঁর জীবন পথেব সঞ্চরণও প্রায় সমাপ্ত। কালধর্মে তাঁব সঙ্গীরা কে কোথায় চলে গেছেন, সুখ-দুঃখ-স্নেহ-প্রেম—প্রাণযাত্রার সমস্ত উপকরণই নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তাই আজ কবি বৃদ্ধবয়সে নবীনদের সম্বোধন করে বলছেন যে নবীনদের কালে তিনি যেন প্রবাসী, তিনি অপরিচিত। তাঁর জীবনকালের সঙ্গে একালের হাজাব রকমের তফাৎ, আকাশ পাতাল প্রভেদ।

তিনি বিচাব করছেন তাঁর জীবন-পরিধির মধ্যে একালের নূতন সুর বাসা বাঁধতে পাবে না। একালের নৈবেদ্যে যে সব ফলের আয়োজন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালের উদ্যানে তাদের ফসল ছিল না। তবু কবি তাঁর যুগের সাংস্কৃতিক দান দিয়ে একালের ঋণ শোধ কবার চেষ্টা

করেছেন, স্তুতি ও নিন্দাকে তিনি গণ্যই করেন নি।

জরাকে সম্বোধন করে, সমাসোক্তি অলংকরণের মাধ্যমে কবি 'জরতী' কবিতাটি রচনা করেছেন। নিজের জীবন সীমানার প্রান্তে উপনীত হয়েছেন কবি। নিজের বার্ধক্যের সামনে দাঁড়িয়ে জরাকে উপলব্ধি করছেন। মৃত্যুর ডাক শোনা যাচ্ছে, কবি তাই জরাকে সম্বোধন করছেন। প্রকৃতির পূর্ণতার রূপে, শুভ্রতার সমাহিত দীপ্তিতে কবি জরতীর মূর্তি প্রতিবিম্বিত দেখতে পান। সত্তার অন্তিম তটেও জরতীর ধ্যানস্থির স্বরূপকে কবি চিনতে পারেন। নির্বস্তুক ভাব-চেতনাকে কবি চিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধিলোকে প্রত্যক্ষগম্য করে তুলেছেন। যেমন—

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।
অবসানরজনীতে দীপবর্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে—শুভ্র কেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যূষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়ন তোমার।

কিংবা—

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি
রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদিমূলে

এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।

'প্রাণ' কবিতাটি ছোট্ট কিন্তু নিগূঢ় একটি ভাবের মাহাত্ম্যে তা সমুজ্জ্বল। কবিতাটির ভাবার্থ এই রকম: অন্ধকার কালস্রোতে অগ্নির আবর্ত চিরদিন ধরে জ্বলছে, সেখানে এই পৃথিবী যেন মাটির বুদ্বুদমাত্র। তেমনি—অনন্ত অখণ্ড প্রাণ-সত্তায় ব্যক্তিপ্রাণ—বিরাট অনির্বাণ আগুনের কাছে শিখার কণার মতোই—মুহূর্তকালের জন্যে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে। অসীমের কাছে এই অভিব্যক্তি যেন তার পূজা এবং আরতির অর্ঘ্যদান। এই আরতি স্বল্পকালের জন্যে হলেও, খণ্ডিত হলেও বিরাটের নিখিলমন্দিরে তাতেই শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে, পূর্ণের প্রতি মর্যাদা ফুটে ওঠে।

এবার 'সাথী' কবিতা। কবি স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্যে কবিতাটি শুরু করেছেন, কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপ ও দার্শনিক রূপের মধ্যে এই স্মৃতি-অনুধ্যানলব্ধ আবেগ ও অনুভূতিকে মিশিয়ে দিলেন। প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যবস্তু অনন্তের সামগ্রী, তার ত' বয়স হয় না, সে ত' বুড়ো হয় না। কবির বালক বয়সে প্রকৃতির যে বৃক্ষলতা দেখে তিনি তন্ময় হতেন, সে যে চিরতরুণ। যৌবন বয়সে কবি প্রকৃতিকেও গ্রহণ করেছিলেন, বার্ধক্যেও তিনি তাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু উদ্দাম ও সচকিত জীবনের প্রতীকরূপে প্রকৃতির এই প্রকাশকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃক্ষের মধ্যে শৈশবে কবি সজীবতা দেখেছেন, যৌবনে চাপল্য খুঁজে পেয়েছেন, এখন তিনি পরম এক শান্তিকে স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখেছেন। বয়স্ক কবি যেন প্রকৃতির কাছ থেকেই অনন্তের জন্যে শান্তিসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। 'আকাশপ্রদীপ' গ্রন্থের 'ধ্বনি' কবিতাটির সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়লে রসগ্রহণের পথ সুগম হবে বলে মনে হয়।

কবিতাটির মধ্যে তত্ত্বপ্রাধান্য ঘটলেও বাস্তব-রসও নেহাত কম উপভোগ্য নয়

হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে

ও-পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।
গলির মোড়ের কাছে দত্তদের বাড়ি
কাকাতুয়া মাঝে-মাঝে উঠত চীৎকার করে ডেকে।
একটা বাতাবিলেবু, একটা অশথ,
একটা কয়েতবেল, এক জোড়া নারকেলগাছ,
তারাই আমার ছিল সাথী।

নীরবতা দিয়েও যে কি গভীর অভিব্যক্তি রচনা করা যায়—'বোবার বাণী' কবিতায় কবি তা ব্যক্ত করেছেন। কবি জীবনদেবতাকে (লীলা সঙ্গিনীকে) নিজের প্রাণের আঙিনায় দেখেছেন, কিন্তু কিছু বলতে পারেন নি। অথচ অনন্তের জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তিতে তাঁর মনের না-বলা কথা কত সহজে মিশে যায়। গাছে গাছে আষাঢ়ের রসস্পর্শে সবুজের উচ্ছলতা জাগে, শাখা প্রশাখায় কত কথা নীরবে ঔৎসুক্যভরে অস্ফুট থাকে, সেই মৌন মুখরতা সারারাত্রি অন্ধকারে ফুলের বাণীতে উচ্ছ্বসিত হয়। কবির বাঞ্ছিতকে কবি অবারিত সহজ আলাপে কিছু বলতে পারেন না বটে, কিন্তু ছন্দে-গাঁথা সুরে ভরা বাণীর মাধ্যমে সেই বোবা অভিব্যক্তি রূপলাভ করে।

'আঘাত' কবিতাটি অনুভূতিপ্রধান। প্রকৃতির অফুরন্ত প্রাণরস সামান্য নিষ্ঠুর আঘাতে নিঃশেষিত হয় না। ছোটখাটো গাছে অথবা বড় বড় বনস্পতির স্থানে স্থানে আঘাত হানে কেউ কেউ, কিংবা পোকা ধরে, ক্ষত জাগে, মলিনতা ও লাঞ্ছনায় তার শ্যামলিমা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে অরণ্যের আশীর্বাদ তা বলে খর্ব হয় না। আকাশকে পূজো করে গাছ, ফুল ফোটায়, ফল ফলায়। প্রকৃতির অকৃপণ আশীবাদ পেতেও তার দেরী হয় না। শ্রাবণের অভিষেক তারি জন্যে, বসন্ত বাতাসের আনন্দ-মিতালি তাকে নিয়ে।

পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস,
সুগভীর সুবিপুল আয়ু,
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।

'শান্ত' কবিতাটিকে যদি সাময়িক রচনা বলে ধরা হয়—যে অর্থের ইঙ্গিত আমরা শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনী তৃতীয় খণ্ডের ৩১৯ পৃষ্ঠায় পাই)—তা হলে বলা চলে যে এই কবিতাটি গান্ধীজীর বন্দী দশাকে স্মরণ করে লেখা। অর্থ খুবই সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতাটিতে এই সাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত ছাড়াও অন্য এক সত্যের উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। বাস্তব জগৎ অনন্তের স্বরূপকে বিদ্রূপ করে, সংসারে লোকে চায় এই পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সে এই বস্তু জগৎ নিয়েই মত্ত থাকে, আর অনন্ত বাস্তবকে খণ্ড মনে করে, অপূর্ণ-ভাবে, তাই এই জগতের সুখ দুঃখ তাব কাছে এমন কিছু নয়। সেই কারণেই সংসার শান্ত, অনন্ত, অসীমকে ব্যঙ্গ করে।

'জলপাত্র' কবিতায় ঈশ্বরের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কবি বলতে চেয়েছেন যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অপেক্ষা মানবিক গরিমাও কিছু কম নয়। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় আনন্দ যে অস্পৃশ্য মেয়েটির হাতে জল পান করেছেন, তাতে মানবীয়তাকেই মাহাত্ম্য দান করা হয়েছে। এখানেও সেই সুর।

কবি এখানে বলছেন যে সুন্দরের কোনো রকম জাতিভেদ নেই। মানসিক শুচিতা ও পবিত্রতাই হচ্ছে সৌন্দর্যের মাপকাঠি। পদ্ম পাঁকে জন্মায় কিন্তু সৌন্দর্যে সে সকলের উর্ধ্বে, তাকে তো অন্ত্যজ বলা যাবে না। যিনি অনন্ত অসীম—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, তিনি তো কখনো সংকীর্ণতার মোহ দিয়ে সৌন্দর্যকে বিচার করেন না। অস্পৃশ্যতার কৃত্রিম বিভেদের মালিন্যের দ্বারা মনকে ছোট করে, তাদের কাছে সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য কখনো ধরা পড়ে না।

সুন্দরের কোনো জাত নাই
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা,
তারাময়ী রাতি

দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।

মোর কথা শোনো,

শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।

যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি

সেও কি অশুচি।

'আতঙ্ক' কবিতায় কবি বলছেন যে জীবন এগিয়ে যায়, কাল তো এক জায়গায় থেমে থাকে না। ছোট বয়সের চিন্তাও যায় মুছে, জীবনের সঞ্চরণপথে নতুন চিন্তা এসে জড়ো হয়। পুরানো বাড়ির ভাঙা দেওয়ালে জীর্ণতার রেখাকে ছোট বয়সে হয়তো প্রেতায়িত মনে হতো, কিন্তু যৌবন বয়সে সে রেখা বিস্তৃততর হলেও তা প্রেতরূপক বলে মনে হয় না। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই, বালক বয়সের ছোট্ট আশা আকাঙ্ক্ষা, কতশত কল্পনার মলিন রেখা—কবির মনে চিন্তার স্তূপ রচনা করলো। কবি সৃষ্টিশীল জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করে বুঝতে পারলেন যে মন ভঙ্গুর রেখাপাতেই ভীত হয়, কত মিথ্যা চিন্তাই সেখানে আচড় কাটে।

এরপর 'আলেখ্য' কবিতা। কবি নিজের রচনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করছেন। তিনিই তো এই অমূর্ত অব্যক্ত চিন্তাকে বর্ণে রেখায় অঙ্কিত করে রূপদান করেছেন। তাঁর সৃষ্টি আজ নিন্দা বা প্রশংসার দাবি করে। নাস্তিত্বের মহা অন্তরাল থেকে কবিই তাঁকে প্রকাশ করলেন রেখার আলেখ্যলোকে। কিন্তু যদি এই প্রকাশের কোনো দৈন্য থাকে—সে দৈন্য তো চিরদিন টিঁকবে না। ঘুচে যাবে, মুছে যাবে। রূপের মরণ তো ঘটবেই কালধর্মে, দেহহীন অব্যক্ত তখন আবার মুক্তি পেতে পারবে। 'সান্ত্বনা' কবিতায় কবি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করছেন। তাঁর মনের সমস্ত অকথিত বাণী তিনি ব্যক্ত করতে পারেন নি। তাঁর অন্তর্লগ্ন সত্তার দুঃখ যেন আজ তাঁকে ব্যথিত করছে, কোথাও তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না। জীবনের বেদনারাশিকে সরিয়ে কবি সুগভীর শান্তি খুঁজছেন। নৈরাশ্যের তীব্র বেদনাকে

দূর করে নিজের বাণীতে সুগম্ভীর শান্তি খুঁজছেন। অথচ যথার্থ সান্ত্বনাব বাণী রয়েছে অনন্তের কাছে, অসীমের মধ্যে। নিখিল আত্মাব কেন্দ্রেই রয়েছে আবোগ্যেব মহামন্ত্র। অনন্ত তাব কাছে নিহিত সান্ত্বনার বাণী সকলকে দান করতে চেয়েছে, কিন্তু সংসাবের বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত কে-ই বা তা গ্রহণ করতে পারে ?

কবি সেই নিখিলের সান্ত্বনাব জন্যে লালায়িত যেখানে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা, লোভ ও স্বার্থেব হানাহানি, যেখ*নে আমিত্ব নিয়েই কাববাব —সেখান থেকে মুক্ত হবাব জন্যে কবি অধীব। কবিব আত্মা তো অসীমেব সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

কবি সহসা উপলব্ধি কবলেন যে প্রয়োজনেব সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ যখন বিপর্যয়েব সাধনায় মত্ত হয়, তখনই সে অনন্তেব আনন্দকে নিজেব কবে নিতে পাবে।

এই কবিতাব প্রকবণ বৈশিষ্ট্য বোধহয় পাঠকেব দৃষ্টি ছাড়িয়ে যাবে না। দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু বোঝাতে কবি শ্রুতিগোচব ধ্বনির অলংকাক ব্যবহাব করেছেন।

'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতায় যবদ্বীপকে সম্বোধন কবে কবি ভারতবর্ষেব সঙ্গে এই দ্বীপের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রেমের কবিতাব ছলে বর্ণনা কবেছেন। প্রাচ্যের এই অঞ্চলকে বিজয়লক্ষ্মী বলা হয়। পবিপূর্ণ বোমান্টিক ভঙ্গীতে ভাবতবর্ষ ও প্রাচ্যেব এই অঞ্চলেব সঙ্গে যে নিবিড় নৈকট্য আছে—সেই ইতিহাসচেতনার নব রূপায়ণ ঘটেছে এই কবিতায়। 'মহুয়া' গ্রন্থেব 'সাগবিকা' কবিতা—(যেটি বালীদ্বীপ নিয়ে লেখা, ভারতবর্ষ ও বালীদ্বীপেব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধেব রোমান্টিক ভাষ্য) এই 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' শীর্ষক কবিতার সহগাত্র

'বোরোবুদুর' কবিতায় দেখি—অহিংসার বাণীকে মূর্তিমান করা হয়েছে বোরোবুদুর মন্দিরে, সে বিষয়ে কবি বলছেন যে কালধর্মে এই অহিংসাব বাণী বুঝি হাবিয়ে যাবে। মানুষ প্রত্যহের লীলার পর চলে যায়, চাষী ধান বোনে, ধান কাটে, জীবনের অধ্যবসায় সেখানেই শেষ কবে, তার-

পর ছায়ানাট্যের ক্ষণিক নৃত্যচ্ছবির মতোই মিলিয়ে যায় সে। এই ধ্বংসশীল জগতে অহিংসার মন্দিরটি যেন চিরন্তনতার দাবি করে বসলো। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত অহিংসা ধর্মে কত জাতি একদা দীক্ষিত হয়েছে কিন্তু আজ মানুষ বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছে; তুচ্ছ জিনিস নিয়ে, লাভ ও লোভের বশে নিজেদের মধ্যে হানাহানি শুরু করেছে। আবার এই মন্দিরতলে সকলকে সমবেত হতে হবে, নচেৎ কল্যাণ নেই।

'সিয়াম' (প্রথম দর্শনে) কবিতাটি কবি প্রাচ্য দেশভ্রমণকালে শ্যামদেশে গিয়ে রাজা ও রানীকে এই কবিতাটি উপহার দেন। যেদিন প্রথম 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি—এই ত্রিশরণ মহামন্ত্র আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল, স্বার্থান্ধ দৈন্যের বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যখন সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছিল—তখন সেই অমৃত মন্ত্র কবে যে শ্যামদেশের প্রাণে পৌঁছেছে— তা আজ আর কেউ বলতে পারে না। শ্যামদেশে এই অমৃত মন্ত্র কল্যাণপ্রদ ব্রতে শ্যামবাসীদের দীক্ষিত করেছে, এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সেই বৌদ্ধবাণী শ্যামদেশেব নবযুগ যাত্রীপথে নূতন জীবন-সন্ধান দেবে, নূতন জ্ঞানেব দীপ্তিতে এই দেশের জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

এই শ্যামদেশ মিলনমন্ত্রে শান্তির বাণীকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। কবি বুদ্ধদেবের জন্মভূমি থেকে এসেছেন, বুদ্ধদেবের দেশে বুদ্ধবাণী পাথরে খোদাই করা, আর শ্যামদেশে সেই বুদ্ধমন্ত্রের চিরশ্যামল রূপ সবসভাবে দীপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বৌদ্ধতীর্থ ক্ষেত্রে কবি এই সরসতা-উচ্ছলতায় প্রাণ সিক্ত করে যাবেন।

'সিয়াম' (বিদায় কালে) কবিতাতে কবি ভারতবর্ষের সঙ্গে শ্যামের মিলন কোন্ সুদূর কাল থেকে, আজ সেই মৈত্রীকে স্মরণ করছেন। শ্যামদেশের আতিথ্যে তিনি মুগ্ধ, সপ্তাহকাল সেখানে থেকে তিনি আজ বিদায় নেবার সময় বলছেন যে পুরাতন মৈত্রী শ্যাম ও ভারতের মধ্যে, তাই কবি আজ শ্যামের ভাষায় চিরন্তন আত্মীয়ের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন। কবি বিদায় কালে শ্যামের সুরভিত মৈত্রী ও প্রেমের স্মৃতি বহন করে

আনবেন—তাই বহু যুগ আগে মিলনের যে ফুল ফুটেছিল কবি সেই অম্লান মিলনপুষ্পে গাঁথা মালা গলায় দিয়ে এলেন।

'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতাটি মৃগদাবে (সারনাথে) মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের পুণ্য নামের জন্য ভারতবর্ষের গৌরবের সীমা নেই, কবি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন যে বোধিদ্রুমতলে যে মহাজাগরণ সার্থক হয়েছে—তা আজকালের এই মোহকে দূর করুক। কবির প্রার্থনা মৃতপ্রায় ভারতে অমিতাভ অমিতায়ু যেন প্রাণ সঞ্চার করেন, রুদ্ধদ্বার মুক্ত হোক, আজ নব আগমনী অমেয় প্রেমের বার্তা, অজেয় আহ্বান চতুর্দিকে ঘোষিত হোক।

'পারস্যের জন্মদিনে' কবিতাটি ইরানের রাজধানী তেহরানে ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৯ তারিখে রচিত। ইরানরাজের আদেশে ৬ই মে ১৯৩২ তারিখে বাগ নেয়েবেদ্দৌলহ্‌তে কবির জন্মদিন উপলক্ষে চব্বিশঘণ্টাব্যাপী এক উৎসব চলে। পারস্যরাজ কবিকে বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রাজকীয় পদক ও সনন্দ দেন। কবি তখন 'ইরান' নাম দিয়ে এই কবিতাটি লেখেন, পরে এটির নাম বদল করা হয়। কবির জন্মদিনে ইরানের সমস্ত গুণীজন কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, সম্মানদান করেছেন, প্রেম ও প্রীতির ডোরে বেঁধেছেন, কবি নিজেকে সার্থক ও গৌরবযুক্ত মনে করছেন।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক,—
ইরাণের জয় হোক।

'ধর্মমোহ' কবিতায় কবি বলছেন—ধর্ম সম্পর্কে যারা মোহান্ধ হয়, ধর্মের আড়ম্বর নিয়ে যারা প্রমত্ত হয়—তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এমন কি নাস্তিক ঈশ্বরের যেটুকু করুণা পায়, ধর্মান্ধ গোঁড়া-

ভক্তেরা সেই বিধাতার সামান্যতম করুণা থেকেও বঞ্চিত হয়। পরধর্ম-মত সহিষ্ণুতা তাদের থাকে না, অন্যের ধর্ম নিধন করতে গিয়ে নিজের ধর্মকেই অপমানিত করে।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

ধর্মমোহ মানুষকে যুক্তিহীন করে তোলে, যে মুক্তি দেবে তাকেই বন্দী করতে শেখায়, যে প্রেম মন্ত্রদান করবে, তাকেই আগে থেকে সরিয়ে দেয়। ['পুনশ্চ' গ্রন্থের 'শিশুতীর্থ' কবিতাতে দেখা যায় যে যিনি প্রেমের পথে বেরিয়েছেন অমৃত মন্ত্র বিলোতে,—তাকে ধর্মান্ধ মত্ত মূঢ়েরা হত্যা করেছে।] ধর্মান্ধতার অন্ধকূপ থেকে বাঁচবার জন্যে কবি ধর্মরাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন, ধর্মমূঢ় অজ্ঞানকে মোহমুক্ত করবার প্রার্থনা নিবেদন করে বলছেন—

যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা-দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

'প্রাচী' কবিতায় যুগব্যাপী অন্ধকার ও সুপ্তির আলস্য দূর করে প্রাচ্য দেশকে জাগবার জন্যে কবি আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রাচীন জীবনধারার যা-কিছু শুভ ও বিচিত্র—তা আবার অবলুপ্তি থেকে উদ্ধার করতে হবে।

জরার জড়িমা আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নবরূপ তব উঠুক-না ফুটে

করপুটে এইযাচি।

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

নূতন চেতনাব অনুপ্রেবণায় প্রাচ্যদেশ পুনবায জাগ্রত হোক--কবি এই অভীপ্সা প্রকাশ কবেছেন।

কবি 'আশীবাদ' জানাচ্ছেন শ্রীমতী লীলা দেবীকে, কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে বিশ্বে সৌবভ বিকীর্ণ কবার সাধনায মত্ত, বীজ ফলে সার্থকতা লাভ কবতে চায়, সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র ও অন্ধকাব বিদীর্ণ করে কিবণ দান কবে, মৃত্যুব অতীত অমৃত সাধনার তপস্বী সাধনা কবে কবি আশীর্বাদ জানাচ্ছেন—মোহবন্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত কবে প্রেমেব মন্ত্রে দীক্ষিত হোক শ্রীমতী লীলা দেবীব দাম্পত্য জীবন।

এর পরেও কবি শ্রীমতী কল্পনা দেবীকে আশীবাদ জানিয়ে বলছেন—তাঁব কাব্যেব প্রতি শ্রীমতী কল্পনা যে ভক্তিপুষ্প অর্ঘ্যদান করেছে—সেই ত' কবিব যোগ্য পুবস্কাব। বাংলাদেশেব মেযে সে, সে যেন নিজেব হৃদয়কে ছন্দেব সুধাময নন্দন বন কবে তোলে, প্রিযজনকে আনন্দে ভবিয়ে বাখে, প্রেমেব অমৃতে আনন্দলোক সৃষ্টি করে।

'লক্ষ্যশূন্য' কবিতায দেখি কবি বলেছেন যে—গৃহী সবদা নিজেব মাযা ও মোহ দিযে বচা, নিজেব স্নেহ ও সোহাগ দিযে তৈবী গৃহকোণকেই চবম গন্তব্যস্থল বলে ভাবে। জীবনকেন্দ্রিক স্বার্থ-সাধনাব বাইবে তাব আব কোনো কথা নেই, কৌতূহল নেই, অনুসন্ধিৎসা নেই। সে বহির্জীবনেব, মুক্ত জীবনেব, গতিমান জীবনেব বেগ সহ্য কবতে পাবে না, অলক্ষ্যেব অনির্দেশ্যেব যাত্রাকে গ্রহণ কবতে পাবে না। পক্ষান্তবে বথী গৃহজীবনেব মাযায় আবদ্ধ থাকে না, সে জীবনকে চবিযে নিযে বেড়াতে চায, জীবন যে গতিশীল, সেই সত্য উপলব্ধি কবে ঘর্ঘবিত রথবেগে গৃহভিত্তি গ্রাস কবে ফেলে। লক্ষ্যশূন্য গতিকেই সে জীবন বলে মানে, ভালবাসে।

ঘর্ঘবিত বথবেগে গৃহভিত্তি কবি দিল গ্রাস।

হাহাকাবে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস

সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারে দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

প্রবাসী কাগজের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশাই কবির কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তখন তিনি এই 'প্রবাসী' কবিতাটি রচনা করেন। "পরবাসী চলে এসো ঘরে" পঙ্‌ক্তি দিয়ে আরম্ভ হওয়া একটি সংক্ষিপ্ত গানেরই বিস্তৃত ও বিন্যস্ত রূপ হলো এই কবিতাটি।

অনেকে এই কবিতাটির মধ্যে একটি রূপকতার আবিষ্কার করেছেন। তদানীন্তন বঙ্গদেশের সামাজিক বিপর্যস্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটির ব্যাখ্যা করলে ঐ রূপকতার তাৎপর্যটি অর্থহীন হয় না।

আমরা আগে কবিতাটির সরল সাধারণ অর্থ বুঝে নিই। প্রবাসী জনকে নিজ বাসভূমে আহ্বান জানানো হয়েছে, প্রবাসীর শুভাগমনে প্রতীক্ষিত সকলে, প্রকৃতিরও আয়োজনের অন্ত নেই। তবু প্রবাসী কেন আসছে না? কেন তার স্বদেশে আসতে এত দেরী, কেন সে এমন ভুল করছে?

বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে,
আজ তুমি আছ তারে ভুলে।
কোনোখানে সুর নাই,
আপন ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছে দূরান্তরে।

কবি উদাসীন দিশাহীন প্রবাসীকে স্বভূমে আহ্বান জানাচ্ছেন।

যাঁরা এই কবিতাটির রূপকার্থ করে থাকেন, তাঁরা বলেছেন যে এখানে প্রবাসী হলো সে—যে নিজেকে, নিজের দেশকে চিনতে পারে নি। এই সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংঘাতিক মনান্তর ঘটেছিল; মুসলমান নিজেকে হিন্দুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না, যাঁরা নিজ দেশকে স্বদেশভূমি বলে মাহাত্ম্য দিতে কুণ্ঠিত তাঁদের উদ্দেশ্যেই কবি বললেন—

"আঙিনায় আঁকা আলিপনা
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশাইও এই কবিতাটির মধ্যে রূপ-কার্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন।'

'বুদ্ধ জন্মোৎসব' কবি যখন রচনা করেন, তখন তিনি নৃত্যময় শিবের বন্দনাগান লিখছিলেন। নৃত্যের তালে তালে নটরাজ যে সকল বন্ধ ঘুচিয়ে সুপ্তি ভাঙিয়ে চিত্তে সুরের ছন্দ জাগাবেন—তারই বন্দনা চলছে। ছন্দের উন্মাদনায় কবির প্রাণ মেতে উঠেছে। তৎসম শব্দসঙ্কুল ধ্বনি প্রাধান্যের উচ্ছল স্রোতে মন ভেসে চলেছে কবির। তিনি সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু স্বরপ্রক্রিয়াকে স্মরণ করে এই কবিতাটি লেখেন।

গানের সুরে এটি আমাদের বহুশ্রুত, তাই এর অর্থ সহজ হয়ে এসেছে। পৃথিবী আজ হিংসায় উন্মত্ত, দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ কুটিল পথ আর লোভ জটিল জীবন যাত্রা—এ সময় করুণাঘন অনন্তপুণ্য মহাপ্রাণের কাছ থেকে প্রেমের অমৃতবাণী প্রার্থনা করা হচ্ছে, তিনি ধরণীতল কলঙ্কশূন্য করুন!

সহজ রোমান্টিক সুরের একটি মিষ্টি কবিতা হলো 'প্রথম পাতায়'। প্রকৃতির সুন্দর জগতে যে লেখা ফুটে ওঠে—তার তুলনায় কবির হাতের কলম ত' কত কাঁচা। তবু সেই কাঁচা কলমেই প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ধরা পড়ে।

সেই কলমে শিশু দোয়েল
শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি
পারুলদিদির বাসায় দোলে
কনক চাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলাঘরে,
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথহারানো তেপান্তরে।

'নূতন' কবিতায় একটি তত্ত্বকথা আছে। নূতনের মধ্যে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কবি নূতনকে দেখেছেন--এই বেদনাময়তার আলোকে। এক কাল যায়, অন্যকাল আসে। পুরানোকে সরিয়ে নতুন আবার সাজে, কালের ধর্ম তাই, বুঝি বিচারও তাই।

যে-মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরাল,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরাল।
কইল শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেল হতাশে,
তোমাব মাঝে নতুন সাজে
শূন্য আবার ভরাল।

'শুকসারী' কবিতাটি শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুব পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার ছবি দেখে মেঘ ও পবতের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর লেখা সুন্দর একটি কবিতা। শুকসারীব দ্বন্দ্বপ্রচারমূলক প্রচলিত কাব্য-প্রকরণের অনুগামিতা কবিতাটিকে সুন্দরতর করেছে। শুক হিমালয় পর্বতের পক্ষে, সারীর সমর্থন মেঘমালাকে ঘিরে। শুকের মতে গিরিরাজেরই প্রাধান্য, সারী বলে—মেঘও ত' নয় সামান্য, সে গিরির মাথায় থাকে। পাহাড় নদীর জলে প্রাণ ঢালেন– শুকের কথা, আর তখনই সারীর উত্তর—কিন্তু মেঘের দান না হলে যে নদী বাঁচে না। শুক বলে— গিরিশ দিনরাত গিরিতেই থাকেন ; সারী জবাব দেয়—থাকেন, কারণ মেঘের কাছেই অন্নপূর্ণা ভিক্ষাপাত্র ভরে নেন।

শুক বলে, হিমাদ্রি-যে ভারত করে ধন্য।
সারী বলে, মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য,—
বাঁচে সকল জন।
শুক বলে, সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি,—

সারি বলে, মেঘমালার নিত্যনূতন সৃষ্টি ;
তাই সে চিরন্তন।

সামান্যের মধ্যে কবি অনায়াসেই অসামান্যের এলাকায় পৌঁছে যান, তুচ্ছের মধ্যে দিয়েই উচ্চে, সাধারণ পথ ধরেই সাব্লাইমে (Sublime) কত অনায়াসেই তিনি চলে যেতে পারেন!

'সুসময়' প্রকৃতিচেতনামূলক কবিতা। প্রকৃতির রাজ্যেও দুর্যোগ আছে, দুর্দিন আছে, সুদিন আছে, সুসময় আছে। কালবৈশাখীর ঝড়ে সন্ধ্যার সৌন্দর্য লুপ্ত হয়, বনলক্ষ্মীর সৌন্দর্য ধূলিম্লান হয়, বর্ষার পর শিউলি ফুলের গন্ধে আকাশে আলোর উচ্ছ্বাসে, শরৎলক্ষ্মীর হাসিতে সাড়া জাগে। নতুন ফসলের শিষে আলোছায়ার খেলা ফোটে ; তখন সন্ধ্যায় দিগঙ্গনার ললাটে দীপ্তি জেগে ওঠে।

মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার-কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
চরমখনের পরম প্রদীপ জ্বালে।

তখনই ত' সুসময়।

অতীতের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বর্তমানকাল তার নিজের হিসেব নিয়ে জেঁকে বসবে—এইটেই নিয়ম। অতীতাশ্রয়ী হয়ে পুরানোকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলে না, গতিরুদ্ধ হয়, নতুন কালকে তার স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই হচ্ছে 'নতুনকাল' কবিতার মর্মকথা। নাতি নতুন কালের প্রতীক, তার জয় শুধু কাম্য নয়, তার জয়ে পরাজিত পক্ষ দাদামশায়ের গৌরবও বটে।

এই কবিতাটি প্রাচ্য দেশ ভ্রমণকালে লেখা হয়। 'যাত্রী' গ্রন্থে কবি এ সম্পর্কে পরোক্ষে কিছু লিখে যান। বলি দ্বীপে বাঙলি রাজের কোনো এক আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় কবি নিমন্ত্রিত হয়ে যান। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে যাত্রী গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে, বর্তমান কালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।...অতীতকাল

যত বড় কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমানকালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।"[৮] এই ভাবটি 'নূতন কাল' কবিতার মধ্যে খুব্ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'পরিণয় মঙ্গল' কবির সেক্রেটারী শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহ উপলক্ষে লেখা। অমিয়বাবু একজন কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অমিয়বাবু বিবাহ করেন ডেনমার্কের মেয়ে মিস্ সিগ্‌গার্ডকে: রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই মিস্ সিগ্‌গার্ড শান্তিনিকেতনে আসেন, এবং কবি এঁর নাম রাখেন হৈমন্তী দেবী। এঁর সঙ্গে শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহোপলক্ষে 'পরিণয় মঙ্গল' রচিত হয়। প্রকৃতিচেতনার রূপকে মানবীকে দেখেছেন কবি, হৈমন্তীর নারীজীবনকে প্রকৃতির লীলা-রূপের অন্তরালে দেখেছেন।

'জীবনমরণ' কবিতাটি পুরানো ধরনে লেখা। রবীন্দ্রনাথ বিরহভাবুকতার কবি: এই কবিতায়ও বিরহের একটা সুর শোনা যায়। ফাল্গুনে চারিদিকে উচ্ছলতা, আনন্দের উচ্ছ্বাস, কিন্তু তার মধ্যেও বিরহের ও বেদনার অদৃশ্য বাতাস বয়, কবিও বিমনা হয়ে পড়েন বসন্তের পটভূমিতে।

আমারো প্রাণে বুঝি বহেছে ওই হাওয়া,
কিছু-বা কাছে আসা, কিছু-বা চলে যাওয়া,
কিছু-বা স্মরি কিছু পাসরি।
যে আছে যে বা নাই আজিকে দোঁহে মিলি
আমার ভাবনাতে ভ্রমিছে নিরিবিলি
বাজায়ে ফাল্গুনের বাঁশরি।

'গৃহলক্ষ্মী' কবিতায় কবি প্রত্যূষের শুভলগ্নকে আহ্বান জানিয়েছেন। অকলঙ্ক উষাকে কবি গৃহলক্ষ্মীরূপে সম্বোধন করেছেন। প্রত্যূষ আলোক সুধায় পৃথিবীকে অভিষিক্ত করুক, দেহমনের অবসাদ দূর হোক, ব্যক্তিপ্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে মিলনমন্ত্রে মাতুক। মৌনমুখে বাণী জাগুক, দুঃখকে জয় করার আনন্দ আসুক যেন 'অমৃত

তোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ।' শুভ সংগ্রামের বর্ম পরতে যেন পারি, সংশয় দূরে যাক, ধর্ম যেন জয়ী হয়। কবি কল্যাণরূপিণী সেই গৃহলক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করছেন যে আর যেন পিছনের টানে অগ্রসরণ বন্ধ না হয়, দুর্বল শোকে আচ্ছন্ন হতে না হয়, সকল মোহবন্ধ দূর করে দিয়ে আমরা যেন এগোতে পারি।

১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে কবি কোলকাতায় অবসন্ন বোধ করেন, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মশাই কবিকে পরীক্ষা করে বললেন যে কবি সম্পূর্ণ সুস্থ, তাঁর মন এখনো তাজা আছে। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, শরতের প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনের আকাশে নীলের সমারোহ, অরণ্যে শুভ্র কাশের জাগরণ, চারিদিকে আনন্দের ইশারা। তিনি রাণীদেবীকে পত্রে লিখলেন—"আজ সকালে শরতের আকাশে আলোতে হাওয়াতে মিলে আমার শুশ্রূষায় লেগেছে।"[৯] এই অনুভূতির ফসল হলো 'রঙিন' কবিতাটি।

চারিদিকে জলে-স্থলে রঙের খেলা, আনন্দের মাতন, কোনো বাধা নেই, রাতদিন তারা দুঃসাহসের সঙ্গে এগিয়েই চলেছে। কবির বাহ্য ইন্দ্রিয় এই আনন্দে না মাতুক, মন দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন রঙিনকে।

অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা,
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা আকাশে রঙ ওড়ায়, মাছেরা গভীর জলে রঙের খেলায় মাতে, বনে রঙের মেলা বসে, ফুলে ফুলে রঙের বাহার, 'মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।' বসন্তরাজের অদৃশ্য আদেশে রঙের আসর গড়তে 'সাজো সাজো রব' পড়ে যায়। 'বাহির ভুবনে' তাদের রঙের উৎসব, কবির রঙ তাঁর গোপন মনে।

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।

আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে।

'আশীর্বাদী' কবিতা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত। আজ কবি নিজে এবং যতীন্দ্রমোহন সকলেই প্রবীণের দলে, একদা কোনো কালে নবীন ছিলেন। বসন্তে আজ কত ফুলের কুঁড়ি ধরেছে, মৌমাছিরাও আবাব কত ফুলের মধু লুটে নিয়ে গেছে। ফাল্গুনের ফুল শ্রাবণের ফল হোক—এই কবির আকাঙ্ক্ষা!

'বসন্ত উৎসব' কবিতাটিব ভূমিকাতেই কবি কাব্যেব সারমর্ম বিবৃত কবেছেন। এটি 'বনবাণী' গ্রন্থেব উপযোগী বৃক্ষবন্দনামূলক কবিতা। বৃক্ষ হলো আদিম প্রাণ। শালগাছকে বন্দনা কবছেন, আমাদেব সবার আগে পৃথিবীকে সবুজ রঙে সাজিয়েছে, ঝড় ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুদ্ধ করে মাথা তুলে বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাব প্রথম অতিথি হিসেবে বনেব পাখি এসে শাখায় বাসা বেঁধেছে। মানুষকে এই বৃক্ষ দিয়েছে ছায়া, নবপল্লবেব শ্যামল স্নিগ্ধতা। সে বৈশাখের তাপে শান্তি দেয়, নববর্ষাকে নিবিড় কবে তোলে, শরতে শুভ্র জ্যোৎস্নার রেখাগুলিকে ছায়াব সঙ্গে বনের ধূলিকে সাজায়। আজ শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবে কবি শালগাছের বন্দনা গান কবছেন।

এবপবেব তিনটি কবিতাই কবির আশীর্বাণী। প্রথমে সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে কবিব 'আশীর্বাদ'। মুক্তবিশ্বে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের আসল সত্তার পবিচয়। সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দরিদ্রের মতো নিজেকে আটকে রাখা যথার্থ জীবনযাপন নয়।

দ্বিতীয় 'আশীর্বাদ' কবিতাটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশতম জন্ম-দিবস উপলক্ষে লেখা। বৃক্ষ যেমন সূর্যকিরণ মর্মগত করে পত্র ও পুষ্পে সজ্জিত হয়ে বসন্তের আরাধনা করে, তেমনই দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সংগীত রশ্মিগুলি তুলে নিয়ে নিজের সাধনায় ব্রতী হয়েছে।

রবির সম্পদ হ'ত নিরর্থক তুমি যদি তারে

না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর,
রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।

তৃতীয় কবিতাটিও কবির আশীর্বাণী—যদিও এটির নাম দেওয়া হয়েছে—'উত্তিষ্ঠত নিবোধত'। নিজের জীবনকে দীপ করে জ্বালিয়ে সত্য সাধনায় ব্রতী হবার আহ্বান জানিয়েছেন কবি, অসত্যের বিঘ্ন দূর করে সত্য লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। আর ভারতের 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' মন্ত্র যেন চিন্তায় কর্মে ফুটে ওঠে—এই কবির আশীবাণী।

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি এই জটিল পৃথিবীর হানাহানি ও ঈর্ষাপরায়ণতার আগুনে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে পুড়ে ছাই হচ্ছে, তারই বেদনা প্রকাশ করেছেন কবিতাটির গোড়াতে। স্পর্ধা ও অহংকার মানুষের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে—তা দেখে কবির মন ক্ষুব্ধ হয়, মনে ধিক্কার জাগে। মানুষই মানুষের প্রাণনিকেতনে ভয় ও হিংস্রতা আকীর্ণ করে! পৃথিবী যখন এই রকম হিংসায় উন্মত্ত—তখনই রাজার কুমার সকল কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়ে মানুষকে তার অহংকারের বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে আবির্ভূত হলেন। বর্তমানকাল থেকে ভগবান্ বুদ্ধ নিত্যকালের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন! নিরাশ ভরসাহীন বিশ্বাসশূন্য চিত্তে ভগবান বুদ্ধের করুণা বর্ষিত হোক—এই হলো কবির প্রার্থনা।

'অতুলপ্রসাদ সেন' কবিতাটি ১৯শে ভাদ্র ১৩৪১ সালে লেখা। 'পরিশেষ' গ্রন্থটি অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গীকৃত, গ্রন্থ প্রকাশের দু বছর পরে কবি যখন অতুলপ্রসাদের মৃত্যুর খবর পান—তখন এই কবিতাটি লেখেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজনী অংশে এটির স্থান হয়েছে। মর্ত্যলোক থেকে অতুলপ্রসাদ চলে গেলেন, জীবিতকালে তিনি কবিকে বলতেন—দূরে থাকলে কি হবে, 'হবে হবে, দেখা হবে।' কবির মনে পড়ছে সে কথা। বন্ধুত্বের, সংগীতময়তার সব কথাই মনে পড়ছে। কবির দীর্ঘ আয়ু অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেক বিরহ ও বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করতে হয়, অনেক শোকতাপ কষ্ট দিতে থাকে।

পুনশ্চ

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অব্যবহিত পরেই 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হয়; ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে 'পরিশেষ' এবং ঐ বছরের আশ্বিনেই বের হলো 'পুনশ্চ'। আমরা আগে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে 'পরিশেষ' গ্রন্থের কাল থেকেই কবি-জীবনের অস্তরাগ শুরু হয়েছে। কবি চেয়েছিলেন যে তাঁর শেষ জীবনের আন্তর চেতনা এবং প্রকাশ-ব্যাকুল মনন পূর্ণতা লাভ করে নিজেকে অভিব্যক্ত করবে, কিন্তু কবির এই ইচ্ছা পূর্ণ হলো না, কেন না অস্তরাগের কাব্য হিসাবে 'পরিশেষে'র মধ্যে কবি যে সব কথা বলতে চেয়েছেন, যে আত্মজিজ্ঞাসার সমাধান চেয়েছেন— তিনি পূর্ণভাবে তা বলতে পারলেন না, এবং তার সদুত্তরও পেলেন না। সুতরাং তাঁকে থামলে চলবে না; কবিকে লিখতেই হবে, তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ তাকে করতেই হবে, তাই নতুনভাবে আবার তাকে শুরু করতে হলো। আগের না-বলা বাণীকে শেষ করার জন্যে কবিকে সচেষ্ট হতে হলো।

সেইজন্যে তাঁকে 'পরিশেষে'র পর আবার শুরু করতে হয়। আমাদের মনে হয় এই কারণের জন্যে এই গ্রন্থের এই 'পুনশ্চ' নাম। কোনো নিবন্ধ লেখা শেষ হয়ে গেলে যদি সব বক্তব্য বলা শেষ না হয়, কোনো পত্রে 'ইতি'র পরেও যদি দেখা যায় কিছু কথা অলিখিত আছে—তখন আমরা পুনশ্চ দিয়ে অনুলেখনে সেই না-বলা বাণী লিপিবদ্ধ করি। 'পুনশ্চ' দিয়ে কবি তাঁর অসম্পূর্ণ জীবনবাণীর বাকী কথা বলতে চেয়েছেন, অস্তরাগের যে রঙ 'পরিশেষ' গ্রন্থে প্রতিফলিত হয় নি, 'পুনশ্চ'তে কবি তাকে রঙীন করতে চেয়েছেন। সুতরাং সহজ করে সংক্ষেপে বলা যায় যে 'পরিশেষে' যা শেষ হয়েও শেষ হয় নি, তারই জের আছে 'পুনশ্চ' গ্রন্থে।

শুধু যে পুরানো কথার জের থাকে পুনশ্চ বা অনুলেখন শীর্ষক বক্তব্যে—তা নয়, কিছু নতুন কথাও সেখানে বলা চলে, তাতে পত্র বা নিবন্ধের মূল গৌরবের হানি হয় না। আলোচ্য 'পুনশ্চ' গ্রন্থেও আমরা কবির কাছে কিছু নতুন কথা শুনতে পেয়েছি। পরে 'পুনশ্চে'র মূল সুরের আলোচনা প্রসঙ্গে এই নতুন কথা কি—তা উল্লিখিত হবে।

'নূতন কাল' কবিতাটির বক্তব্য 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের নামকরণে কিছুটা আলোকপাত করে। কবি যে বিন্যাসে কাব্য রচনা করতেন—তার কাল ফুরিয়েছে বলে কবি ভাবছেন, কিন্তু কবিকে তবু পুরাতন রীতি ছেড়ে আবার নব বিন্যাসে শুরু করতে হয়, নতুন কালের দাবি মেনে নিয়ে তাঁকে আবার আসরে নামতে হয়। 'পুনশ্চ' গ্রন্থ এই নব বিন্যাসরীতিতে কালের দাবি মেটাবার ফসল।

আগেই বলেছি 'পুনশ্চে' যেমন নতুন কথা আছে, তেমনি আছে নতুন বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য ও কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কে বলেছেন—"কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু-যোগান নতুন পথ নেয়। কোনো কোনো মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রং হয় রাঙা ; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র : আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্তস্বাদেরও আভাস থাকে।" 'পুনশ্চ' গ্রন্থেও তার নতুন পথ-পরিক্রমার সন্ধান আছে, তাঁর কাব্যের পালা-বদলের খবর আছে, ভাব এবং ভাষা—উভয় ক্ষেত্রেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকের দিক থেকে 'পুনশ্চে' তিনি গদ্যকাব্য সৃষ্টি করলেন, পদ্যরীতির অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙলেন, অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দিলেন। ভাষাও হলো সহজ, সরল—একেবারে গৃহস্থ পাড়ার ভাষার মতো। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের কাব্যবিষয়েও কবির নূতনত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কবি, তাঁর কাব্যে বরাবরই সাধারণ মানুষের একটি মহিমান্বিত স্থান আছে, 'পুনশ্চ' গ্রন্থে তা আর একবার প্রমাণিত হলো,—কবি যেন তাঁর দরদী অন্তরখানি পূর্ণরূপে

উজাড় করে দিতে পারেন নি, 'পুনশ্চে' তাই নতুন করে আবার আয়োজন করেছেন। শুধু সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা নয়, কবির মরমী মনে প্রাণীজগতেরও একটা স্থান আছে; 'পুনশ্চে' বিশেষ করে ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতি কবির কৌতূহল প্রকাশিত হয়েছে, এই সব প্রাণীদের সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্যে তিনি ব্যথিতও হয়েছেন। গোধূলি-পর্যায়ের কাব্যের একটি প্রধান সুর হলো আত্মজীবন, বিশ্বসৃষ্টি-রহস্য ও ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। 'পরিশেষ' গ্রন্থে—তা যেন সবটা বলা হয় নি, তারও জের আছে 'পুনশ্চে'। পরে আমি এ নিয়ে ঈষৎ আলোচনা করবো।

রবীন্দ্রনাথের অন্য কাব্যগ্রন্থের মতো 'পুনশ্চে' বিবিধ সুরের সমন্বয় ঘটলেও কিন্তু নামকরণের দিক থেকে 'পুনশ্চ' অত্যন্ত সার্থকনামা গ্রন্থ—একথা স্বীকার করতেই হবে। রবীন্দ্র-কাব্যের আবেগ যেমন বার বার বদলেছে, বক্তব্য যেমন নতুন চেহারায় আবর্তিত হয়েছে বার বার, তেমনি তাঁর কাব্যভাষা এবং রূপ-প্রকরণের একটি স্বতন্ত্রতা নতুন হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর কাব্যের পালা-বদলের উপযোগিতা রক্ষা করে। 'পরিশেষে'র যুগ থেকে কবির জীবনে গোধূলির শেষরশ্মির বর্ণ-বিভঙ্গ, আর 'পুনশ্চে' সেই বর্ণ-বিভঙ্গের অস্তরাগচ্ছটায় কবি আবার নতুন করে দিনের শেষের পালা শুরু করেছেন। তাই এই গ্রন্থের নাম 'পুনশ্চ',—কি এর বক্তব্য, কি এর বিন্যাস, উভয় দিক থেকেই এই নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এবার 'পুনশ্চে'র মূল সুর। আগেই গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে 'পুনশ্চে'র ভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু-চার কথার উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সেই কথার জের টেনেই 'পুনশ্চ' গ্রন্থের মূল সুরের আলোচনা করছি। কতকটা দ্বিরুক্তি বলে মনে হতে পারে।

গোধূলি পর্যায়ের কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কবির সবচেয়ে যেটি বড় পরিচয়—তা 'পুনশ্চে' বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, বেদনা-বিহ্বলতা, মান-অভিমান—সব কিছুকেই

কবি বিশেষভাবে মর্যাদা দান করেছেন। সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে তুচ্ছ, বিড়ম্বিত মানুষের প্রতি কবির দরদ যে কতখানি—তা ছেলেটা, সহযাত্রী, শেষদান, বালক, কোমল-গান্ধার সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, একজন লোক, ভীরু, ঘরছাড়া, অপরাধী, অস্থানে প্রভৃতি কবিতা পড়লেই বোঝা যাবে। এই কবিতাগুলির বাস্তবধর্মিতা এবং গার্হস্থ্যরস এগুলিকে আরো বেশী মাহাত্ম্য দান করেছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাতঃ বক্তব্য সাধারণ, বাইরে থেকে পড়লে মনে হবে,—সহজ সুরে বুঝি সহজ কথারই অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু এদের অন্তরে এক গভীর বাণী লুকিয়ে আছে। পত্র লেখা, খ্যাতি, উন্নতি, একজন লোক প্রভৃতি এ জাতীয় কবিতা।

কবি 'পুনশ্চে' শুধু যে তুচ্ছ, অবহেলিত মানুষের বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন, শুধু যে মানব মহত্ত্বের কথাই ঘোষণা করেছেন—তা নয়, হীন প্রাণীর প্রতিও তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই। তাঁর 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থেও দেখেছি কবির মরমী মনে ক্ষুদ্র প্রাণীরও একটি মর্যাদার স্থান আছে। 'পুনশ্চে' আমরা আবার তাঁর সেই আন্তরিকতা এবং মমত্ববোধের নিবিড় পরিচয় পেলাম। 'পুনশ্চে' তিনি যে শালিখ, মাকড়সা, পিঁপড়ে, রাস্তার কুকুর, গুবরে পোকার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন—তা লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে কীটের সংসার, শালিখ প্রভৃতি কবিতার নাম করা যেতে পারে। 'ছেলেটা' কবিতায় একটা নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডির কথা আছে। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' কবিতাতেও একটি কুকুরের কথা আছে। কবির মন এই সব ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি যতই সহানুভূতিশীল ও বেদনাপ্রবণ হোক না কেন, কবি তবু ওদের মনোলোকে প্রবেশ করতে পারেন নি। সে নিয়ে কবির এক গভীর আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে 'পুনশ্চে'।

'পুনশ্চে'র আর একটি বিশিষ্ট সুর অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন সম্পর্কে লেখা কয়েকটি কবিতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। 'পুনশ্চ' গ্রন্থ যখন তিনি

লেখেন—তখন দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের তীব্র আন্দোলন স্বরু হয়েছে। মহাত্মাজী এই অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করছেন। স্মরণ রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ এই সময় তাঁর বিখ্যাত 'কালের যাত্রা' নাটিকা রচনা করেন। 'পুনশ্চে'র মধ্যে কয়েকটি কবিতায় রবিদাস, রামানন্দ প্রভৃতি কাহিনীর মাধ্যমে কবি মানবিকভাবকে প্রকাশ করেন। 'প্রথমপূজা', 'রংরেজিনী', 'শুচি', 'স্নানসমাপন', 'প্রেমের সোনা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

'পুনশ্চে' আমরা কবির প্রকৃতি-প্রীতির একটি বিশিষ্ট রীতির পরিচয় পাই। তবে এখানে তিনি প্রকৃতিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন—তার মধ্যে গভীরতা নেই, বরং বিন্যাসের সৌকর্যই প্রাধান্যলাভ করেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য স্বাভাবিক সুষমায় উদ্দীপ্ত হয় নি এখানে, পথ চলতে চলতে কবি যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চাকচিক্যে মুখর হয়ে তাঁর কল্পনাকে ওই বাস্তব সৌন্দর্যের সামগ্রী করে তুলেছেন। 'পুকুরধারে', 'ফাঁক', 'বাসা', 'স্মৃতি', 'ছুটি', 'পয়লা আশ্বিন', 'সুন্দর' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। এখানে কবির রোমান্টিক মনের একটি মিষ্টি আমেজ পাওয়া যায়।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি-বর্ণনা চিত্রধর্মময়। এখানে বাস্তবরসের প্রাধান্য, যাথার্থ্যের প্রতি আনুগত্য। 'সোনার তরী' পর্বে কবির যে প্রকৃতি-বর্ণনা, তাতে কবির প্রকৃতি-প্রীতি কল্পনার মায়াকাজলে মিশ্রিত হয়ে একটা রোমান্টিক চরিত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল। 'পুনশ্চে' আঁকা প্রকৃতি-চিত্রগুলিতে কল্পনার কোনো রঙ রস নেই, তাই কৃত্রিম অথবা বর্ণনাতীত হয় নি; পদ্মাপারের উজ্জ্বল শ্যামল রঙ, কোপাই নদীর শীর্ণ পাণ্ডুরতা—সবই আছে, চোখে-দেখা দৃশ্য একেবারে যাথার্থ্যের উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 'সোনার তরী' পর্বের কবি প্রাকৃত সৌন্দর্যের মাধ্যমে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর যে রোমান্টিক অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত ছিলেন—এখানে তার সে সত্তাটি অনুপস্থিত। এখানে কবি বরং দার্শনিক ভাবুকতার

মোহে প্রকৃতি-সৌন্দর্যকে কখনো বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। 'পুনশ্চে'র প্রকৃতি-বর্ণনা সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে এ সময় রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অসংগতি ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে আন্তর সংগতিটি ধরার কাজ হলো চিত্রকরের। 'পুনশ্চে'র রবীন্দ্রনাথ চিত্রকরও বটেন,—সে কথাটা যেন আমরা মনে রাখি।

'পুনশ্চ' গ্রন্থেও আত্মজীবন, মানুষের আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয়, বিশ্বসৃষ্টিরহস্য, মানবসত্তা প্রভৃতি বিষয়ে কবির অবাধ জিজ্ঞাসা ও অপরিমেয় কৌতূহল বাণীরূপ লাভ করেছে। কবির নিরাসক্ত জীবন-প্রীতি, বাস্তব প্রকৃতিব প্রতি অনুরাগ, এবং উদাসীন মহাকালেব লীলার সঙ্গে কবির নিজেব জীবনকে মিলিয়ে নেবার আগ্রহ লক্ষ্য করেছি।

শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-বিলাসী হয়ে পড়েন। তাঁর ফেলে-আসা জীবনেব ছোটখাটো ঘটনার স্মৃতি-অনুধ্যানের বাণীরূপও এই গ্রন্থে দেখা যায়।

আর আছে ভাবপ্রধান ও রূপক জাতীয় কয়েকটি কবিতা। মানব মনে মুক্তি আনার কথা আছে 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। রূপকার্থ এখানে প্রচ্ছন্ন থাকলেও পতিত মানবাত্মার বিপর্যয়—এবং তা থেকে মুক্তির উপায় এখানে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই এটি রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ সৃষ্টি বলে সমালোচক-মহলে অভিহিত। কবি এখানে চরম আদর্শের জন্যে মানব মনের ব্যাকুল অভিসারের কথা বলেছেন। মানুষের আত্মস্বরূপেব যথার্থ নিশানা কি—তার কথা ব্যক্ত হয়েছে 'শাপমোচন' কবিতায়। এই 'শাপমোচন' কবিতাটিও রূপক কবিতা। আর 'চিররূপের বাণী'ও রূপক কবিতা। এখানে কবির সৌন্দর্য-চেতনার ধারণাটির কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'পুনশ্চে'র মূল সুর বলতে এইটুকুব উল্লেখই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

'পুনশ্চ' গ্রন্থ সম্পর্কে যে স্বল্প, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনা দেখতে

পাওয়া যায় তার বেশীটা 'পুনশ্চে' গদ্যরীতির বিন্যাস সম্পর্কিত। এমন কি কবিগুরু স্বয়ং এই গ্রন্থের বাণীবিন্যাস-রীতি নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছেন,—নবপ্রবর্তিত গদ্যচ্ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, 'পুনশ্চে' এই ছন্দের উপযোগিতার কথা বলেছেন, পদ্যচ্ছন্দের সঙ্গে এই ছন্দের মৌল পার্থক্য কোথায়—তা তিনি নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'পুনশ্চের' যে আর নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আছে—সে সম্পর্কে কি কবি, কি তাঁর সমালোচক—কেউই বিশেষ কিছু বলেন নি। তাই বহু আলোচিত গদ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে পূর্বে কিছু না বলে 'পুনশ্চের' অন্য বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করি। প্রথমেই পুনশ্চের বাস্তব রসের কথা মনে হয়. কবি যখন বাস্তব দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন—তখন কল্পনার মায়াস্পর্শে সেই প্রকৃতিকে তিনি স্বর্গীয় দীপ্তি এবং সুষমার অপূর্বতা দান করেন নি, বরং 'পুনশ্চে'র কবিতায় যে প্রকৃতির স্পর্শ আমরা পাই—সেখানে কবিচিত্তের কল্পনার আলোক-প্রক্ষেপ অত্যন্ত কম, কিন্তু কবি বাস্তবতার রঙে সেই প্রকৃতিকে এমন সংযতভাবে চিত্রিত করেছেন—যা কবির রোমান্টিক কাব্যের মতোই সমান আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। 'সোনার তরী' বা 'চিত্রা' পর্বে যেমন কবির মন সৌন্দর্যানুসন্ধানের ব্যাকুলতায় তন্ময় ছিল এখানে কবির তেমন আবিষ্টভাব নেই, তাঁর দেখা প্রকৃতির অতিপ্রিয় চিত্রগুলি বর্ণনার অকৃত্রিমরাগে এবং বাস্তবতার রঙে জীবন্ত হয়ে ফুটেছে। কোপাই বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাই বলেন—

অনার্য তার নামখানি

কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর

কলভাষার সঙ্গে জড়িত।

গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,

স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ

তার এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে।

'খোয়াই' কবিতাটির আরম্ভ এই রকম—

মোরে   পশ্চিমে বাগান বন চষা-ক্ষেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়,
মাঝে মাঝে জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতালপাড়া;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।

'পুকুরধারে' বিকেলের বর্ণনায় কবি বললেন—

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

'বাসা', 'সুন্দর', 'স্মৃতি' প্রভৃতি নানা কবিতায় প্রকৃতিবর্ণনা এমনই চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে।

'পুনশ্চে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তুচ্ছ, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, ঘটনাচক্রে, বিড়ম্বিত মানুষের টুকরো টুকরো কাহিনীর বর্ণনায় কবির সহানুভূতি উপচে পড়েছে। সাধারণ মানুষ যে অসাধারণ মানব-মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল—রবীন্দ্রনাথ সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এই জাতীয় কবিতা ঈষৎ গল্পরসের ছোঁয়াতে পাক খেয়েছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নানান স্তরের মানুষ ভিড় করে এসেছে কবির দরদী অন্তরের অকৃপণ স্নেহ ও সোহাগ লাভ করার জন্যে। মানুষ তুচ্ছ পরিবেশে থাকলেই যে তুচ্ছ নয়, তারও উচ্চতার অধিকার আছে—'গল্পগুচ্ছে' তিনি যে কথা বার বার ঘোষণা করেছেন সেই দরদ ও সহানুভূতি আবার যেন আবর্তিত হয়েছে 'পুনশ্চে'। বাশি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে, অপরাধী, ছেলেটা, বালক, শেষ চিঠি ইত্যাদি কবিতাগুলি—এর প্রমাণ। অবশ্য ছোট গল্পের পরিণতিতে যে চমক এবং অভিঘাত থাকে—যাকে কেন্দ্র করে পাঠকের মনে আশ্চর্যের মিনার গড়ে ওঠে—তেমন কোনো বিস্ময় এবং ঘটনা-বৈভবের নাটকীয় চমৎকারিত্ব নেই এই আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে, শুধু আছে দরদী

কবির সহানুভূতিশীল মনের কাব্যরস—যা সুধার আকারে নিত্যনিস্যন্দী হয়ে এই সব জীবনকে অনির্বচনীয় সুরভিতে সিক্ত ও সিঞ্চিত করেছে। গল্পগুচ্ছেও আমরা যে সব ছোটগল্প দেখি—সেগুলিতেও লেখকের হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ফুটে উঠেছে। 'পুনশ্চে'র গাথা কাহিনীর ক্ষেত্রেও তাই, কবি মানবীয় দরদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন অথচ কোথাও লিরিকরসের অভাব ঘটান নি। গদ্যচ্ছন্দে সত্যিই এমন উঁচু কাব্যিক ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে—যাতে পাঠকের মন মুগ্ধ না হয়ে পারে না। যদিও এ জাতীয় কাব্যে এই গদ্যচ্ছন্দের ব্যবহার নিয়ে মতদ্বৈধ আছে, তবু এই গাথা কাব্যে বর্ণিত চরিত্রের ব্যাখ্যানে কবি ঘটনার ওপর জোর দেন নি, তাদের সম্পর্কে তিনি শুধু কয়েকটি কথা বলেছেন, সেই বিবৃতির মধ্যে চরিত্রটি লিরিকরসে সিক্ত হয়ে উঠেছে—অভিব্যঞ্জিত হয়েছে, এ বড় কম কথা নয়। এদিক থেকে 'পুনশ্চে'র এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

'পুনশ্চে'র এই গাথাকাব্য সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কোনো সমালোচক এগুলিকে না-গল্প, না-কাব্য—কিছুই হয় নি বলে রায় দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ এগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত করা হয়েছে। ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস বলেন—"রবীন্দ্রনাথের যে কবিমানস অতুলনীয় ছোট গল্পগুলির সৃষ্টি করেছে, তাই গদ্যচ্ছন্দের সুবিস্তৃত বাহন অবলম্বন করে সহজেই কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং বাস্তবতার মধ্যে বিচরণ করেছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলি কাব্যাকারে ছোটগল্প হয় নি, কারণ এগুলির মধ্যে ঘটনার আঘাতকে বশীভূত করে নায়ক-নায়িকার মনোবেদনা ও কবির কাব্যরস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে, যেমন ঘটেছে—'সাধারণ মেয়ে' বা 'বাঁশি' কবিতায়।"[১]

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও এই জাতীয় কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—"লঘু সুরে অর্ধজাগ্রত কল্পনায় স্তিমিত চেতনার গল্প বলার ভঙ্গিতে আখ্যান রচনা।"[২] আমাদের মত হলো, আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে

গল্পের বস আছে, তবু কাব্যের আস্বাদই এগুলিতে বেশী পাওয়া যায়। এই সব কাব্যের ভাষার সৌন্দর্য, এবং কবি-হৃদয়েব আবেগ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু গল্প হিসাবে এগুলিব কযেকটিব মধ্যে ঈষৎ দোষ দেখা যায়, এদেব মধ্যে কেন্দ্রগত রসের ঘাটতি আছে মনে হয়, একটানা অবাধগতিতে বসেব একটি ধাবা প্রবাহিত হয় নি, নিববচ্ছিন্ন বস ও সৌন্দর্য পাঠকচিত্তে কয়েকটি ক্ষেত্রে অনির্বচনীয় চমৎকাবিত্বেব স্থষ্টি কবে না।

ডক্টব শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইও 'পুনশ্চে'ব আখ্যায়িকামূলক কাব্যগুলি সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন—"এগুলি কাব্যবস মেশানো গল্প-বিবৃতি।[৩] তিনিও এগুলিকে পরিপূর্ণ গাল্পিক মর্যাদা দান কবেন নি, ববং ববীন্দ্রনাথেব কাব্যসৌন্দর্যেব প্রশংসা কবে তিনি বলেছেন—"ববীন্দ্র-নাথ গদ্য, পদ্য, গদ্যকবিতা যাহাই লিখুন না কেন, তাঁহার মৌলিক কবিত্বশক্তি স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ ও অর্ধস্বচ্ছ সমস্তবিধ আববণেব মধ্য দিযাই ভাস্বব।"[৪]

'পুনশ্চে'ব আব একটি বৈশিষ্ট্যেব কথা উল্লেখ না কবে পাবছি না। শেষজীবনে ছবি আঁকায কবি খুব উৎসাহী হযেছিলেন। নানা অসংগতিব মধ্যে কোথাও একটি মহতী সংগতিব সুব বাজছে—তিনি তাব রূপদান কবতেন। 'পুনশ্চতে'ও এই বকম কযেকটি চিত্র আছে। অসংগতিব মধ্যে কোথায় যেন মিলেব ইঙ্গিত দিয়েছেন, এ কালেব ছবিতেও যেমন এ জিনিস বঙেব তুলিতে জয়লাভ কবেছে, 'পুনশ্চে'র কয়েকটি কবিতায তেমনি এই একই জিনিস ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী' কবিতাব অন্তর্মূলেব দিকে লক্ষ্য কবলেই তা ধবা পডবে। কথা দিয়েই তিনি সূক্ষ্ম তুলির ফলশ্রুতি ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রশিল্পী কবিব প্রাজ্ঞ চেতনাব যে বঙ যে সৌন্দর্য ধরা পডেছে—তা তিনি শব্দেব তুলিতে এঁকেছেন, সে ছবি আমাদের কাছে একেবাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ধবা পড়েছে।

'পুনশ্চ' গ্রন্থে ববীন্দ্রনাথ যে সব অলঙ্কাব ব্যবহাব করেছেন—তা সবই

প্রাত্যহিক জীবন থেকে আহরণ করা, মনন-ধর্মিতা তাতে কম, নিত্যকার সংসার-জীবনের ছবিই ফুটে উঠেছে সর্বত্র। যেমন,

এদিকে বাগানে পথের ধারে,
টগর-গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।

'খোয়াই' কবিতার চষা ক্ষেতের পাশের পথরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন—"রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।" 'দেখা' কবিতায় ঝড়-শেষের আকাশ সম্পর্কে তিনি স্বচ্ছন্দেই বললেন—"আকাশ নিকিয়ে গেল কে।" ভাষার সৌন্দর্য পরিবেশে কেমন অপূর্বতা লাভ করেছে—তা 'পুনশ্চ' গ্রন্থের প্রায় প্রতি কবিতাতে ব্যবহৃত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারগুলি লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি হবে। 'সুন্দর' কবিতার গোড়াতেই দেখি—

প্লাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।

'বিচ্ছেদ' কবিতায় দেখি—

টিপি টিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।

'স্মৃতি' কবিতায় পাই—

উত্তর দিকে সিসু গাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদামাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো,
খররৌদ্রের গায়ে হাল্কা উড়ানির মতো।

এমনধারা টুকরো উদাহরণ মুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে পুনশ্চের প্রায় প্রত্যেক কবিতাতে। গদ্য কবিতায় মিলের অভাবনীয় চমকের অভাব-

জনিত ক্ষতিপূরণ তিনি এমনই কাব্যভাষার দ্বারা পূর্ণ করেছেন। অভিব্যক্তির মধ্যে যেমন কল্পনার হিরণ-দ্যুতি, তেমনই বিশেষণ প্রয়োগেও কবির অসামান্য কারুকার্য। উদাহরণ সব কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে। অলঙ্করণের সৌন্দর্যসাধনের সঙ্গে কবির সূক্ষ্ম মননের এক আশ্চর্য ও অপূর্বসুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে। 'আরোহী' কবিতার তিনটি লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে—

তারা নিন্দের নীহারিকা—
ও হল নিন্দের তারা,
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া

'ফাক' কবিতায়ও এই জাতীয় মননধর্মী উপমা অলঙ্কারের সাক্ষাৎ মেলে,

কর্তব্যের বেড়ায় ফাক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।

'পত্র' কবিতায় পাই -

ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয় নি লেপে কালি মাখিয়ে।

এছাড়া, বিস্তৃত বিন্যাসের মাধ্যমে সূক্ষ্ম উপমা সৃষ্টি 'পুনশ্চ'র আর এক বৈশিষ্ট্য। 'নূতন কাল' কবিতায় কবি নিজেকে ফেরিঅলা বলে উপমিত করেছেন—সেই কয় পঙ্‌ক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'পুনশ্চ'র কাব্যভাষার বৈচিত্র্যই এই। নতুন করে সুষমা সঞ্চার করেছেন তিনি কাব্যভাষায়: যাকে বলেন গৃহস্থপাড়ার ভাষা, আসলে তা আদৌ সাধারণ গেরস্তর ভাষা নয়, চিন্তার ধনে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ গৃহস্থের ভাষা। 'আবর্তের ঘাঘরা', 'লাইব্রেরী-লোক', 'বিকেলের প্রৌঢ় আলোয়', 'চোরাই ছায়া', 'বর্তমানের-নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন', 'গরিব ধুলো', 'ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি', 'ঝকমক করা গঙ্গা', 'অল্প-

জল নদী', 'ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা দেওয়া মাইনের মতো', 'কুয়াশা-ভিজে হাওয়া', 'ছলোছলো শব্দে চলে গাড়ি' প্রভৃতি ভাষার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অতি সাধারণ চিন্তাদীন গেরস্ত পড়ুয়ার পক্ষে সহজ নয়। তাই কবি নিজে 'পুনশ্চে'র গদ্যরীতি এবং ভাষা নিয়ে একাধিক আলোচনা করেছেন। আমিও এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁর গদ্যচ্ছন্দের বিষয় সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম।

গদ্যচ্ছন্দ প্রবর্তনের বহু আগে থেকেই কবির মনে গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে একটি সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চলছিল। গদ্যের শৈথিল্যকে দৃঢ়পিনদ্ধ রূপদান করা যায় কি না, সে চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বহুদিন থেকে সচেষ্ট ছিলেন। তাই তিনি অনিয়মিত হ্রস্ব-দীর্ঘের সমাবেশে বিচিত্র-পর্বের ছন্দ তৈরি করলেন—'বলাকা'র ছন্দ এর প্রমাণ। (অবশ্য মুক্তক ছন্দে অন্তঃমিল ঠিক আছে, ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ এবং Rhythm অক্ষুণ্ণ)।

'পুনশ্চ' গ্রন্থের ভূমিকায় গদ্য কবিতা রচনার ইচ্ছা সম্পর্কে কবির কৈফিয়ত আছে। "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।" ঐ ভূমিকাতেই আবার তিনি বলেছেন যে "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।"[৬]

এটা ঠিক যে নিরলংকার গদ্যভাষা কথাবার্তার মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের কাজ চালাবার ভাষা. এই ভাষা কবি-কল্পনার সৌন্দর্যে উন্নত

হলে তা কাব্যে স্থান পেতে পারে। কাব্যের আত্মাকে প্রকাশ করতে হলে ভাষাকে সুরেলা এবং দোলায়মান হতে হয়—তাই কাব্যে ছন্দের দরকার হয়, ছন্দের জাদুতে কাব্যের আবেগ-সঞ্চার সহজ হয়।

গদ্য কবিতা কিন্তু মিলহীন পয়ার নয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য কবিতা সৃষ্টি করেছেন—তা নিশ্চয়ই নয়। কাব্যের লালিত্য যখন গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, অথচ কাব্যিক সুষমা ও দীপ্তির এতটুকু অপচয় ঘটে না—তখন তাকে গদ্য-কবিতা বলা যেতে পারে। গদ্য কাব্যে ছন্দ তথা সুরের ঝংকার—যা অভাবিতপূর্ব মিলের আস্বাদনে মাধুর্যের সৃষ্টি করে—তা অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু গদ্যের রুক্ষতা বা পৌরুষদীপ্ত গাম্ভীর্য এবং অসংযম অনুপস্থিত থাকে—বরং শব্দ সংস্থাপন এমনই সুষমাযুক্ত হয়—যাতে গদ্যেরও একটা ছন্দের ছাঁচ পাঠক মনকে তৃপ্ত করে রাখে। গদ্যকে তখন প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ব্যবহার করতে হবে। নাচে যেমন গতিকে একেবারে সাধারণ বা ভঙ্গহীন করা চলে না, একটা বিশেষ কায়দার সঙ্গে নাচের সহযোগ যেমন অনিবার্য, তেমনিভাবে গদ্য কবিতাকে ছন্দের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে না বটে, কিন্তু সাধারণ ভাষা ব্যবহারের মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য তার বজায় থাকবে।

যে বক্তব্য সহজ সুরে ও লালিত ছন্দে বলা চলে না, যার জন্যে পরিমিত অথচ স্বচ্ছন্দ প্রকাশনার মাধ্যম দরকার—এমন কবিতা প্রকাশের স্বতন্ত্র ভাষার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—"গদ্য কথা-বার্তার ভাষা, কবিতার বক্তব্য তাতে বলবার জো নেই, ভাষার যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুর্য যোগায় গদ্যে তার অভাব. গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্বদা প্রচলিত নয়,—তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে—তার প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে। অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, যে ছন্দ প্রয়োগ করেছি—তাকে গদ্যবিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য,

সোনার পাথর বাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে, যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোনও ছন্দে বলতে পারতুম না।"[৭]

'পুনশ্চে'র নতুন ভাবকেও কবি পুরানো ছন্দস্পন্দনের মাধ্যমে বলতে পারতেন না। বক্তব্যের মেজাজ অনুযায়ী তিনি বাহন নির্মাণ করেন। 'পুনশ্চে'র জীবন-জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মচিন্তা সসজ্জ সলজ্জ ললিতমধুর ছন্দে বলা চলে না, তাই তিনি গদ্যরীতির কাছ ঘেঁষা অনবদ্য এক ছন্দ তৈরি করে নিলেন। বাক্যের অন্বয় গদ্যধর্মী নয়; কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া বা বিধেয়াংশের যোজনা গদ্যানুসারী নয়, আবার পদ্যের যে যতিস্থাপনা—তাও অনুপস্থিত, অথচ ছন্দের প্রচ্ছন্ন মসৃণ বেগ অনুপস্থিত নয়। এই গদ্যকাব্যে ধ্বনি কিন্তু বেশ স্পষ্ট হয়েই অভিব্যক্ত হয়। পর্বে পর্বে সাজানো কম্পনের মধ্যে অনতিস্ফুট ছন্দ-সৌন্দর্যের একটা মৃদু মধুর আলোর উদ্ভাস দেখা যায়, অথচ পদ্যের নিরূপিত বন্ধন নেই। 'পুনশ্চে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন—তাও এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'পরিশেষ' গ্রন্থ পরিচয়েও তিনি বেশ খানিকটা ওকালতি করে বলেছেন যে গদ্যের মাধ্যমে কাব্যের সঞ্চরণ অসম্ভব নয়। গদ্য-কাব্যের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং সেইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ আবার অন্যত্র বলেছেন—"প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ ধরা পড়ে—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যচ্ছন্দের মধ্যে আছে।"[৮]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে তিনি পদ্যের মতো

ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে না বসিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মাঝখানে স্থাপন করেছেন। 'লিপিকা' থেকেই এইরকম পদবিন্যাস আমরা দেখতে পাই। তাই লিপিকায় কবি গদ্যচ্ছন্দের অঙ্কুর বপন করেছেন বলা যায়। কিন্তু 'পুনশ্চ-পরিশেষ-শেষ সপ্তক-শ্যামলী' পর্বে কবি গদ্যের মধ্যে ছেদ ও গতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা সাধারণ গদ্যের উচ্চারণে সম-বিষম যাত্রীভেদ না করে যেমন গতি দিয়ে থাকি, সেই ভঙ্গিকেই কবি কলাকৌশলের দ্বারা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এইভাবে কবির মনোভাব অনুসারে যতি নিয়মিত হয়েছে বলে গদ্যচ্ছন্দের যতি সম্পর্কে কোনো ধরাবাধা নিয়ম করা চলে না।

গদ্যচ্ছন্দের ভাব ও বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে এই যাত্রী কখনো সোজা পথে ধীরে অগ্রসর হয়েছে, কখনো সম-বিষম ছোট বড় বিভিন্ন মাত্রার পর্বের পঙ্‌ক্তির আশ্রয়ে আন্দোলিত হয়েছে, আবার কখনো বা হলন্ত গুরু অক্ষর এবং আ, ঈ, উ প্রভৃতি স্বরকে দু-মাত্রার পর্যায়ে উন্নীত করে রসানুকূল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার ব্যবহার নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকেই কবির মনোভাব অনুযায়ী নূতন বাহনকে অভিনন্দন জানিয়েছে, আবার অনেকে বলেছেন যে দু-একটি আখ্যায়িকা জাতীয় কাব্যে [যেমন, 'প্রথমপূজা' কবিতায়, ভূমিকম্পের করাল বিপর্যয়ের ছবি গদ্যকাব্যে চমৎকার ফুটেছে।] গদ্যচ্ছন্দ সুন্দর হয়েছে, কিংবা মনের ক্ষণিক গম্ভীর উচ্ছ্বাস, চলতি মুহূর্তগুলি অর্ধ-সক্রিয় কল্পনার ওপর যে স্বল্পস্থায়ী আবেগ ও আবেদনের সৃষ্টি করে—সেই আবেগ ও আবেদনের মাধ্যম গদ্য কবিতার সুষ্ঠু রূপ। (এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে লেখা, স্মৃতি, পুকুরধারে সুন্দর, বাসা প্রভৃতি) উত্তেজিত ও প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত কল্পনার নিগূঢ় ঐক্য-সংহতি নেই, কবি যেন অলস-মন্থর গতিতে ভাব থেকে ভাবান্তরে যাচ্ছেন, তাই তিনি এই গদ্যচ্ছন্দের বাহন করেছেন। কিন্তু কবিতার সঙ্গে ছন্দের মিলন এত দীর্ঘকালের যে আমরা ওকে প্রায় নিত্য সম্বন্ধের পর্যায়ে ফেলতে

অভ্যস্ত। এর ব্যতিক্রম পাঠককে পীড়িত করতে পারে। এই প্রশ্নের বা আপত্তির জবাব পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

'পুনশ্চ' গ্রন্থের প্রথম কবিতা হলো 'কোপাই'। এই কবিতাটির বিশেষ প্রশংসা করে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মশাই বলেছেন যে এটি রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য কবিতা এবং এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে পরিগণিত হবার যোগ্য।[২] উচ্চকণ্ঠে 'কোপাই' কবিতাটির প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়, কিন্তু এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি বা অনবদ্য—এমন কথা না বললেও কোনো ক্ষতি হয় না। কবি সহজ সরসভাবে তাঁর মনের কথাকে অলঙ্কৃত করে প্রকাশ করেছেন, কোথাও জাঁকজমক নেই, আড়ম্বর নেই, ঘটা নেই, অথচ ভাষার ঐশ্বর্যের দ্যুতিরও অভাব ঘটে নি। কোপাই বর্ণনার মধ্যে কবি প্রকৃতিকে বর্ণনা করেছেন অনবদ্যভাবে, কোপাই-এর চারপাশের ছবি পাঠকের চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। এই কবিতাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কবি দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারের মাধ্যমে কোপাই বর্ণনার মাধুর্য বাড়িয়ে তুলেছেন। কবে তিনি পদ্মার বুকের ওপর বোটে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন--সেই স্মৃতির অনুষ্ঠান করছেন আজ এতদিন পরে।[৩] 'কোপাই'-এর গোড়ার অংশটা একেবারে পদ্মার বর্ণনা, আর কবির রোমন্থিত স্মৃতিমাত্র। কোপাই-এর আগে পদ্মার বর্ণনা করে কবি তাঁর জীবনে পদ্মার প্রভাব এবং পদ্মার প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথাটি স্মরণ করেছেন। পদ্মার অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বনিখিলের একাত্মতা, আর এখন কবি পরিবেশনির্ভর সাধারণ জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন।

কোপাই-এর বর্ণনা করতে গিয়ে কবি একে সম্পূর্ণ মানবিক চরিত্র দান করেছেন। ওর চলনবলন সবই একেবারে সাধারণ। 'ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা।' ওর নৃত্য গাঁয়ের অজ্ঞ মেয়ের আনাড়ী হাত-পা নাড়া। বর্ষায় ও মত্ত, মহুয়ামাতাল সাঁওতালী নারীর মতো, আর শীতে সে শীর্ণ, নৃত্যশেষে নটীর মতো ক্লান্ত। কবিতাটির বর্ণনা সুন্দর,

এবং এটি নিসর্গমূলক কবিতা, তবে ববীন্দ্রসাহিত্যে এক অনবদ্য এবং শ্রেষ্ঠ কবিতাব কয়েকটিব মধ্যে অন্যতম বলার পক্ষে যুক্তি কম।

'কোপাই' কবিতাটিব শেষেব দিকে কবি বলেছেন যে কোপাই কবিব ছন্দকে আপন সাথী কবে নিলে। কোপাই জনসাধাবণেব প্রাত্যহিক জীবনেব সুখদুঃখছোঁয়া নদী,—ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে তার সঙ্গে তাল ফেলে চলে, খড বোঝাই গরুব গাড়ি পাব হয়, কুমোব হাটে যায়—পিছনে চলে গাঁযেব কুকুবটা, এমন জনজীবনেব নদী কোপাই, কবিও আজ থেকে তাব কাব্যে বাস্তব জীবনেব ছবি আকবেন, জনসাধাবণেব দুঃখসুখেব কথা বলবেন। কোপাই যে তাঁব ছন্দকে সঙ্গী করে নিয়েছে ...

এবাব 'নাটক' কবিতা তপতী নাটক প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সালে রানী মহলানবিশেব কাছে একটি পত্র লেখেন, সেই পত্রেব বিষযবস্তুব সঙ্গে আলোচ্য 'নাটক' কবিতাব একটি বিস্ময়কব সাদৃশ্য রযেছে, যদিও এই 'নাটক' কবিতাটি ঐ চিঠিব তিন বছব পরে লেখা। এই কবিতাটিব বচনা-তারিখ হলো ১লা ভাদ্র ১৩৩৯।

এই কবিতাটিতে সেই 'তপতী' নাটকেব উল্লেখ থাকলেও কবি আসলে কাব্যেব ও গদ্যভঙ্গীব ভাষা নিয়ে তুলনামূলক মন্তব্য কবেছেন।

কবি লিখছেন 'তপতী' নাটকটি ভালো হযেছে এবং এই খববটি যে তিনি পত্রে শ্রীমতী নিমলকুমাবী মহলানবিশকে জানিযেছেন—তা এখনই তিনি কেটে দিতে চান না—যদিও তাতে কবিব 'বিনয' প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলছেন এক কালেব ভালোটা অন্যকালে ভালো বলে হযতো বিবেচিত হবে না। চিবকালেব সত্য নিযে কথা ওঠে না বলেই কবি এক নিশ্বাসে বলতে পাবেন—ভালো হয়েছে, তিনি লিখছেন—

> কত লিখেছি কতদিন,
>
> মনে মনে বলেছি 'খুব ভালো',
>
> আজ পবম শত্রুব নামে

পারতেম যদি সেগুলি চালাতে
খুশি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়ত হবে সেই দশা—

এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় কবি লিখছেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে—"যেদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রথম লিখেছিলাম সেদিন ওটা লিখে আনন্দে বিস্মিত হয়েছিলুম—আজ ওটাকে যদি কোনো নির্মল-নলিনী দেবীর নামে চালিয়ে দিতে পারতুম কিছুমাত্র দুঃখিত হতুম না, এমনকি অনেকটা আরাম পাওয়া যেত।"[১০] 'নাটক' কবিতার উল্লিখিত অংশটুকুর সঙ্গে এই পত্রাংশের আশ্চর্য মিল রয়েছে।

তারপর কবি নাটকের ভাষা প্রসঙ্গে গদ্য ও পদ্যের পার্থক্যটুকু গদ্য কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। আদিম অবস্থায় পৃথিবীর চার-ভাগই জল ছিল, চতুর্দিকে তার কলকল্লোলের ছন্দতরঙ্গ, পদ্য ঠিক এই রকমের সমুদ্র। সাহিত্যের আদিম যুগে তার একাধিপত্য। গদ্য এল অনেক পরে, বাঁধা ছন্দের বাইরে আসর জমালো। ডাঙার সৃষ্টি হলো। সুশ্রী কুশ্রী ভালো-মন্দ তার আঙ্গিনায় ঠেলাঠেলি করে এল।

গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।

নাটকের বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি এখানেও গদ্যরীতির হয়ে ওকালতি করেছেন। ফলে এই কবিতাটির মধ্যে বিষয়ের পারম্পর্য রক্ষার ব্যাপারে ঈষৎ অনবধান দেখা গেছে।

'নতুন কাল' কবিতাটিতে কবি একালের কথাকে নব বিন্যাসে নতুন ঢঙে সাজিয়েছেন। আজকের কথাকে গদ্যের বাণীবিন্যাসে কবি সাজালেন বটে কিন্তু পাঠক সম্প্রদায় কবির এই নতুনকালের কাব্যকে খুশী মনে অভ্যর্থনা জানাতে পারলো না, পাঠক কবির পুরাতন দিনের কবিতাতেই বেশী রস পেতে লাগলো। কালের বদল হয়, কিন্তু কাব্য-সত্যের বদল ঘটে না, কারণ কাব্য-সত্য চিরন্তন। তাই একালের পাঠকেরা সহজেই সেকালের কবিতার মধ্যে রস গ্রহণ করতে সমর্থ

হয়—এবং সেই জন্যে সেকালের কবিতার প্রতি আকৃষ্টও বেশী হয়। আরেকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—যদিও কবি সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি, তবুও আমার মনে হয় যে নতুনকালের কাব্য-রীতি সমালোচনার বেড়া ডিঙিয়ে স্থায়ী আসনের মর্যাদা পায় না. পক্ষান্তরে পুরাতন কালের কবিতার বিচারালয়ের ছাড়পত্র পায়—তাই পাঠক পুরাতন কালের কবিতাকেই বেশী খাতির করে। সেজন্যে কবি বলেছেন যে একালের পাঠক সহজেই সেকালের কবিতায় রস পায়।

কবি বলেছেন যে তিনি যে বিন্যাসের কাব্য রচনা করতেন—তার কাল বুঝি ফুরিয়ে এসেছে—হয়তো সেই কাব্যরীতিতে পুরাতন যুগের অনেকেই তৃপ্ত হয়েছেন, কেউ কেউ হয়তো তেমন তুষ্ট হন নি। কবি ব্যাপারীর মতো তাঁর পণ্যফসল বিকিয়ে বেড়িয়েছেন পুরাতন দিনে—কেউ কিনেছেন তাঁর ফসল, কেউ বা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেউ বা তাঁকে খাতির করেছেন, কেউ দেখিয়েছেন ঔদাসীন্য কবি বলেছেন—

কত লোক কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না সেও কত লোক—
সেকালের দিন হল সারা।

সেই পুরাতন কাল গত হলো। সময় যখন নিজের চিহ্ন রাখে না, তখন মানুষ কেন স্মৃতির ভারে ক্লিষ্ট হবে? দেনাপাওনা হাতে হাতে চুকিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের দিকেই জীবনকে কেন চালাই না? পিছনের জীবন থেকে ছুটি নিয়ে সামনে এগোনোই উচিত। পুরাতন শেষ হলেই তো নতুন যুগের শুরু। নতুন যুগ হলে কখনো পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে নেই, পুরাতনকে জবর দখল করার মূঢ় এবং ব্যর্থ প্রয়াস থেকে মুক্ত হতে হবে। কবি তাই নূতন কালের প্রথম আবির্ভাবেই পুরাতনের হিসাব চুকিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু নূতন কালও কিছু দাবি নিয়ে এসে হাজির—কবির কাছে। কবি নূতন কালকে অবহেলা করতে পারেন না। সেই নূতন কালের দাবি মেটাবার জন্যেই তাঁকে নতুন রীতিতে নতুন কথায় কাব্য রচনা করতে হলো। কবি স্পষ্টতঃই বললেন—

দরজার কাজ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই
তখন দেখি, তুমি যে আছ
একালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।

এখানে কবি নূতন কালকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন।

[কবির জীবনদেবতা বা বিচিত্ররূপিণী বা ঈশ্বরকে কবি এখানে 'তুমি' বলেন নি যদিও বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীর মুখে শুনেছি যে এই 'তুমি'র অর্থ হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক অথচ ব্যঞ্জনাময় জীবনদেবতা—এমন কি পরম কারুণিক ঈশ্বরকে পর্যন্ত টানা হয়েছে।]

এই নতুন কালকেই যে কবি 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন—তা পরের স্তবকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে,—যেখানে কবি বলছেন—

তাই ফিরে আসতে হল আর-একবার
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারই মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।

কবি ফিরে আসার কথা বোধ হয়—কাব্য রচনার প্রসঙ্গেই বলেছেন, একালের পাঠক পুরাতন দিনের কবিতাকেই ভালবেসেছে, কবি তাই পুরাতন ঢঙের কাব্য লেখার কথা মনে করেছেন। কিন্তু নতুন কালের জন্যে নতুনভাবে নববিন্যাসে লেখাতে ফিরে আসা নয়, বরং এগিয়ে যাওয়া। নতুন উপকরণ, নতুন গদ্যরীতি, নতুন জীবন-দর্শন—এই সব নবীনতার জন্যেই তিনি বলছেন শেষ জীবনে তিনি নতুন পালা শুরু করেছেন। এই নতুন কালের বাণীর অলংকারে কবির বাণীকে তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন—তাই তিনি বললেন, "আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে তোমাদের বাণীর অলংকারে।" এখানে "তোমাদের" যে নিঃসন্দেহে "একালের" অর্থসূচিত করেছে—তা বলাই বাহুল্য।

আবার যে বিরাট জনসমাজ এই সময় কবির মনোজগৎ অধিকার করেছিল, তাদের কথা ভেবেও কি কবি সহজ ভাষায়, তাদের বোধের আনুকূল্যে কাব্যভাষার বদল ঘটালেন না? অবশ্য এরকম অর্থকে

অনেকে দুরান্বয় বলবেন। তাই পুরানো কথায় ফিরে আসি।

কবি একালের তাগিদে নতুন কবিতা রচনা করেছেন বটে, কিন্তু সেই কবিতা পাঠকমহলে তেমন সমাদৃত হলো না—যেমন হয়েছে তাঁর পুরানো কালের কবিতা। কবিকে তবু পাঠক-বন্ধুর সন্ধানে নূতন কালের তাগিদে রচিত কবিতাগুলি রেখে যেতে হয়।

তাকে রেখে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়
পথিক বন্ধু, তোমারই কথা মনে ক'রে।

কবি নূতন কালের তাগিদে বর্তমানের জীবনধারার বাস্তবতাকে কখনো উপেক্ষা করতে পারেন নি, তাই পথিক-বন্ধুকে স্পষ্ট করে বলে গেলেন—যদিও নূতন কালের তাগিদে লেখা কবিতাগুলি পাঠকমহলে তেমন সমাদৃত হলো না—তবু কবি বর্তমান জীবনকে উপেক্ষা করেন নি এই সাক্ষ্য থাকলো একালের কবিতায়। কবি জানেন যে পুরাতন কালের রচিত কবিতাগুলির জন্যে পাঠকেরা তাঁকে বেশী করে খ্যাতি জানাচ্ছে, তাই কবি একালের লেখা কাব্যে বিশ্বাসের পু[illegible] খুঁজে পাচ্ছেন না মনে ভাবছেন—তার পাঠক কবির পুরাতন কালের মধ্যেই নিবিড় হয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চান। কবি তাই বললেন—

এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই।
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত যুগে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান হয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

বলাবাহুল্য, এখানে তুমি বলতে কবি পথিক-বন্ধু তথা পাঠককুলকে বোঝাচ্ছেন।

'খোয়াই' কবিতাটি একেবারে বাস্তব এবং স্বাভাবিক চিত্রধর্মী একটি কবিতা। শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে যে খোয়াই বয়ে গেছে—এই 'খোয়াই' কবিতাটি হচ্ছে সেই নদীকে নিয়ে। মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে খাল

তৈরি হয়—তাকেই লোকে খোয়াই বলে। শান্তিনিকেতন বীরভূমে. আর বীরভূম জেলার মাটি হলো লাল, তাই শান্তিনিকেতনের খোয়াই রাঙামাটির।

'কোপাই' কবিতাটি যেমন একেবারে কবির দেখা—শান্তিনিকেতনের নদী খোয়াইও তাই, এদিক থেকে এরা সগোত্র। কোপাই পদ্মার তুলনায় অনেকটা ঘরোয়া, অনেকটা মানুষ ঘেষা। খোয়াইও তাই একেবারে কাছের নদী। কিন্তু এই নদীর বর্ণনায় কবির কারুণ্যমাখা একটি সংবেদনশীলতা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নদীটির জীবন্ত বর্ণনা কবি দিয়েছেন. কল্পনার সামঞ্জস্য রসেরও ভিয়েন দেননি, শুধু অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক বর্ণনায় অল্প কথায় ঈষৎ সৌকর্য বিকীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ বর্ণনার মধ্যেই কবি একটি অনির্বচনীয় সুর খুঁজে পেয়েছেন, কবি নিজের মানসলোকের দিকে তাকাতে পেরেছেন। খোয়াই-এর সঙ্গে নিজের জীবনের ভাব ও কর্মকে তুলনা করেছেন।

খোয়াই-এর বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য এমন কিছু নেই। তবু প্রাকৃতিক চিত্র হিসেবে এই নদীটির বর্ণনা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

পশ্চিমে বাগান বন চষা ক্ষেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়,
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতাল পাড়া.
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘপথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।

খোয়াই-এর আশে পাশে দলছাড়া এককভাবে কিছু তালগাছ। লাল কাঁকরের অনেক স্তূপ, দূর থেকে মনে হয় যেন সেখানে ঢেউ জাগছে, কিন্তু এ যে জলের ঢেউ নয়—ক্ষয়ে যাওয়া পৃথিবীতে লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়। মাঝে মাঝে মর্চেধরা কালো মাটি—তা যেন ঠিক মহিষাসুরের মুণ্ড। বর্ষা ধারায় নদীর একটু চাঞ্চল্য জাগে, তখন তাকে খেলার নদী বলে মনে হয়।

খোয়াই-এ শরৎকালের গোধূলির বর্ণসমারোহের ছায়া জাগে, কবি সেই মহিমা দেখে তন্ময় হয়ে যান। তাঁর মনে পড়ে যায় হারনামারু জাহাজ থেকে দুর্লভ দিনাবসানে রোহিত সমুদ্রের তীরে এক অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখার কথা। ১৯২৪ সালের ২রা অক্টোবর তিনি এই মহিমান্বিত সূর্যাস্ত দেখেন। পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি বিস্তৃত-ভাবে এই সূর্যাস্তের কথা। বলেছেন ছিন্ন পত্রেব ৫২নং পত্রেও (২ আষাঢ় ১২৯৯) একটি সূর্যাস্তের কথা আছে।

কালবৈশাখীর ঝড়ের বর্ণনা খোয়াই-এর তীবে এবং গর্ভে—একেবারে অকৃত্রিম, কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। বালক কবি খোয়াই তীরে একাকী খেলা করতেন—সেই ভাবনা থেকে কবি তাঁর কাজের খেলার (খেলার কাজও বলা চলে!) কথা মনে করেছেন। ছোট বয়সে নুড়ির দুর্গ তৈরির মতোই তিনি খোয়াই অঞ্চলে আর একটা কাজ—বিশ্বভারতী রচনা করতে বসেছেন।

ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ

ছেলে বয়সের কাজ নুড়ির দুর্গ—কোনোটা থাকে কোনোটা থাকে না। কালের সঙ্গে যায় নষ্ট হয়ে। তেমনি কবির জীবনের কাজও কি থাকবে না? তখন শুধু উত্তরের হাওয়া বইবে, প্রকৃতিলোক অক্ষুণ্ণ থাকবে. পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জন রেখা।

রবীন্দ্রনাথ এই নীলাঞ্জন রেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন—কিন্তু তাঁর উত্তর-সুরী কোনো কবি কি এই বর্ণবিভঙ্গ দেখে মুগ্ধ হবেন—রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দৃষ্টি কি অন্য কবির পক্ষে সম্ভব? কবির জীবনাবসানে একটা যুগেরই বোধহয় সমাপ্তি ঘটবে।

'পত্র' কবিতায় পত্র বলতে কবি 'এক-বই-ভরা কবিতা'-কেই বুঝিয়েছেন। এখনকার কবি কিছু কবিতার সমষ্টি নিয়ে একটি বই করেন—এবং প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকের কাছে তা পাঠান। পত্রে যে পত্র লেখক

এবং প্রাপক একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকেন,—সাধারণ পত্র সম্পর্কে গদ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্তির একটু উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয় ভেবেই উল্লেখ করছি—কবিতার ক্ষেত্রেও অর্থাৎ বর্তমানকালে কবিকেও সরে থাকতে হয় পাঠককুল থেকে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ যেটুকু—সে ওই বই-ভরা কাব্য পত্রের মাধ্যমে। এতে পত্রের ব্যঞ্জনা থাকে না, দায়সারা কাজের কথা থাকে। পত্র যেমন চেনা জানা ঘটনার মধ্যে অব্যক্ত অবসরের ভরাট করিয়ে দেয়, কবিতার কাজও তেমনি। কবিতা কাজের কথায় সম্পৃক্ত নয়, কর্মাতিরিক্ত এক অপূর্ব রসের ভিয়েনে তৈরি, অনির্বচনীয় লোকের দিকে মনকে আকৃষ্ট করার ধর্মে সে দীক্ষিত।

কবি অতি সুন্দর মননধর্মী এক উপমার মাধ্যমে এই সত্যটি বুঝিয়ে দিয়েছেন—নীল আকাশের সমধর্মিত্ব নিয়ে কবিতা মানুষের মনকে অনির্বচনীয় লোকে উন্নীত করতে এল, কিন্তু কাব্য আকাশের স্থান দখল করতে পারলো না। কবি উপমা দিলেন—

নিশীথরাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে.
বিশ্ববেনের দোকানে

কবিতা আজ মুদ্রিত হয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশনযোগ্য। কবির আবেগমাখা কণ্ঠে আবৃত্ত নয়। কবির কাছে বসে কবির মেজাজের স্বীকরণের মাধ্যমে কবির হৃদয়ের উত্তপ্ত সান্নিধ্যের ছোঁয়ায় পাঠক কাব্যাতিরিক্ত কোনো কিছু পান না, বরং কবির আবেগ ও কাব্যের স্বরূপ সঠিক বোঝা যায় না। এতে হয়তো কবি ও পাঠক—উভয়েরই ক্ষতি। কিন্তু কবি কালিদাসের এদিক থেকে পরম সৌভাগ্য ছিল। বিক্রমাদিত্যের সভায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন, শ্রোতারা তাঁর কণ্ঠে তাঁর কবিতা শুনতেন; কর্মব্যস্ততার অভিশাপে তখনকার শ্রোতাদের আজকের মতো এমন নিষ্ঠুর ছোটাছুটির মধ্যে দিন কাটাতে হতো না, তাই কবির স্বকণ্ঠ নিঃসৃত কাব্য রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ

করার সুযোগ তাদের ঘটতো।

আজকের কবির আক্ষেপ—কানে শোনার কবিতাকে চোখে দেখার শিকল পরানো হয়েছে।

কবির স্বকণ্ঠে কবিতা শুনলে কবির ব্যক্তিত্ব এবং নৈকট্যের স্পর্শ পাওয়া যায়, কবিও শ্রোতার উত্তপ্ত উপভোগের আমেজটুকু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারেন। পরোক্ষভাবে যৎকিঞ্চিৎ অর্থমূল্য দিয়ে একটি কবিতার বই কিনেই পাঠকের দায় সারা হয়, কবিরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

'পুকুর-ধারে' কবিতাটি ঠিক স্মৃতিমূলক বলা যায় না, বরং কবির একটি মুড্ তথা আবেগকে কেন্দ্র করেই এটি অভিব্যক্ত হয়েছে বলা চলে। দোতলার জানলা থেকে পুকুরের একটি কোণা চোখে পড়ে, ভাদ্র-মাসে জলপূর্ণ, পুকুরের তীর সবুজ রেশমের আভা—গাছপালা, খেত ফসল, গাছপালার মধ্যে বাড়ি, বাড়ির ছাদে শাড়ি ঝুলছে, ঘাটের পৈঠায় ছিপ ফেলে রোগা মানুষটি বসে আছে। বিকেলে পুকুরের রঙ বদলায়, বৃষ্টি ধোওয়া আকাশে বেলাশেষের শ্রান্ত আলো জাগে, ধারে হাওয়া বয়, পুকুরের জল বাতাবিলেবুর পাতার ঝিলমিল করে। কবির মন অতীতচারী হয়। অতীত দিনে কোন এক নারীর ছবি মনে জাগে—স্নেহে প্রেমে করুণায় মাখানো সেই নারী।

আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।

সে স্নিগ্ধ, মধুর, নয়নাভিরাম। সে আঙিনায় আসন বিছিয়ে দেয়, আঁচল দিয়ে ধুলো মোছায়, আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে। তারপর কবি তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসেন,—সে ভালো করে কিছু বলতে পারে না, শুধু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি গভীর তন্ময়তার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে; তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন বলেই এমন সহজে

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আত্মস্থ করেছেন।

'অপরাধী' কবিতাটিতে কাহিনী যেটুকু আছে—তার চেয়ে একটি ভালবাসাভাজন দুষ্টু চরিত্রের বিন্যাস ঢের বেশী আছে। তিন্নু নামে একটি দুষ্টু অথচ সবল ছেলের চরিত্র বর্ণনাই এই কবিতাটির আসল বক্তব্য। তিন্নু দুষ্টু ছেলে, অথচ তাকে ভালবাসতে হয়—তার দুষ্টুমি অপরাধ করবার জন্যে নয়, এমনি কিশোর বয়সের চাঞ্চল্যের জন্যেই।

মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে--যারা শুধু জাত দুষ্টু নয়, পরিবেশচপল এবং প্রশ্রয়যোগ্য অপরাধের দ্বারা লালিত। তারা ভালও করে মন্দও করে, তারা অকারণে লোকের নিন্দেও করে, আবার বিনা কারণেই লোকের গুণকীর্তন করে। তিন্নু ছেলেটি এই ধরনের, সে দুষ্টু, কিন্তু দোষী নয়। সে নামেও মন্দ, কিন্তু বসে মন্দ নয়। তার দোষ স্তূপে যত বেশী ভাবে তত বেশী নয়।

সবাকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়—
যারা নিন্দে করে তারা মন্দ হবে বলে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে বলে।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে।
তারা নিন্দের নীহারিকা—
ও হল নিন্দের তারা,
এর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।

সুতরাং তিন্নুকে ঠিক নিন্দুক স্বভাবের বলা যায় না। তিন্নু কিছু না ভেবেই অপকার করে, কিন্তু উপকার করে অনায়াসে। ক্লাসে পণ্ডিত মশায়কে ঠকিয়েছে অন্য ছেলে, সকলের সঙ্গে সে-ও হেসেছে, কিন্তু হেড্‌মাস্টার শাসন করেছেন তাকে। তিন্নুকে দোষী বা ঐ জাতীয় বিশেষণে ভূষিত করা যেতে পারে কিন্তু সে অবশ্যই স্নেহযোগ্য, প্রীতি-ভাজন। তার দুষ্টুমির মধ্যে লক্ষ্য করলে মিষ্টতা, কিছুটা বা সরসতারও পরিচয় পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি যে এটি চরিত্র-বিন্যাসমূলক কবিতা, এখানে ছোট

গল্পের কোনো চমক নেই।

'ফাঁক' কবিতাটি স্মরণমূলক। এই কবিতাতেও রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরের দ্যোতনা খোঁজা চলে, কিন্তু সেই সুরের ব্যঞ্জনা ধরতে না পারলেও এটি শুধু খণ্ড স্মৃতি কবিতা হিসেবেও আস্বাদ্য। জীবনে কর্তব্য আছে, জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বয়স এবং অবস্থানুযায়ী আমাদের সকলেরই নানা কর্তব্য। শৈশবে অধ্যয়নের কর্তব্য, গুরুজনের প্রতি মাননীয় আচরণের কর্তব্য, সমাজজীবনের প্রতি আচরণীয় কর্তব্য - ইত্যাকার বিবিধ কর্তব্য বিভিন্ন সময় জীবনভোর চলতে থাকে। তবু ঐ সব কর্তব্য ফাঁকি দিয়ে কিংবা কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়ে মাঝে মাঝে কর্তব্যপালন থেকে ছুটি নিই,—এই যে ছুটি, এই যে অবকাশ, এই যে একটানা করণীয় পালনীয় আচরণীয় থেকে বিরত-হওয়া অবসর— একেই কবি 'ফাঁক' বলে অভিহিত করেছেন।

কবির শৈশব-জীবনে কবিকে বহু নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছে; বহু রকমের রুটিন মেনে চলতে হয়েছে। তারই মধ্যে হঠাৎ কখন অপ্রত্যাশিতভাবে হয়তো একটি কর্তব্য থেকে ছুটি পাওয়া গেল, ফাঁক জুটলো একটু—হয়তো স্কুল যেতে হলো না, হঠাৎ খানিকটা অবসর এল,—কর্তব্যসময়ের মধ্যে ফাঁক পড়লো। কবির আজ সেই সব কথা মনে পড়ছে। শৈশবে কবির এই ফাঁক ছিল বড্ড বেশী, কর্তব্যের কঠোর চোখরাঙানিকে তিনি ততটা মর্যাদা দেন নি, নিজের অবসরকে, ফাঁককে খেয়ালখুশিতে ভরিয়ে তুলেছেন।

বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার কালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।

অর্থাৎ কর্মজীবনে কবির কর্তব্যবোধে ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না।

আজ বৃদ্ধ বয়সে কবি কর্তব্যের কঠোরতা পার করেছেন। এখন প্রাত্যহিক কাজকর্ম থেকে একটু ছেদ, কর্তব্যের শাসন থেকে একটু মুক্তি প্রয়োজন। পাছে কবির ভুল হয় কোনো কাজ সারতে, তাই কি বন্ধু কি সেক্রেটারী—তাঁর কাছে কাজের ফর্দ হাজির করেন। অথচ প্রকৃতির আহ্বানে মন উতলা হয়—মন একটু ফাঁক খোঁজে।

এখানে একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলে রাখা দরকার। ফাঁক আর বিশ্রাম এক নয়, বিশ্রাম হচ্ছে আবার কাজে যোগ দেবার জন্যে দম নেবার ব্যাপার, আর ফাঁক হচ্ছে নিরাসক্ত কর্মবিরতির বিলাস ভোগ করা, কিছু না করার একটা আরাম আর কি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এই ফাঁক ভোগ করার উপায় নেই, নানা জন নানা কাজের বায়না নিয়ে আসে। অথচ প্রকৃতিতে গ্রীষ্ম আসে, বসন্ত আসে—সেখানে কাজের তাড়া দেখলে কবি বলে ওঠেন—'ফাঁক বিছিয়ে রাখো'। বসন্তে ফুল ফোটে, টগর গন্ধরাজের অযুবস্তু উল্লাস জাগে।

কোকিল ডেকে ডেকে সারা,
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে,
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ করে।

কবি নিজের জীবনের কর্মেভরা দিনগুলির কথা মনে করছেন, সেখানে অনেক কথা, অনেক দুঃখ। তবু তার ফাঁকের ভেতর দিয়েই রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে নতুন বসন্তের হাওয়া আসে। কবির মন ব্যথিত হয়। কেমন যেন বিরহ-বেদনার বিষণ্ণতায় আতুর হন তিনি। রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর হলো বিরহ-ভাবুকতা, এখানে কি সেই বিরহাশ্রয়ী কবি-মন উদ্বেল হয়ে উঠলো? এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে এখানে রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূলসুরের ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়েছে। বসন্তের স্পর্শে তাঁর

মনে বিষণ্ন স্মৃতি, তপ্ত মাঠের ধারে কাঁঠালতলার ঘন ছায়া আরামপ্রদ হয় নি। কবির মনে পড়ছে—অতীতকালের সেই ছেলেটা (বালক-কবি স্বয়ং?) ইস্কুল পালিয়ে হাঁসের বাচ্চা বুকে চেপে ধরে খেলা করছে। নতুন বধূর চিঠি লেখার কথাও তাঁর মনে পড়ছে। (এই বধূও কি কবি-পত্নী?) কবি এই বৃদ্ধ বয়সে কর্তব্য-শাসন থেকে মুক্ত হয়ে যে ফাঁক পেলেন—সেই ফাঁক তিনি অতীত স্মৃতি রোমন্থনেই কাটালেন, পুরাতন সুরই বেজে উঠলো বিষণ্নতার বেশ জানিয়ে, কিন্তু নতুন দ্যোতনা নবীন কোনো ভাবলোকে তার বিচরণ ঘটলো না।

'বাসা' কবিতাটি চিত্রধর্মিতার এক সুন্দর নিদর্শন। 'পুনশ্চে'র কবিতাগুলি লেখার সময় কবির মন চিত্রসৃষ্টির দিকেও আকৃষ্ট ছিল, তাই যেমন তুলিতে তেমনই শব্দের রেখায় ছবি আঁকার প্রবণতা দেখা যাবে। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কবির ইচ্ছা নতুন একটি বাড়ি তৈরি করেন। নতুন বাড়ি তৈরির কল্পনা তাঁর একটি বিশেষ শখ। আর তার জীবনের বিবিধ উপকরণ থেকে আমাদের জানতে বাকী নেই যে তিনি পাহাড়ের চেয়ে নদীকে বেশী ভালবাসতেন। নদীর ধারেই তাঁর থাকতে বেশী ইচ্ছা। তাঁর রামগড় পাহাড়ের বাড়ি বোধহয় এইজন্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়। নদীতীরে তাঁর একটি সুন্দর বাড়ি থাকবে—এমন এক রঙীন কল্পনা তিনি মনে এঁকে রেখেছিলেন।

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে :—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।

তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা ;—
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা ।[১১]

প্রতিমা ঠাকুরের কথায়ও এর সায় মিলবে—"বাবামশাই পাহাড় পছন্দ করতেন না, নদীর ধারই তাঁর ছিল প্রিয়, বলতেন, নদীর একটি বিস্তীর্ণ গতিশীলতা আছে, পাহাড়ের আবদ্ধ সীমার মধ্যে মনকে সংকীর্ণ করে রাখা, তাই পাহাড়ে বেশীদিন থাকতে ভালো লাগে না। বহুকাল আগে রামগড়ে তিনি একটি শৈলাবাস তৈরি করেন। সেখানকার বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'হৈমন্তী'—তাঁর 'হৈমন্তী' গল্প ঐ পাহাড়ের বাড়িতে লেখা। তিনি সব-সময় একটি কল্পিত বাসভবন মনে-মনে গ'ড়ে তুলতেন, তার সঙ্গে বাস্তব-জগতের মিল হোত না কোনোদিন, তখন তিনি আবার গড়তেন নতুন বাসার কল্পনা।"

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে কবি একটি বাসা নির্মাণের বাসনা জানিয়েছেন, কল্পনায় সেই বাসার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এই বাসা বাঁধা হয় নি। পরিকল্পনা কল্পনাতেই অবসিত, বাস্তবরূপে তার আবির্ভাব ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ময়ূরাক্ষীতীরে বাসা নির্মাণের ব্যবস্থা করা এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু বাসা নির্মিত হয় নি। 'বাসা' কবিতাটির মধ্যে তাই কবির ইচ্ছাকে নেহাত কাব্যিক কল্পনা বলে ভাবা অসংগত নয়। কবি নদীতীরে প্রশান্তিতে ভরা অমন পরিচ্ছন্ন বাসার কল্পনাই করতে চেয়েছেন মাত্র, সত্যিকার বাসা চাননি—এমন মনে করাও যেতে পারে। ময়ূরাক্ষীতীরে বাসা বেঁধে কিছুকাল বাস করার পর কবির মন আবার নতুন কোনো নদীতীরে নবতর কোনো বাসার খোঁজে ব্যাকুলতা বোধ করতো, তাই 'বাসা' তাঁর কাছে কল্পনার বস্তু বলেই মনে হয়।

কবিতাটির চিত্রধর্মিত্বে রয়েছে বাস্তব রস। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কবির

বাসা সেইখানে—যেখানে শালবন আব মহুয়া মেলামেশা করে রয়েছে, কবির জানালায় ওদের ঝবা পাতা উড়ে আসে। পুবেব দিকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছটা সকালে দেয়ালে চোরাই ছায়া ফেলে, নদীব ধার দিয়ে রাঙা মাটিব পথ, কুড়চিব ফুল ঝরে পড়ে পথে, বাংলাবিলেবু-ফুলেব গন্ধ ভাসে বাতাসে। সজনে ফুলেব ঝুবি দোলে হাওযায়, চামেলি লতিয়ে ওঠে বেড়াব গায়ে।

নদীর ঘাটেব বর্ণনাতেও অনুপম একটি ছবি। নদীব স্বচ্ছজলে যে বাজহাঁস ভাসে, তীরে যে পাটল বঙের গাইগোরু আব তাব মিশোল রঙেব বাছুব চবে বেড়ায়—তাবও ছবি দেখতে পাই।

ঘরের মেঝেব জাজিমটা পর্যন্ত বাদ পড়েনি, এক প্রতিবেশিনীব কথাও আছে। বাড়িব পিছন দিকটাতে শাক-সবজিব ক্ষেত। নদীব ওপাবে রাস্তা, বাস্তা ছাড়িযে ঘন বন. সেদিক থেকে শোনা যায সাঁওতালেব বাশি আব শীতকালে সেখানে বেদেবা বাসা বেঁধে থাকে।

এব পবেই কবিব ঘোষণা :

এ বাসা আমাব হয নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূবাক্ষী নদী দেখিও নি কোনোদিন।
ওব নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখেব উপবে—
মনে হয, যেন ঘননীল মায়াব অঞ্জন
লাগে চোখেব পাতায।
আর মনে হয,
আমাব মন বসবে না আব-কোথাও
সব-কিছু থেকে ছুটি নিযে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূবাক্ষী নদীব ধাবে।

১৯৩০ সালে জার্মান থেকে কবি পত্র লেখেন প্রতিমা ঠাকুবকে,—সে পত্রে তিনি ময়ূরাক্ষী নদীব ধাবে. শালবনেব ছায়ায়—খোলা জানালাব

কাছে একটি কল্পিত গৃহের স্বপ্ন এঁকেছেন। সেই পত্রে কবির আকাঙ্ক্ষা যেমন করে প্রকাশিত হয়েছে—'বাসা' কবিতাটি অবিকল বাসনারই কাব্যরূপ। 'নির্বাণ' গ্রন্থেও এই পত্রটির প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখিত হয়েছে—"পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'বাসা' কবিতাটি এই চিঠিখানারই রূপান্তর।[১৩]

'পুনশ্চে'র যুগেই কবি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে ভ্রমণ পিপাসু চাতকের মতো তিনি দূর দেশের সৌন্দর্য-বারির আশায় ছুটেছেন, কিন্তু ঘরের কাছে দু পা ফেলে বের হয়ে চোখ মেলে শুধু একটি ধানের শিষের ওপর একটি শিশিরবিন্দু দেখা হয় নি। অটোগ্রাফের খাতায় সামান্য একটি কবিতিকায় (ছোট্ট কবিতার অর্থে কবি শব্দ-সাদৃশ্যের জোরে 'কবিতিকা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন) যে এই জাতীয় আক্ষেপ করেছেন—তা নয়। এই সময় তিনি কাছের মানুষ এবং পরিবেশ সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশী মনোযোগী হয়েছেন। তাই প্রমত্তা পদ্মার রোমান্টিক সৌন্দর্য অপেক্ষা রুক্ষগৈরিক কোপাইয়ের বাস্তব রূপটি কবির কাছে বেশী আকর্ষণীয় বোধ হয়েছে। সৌন্দর্যের খেই ধরে কোনো অনির্দেশ্য রূপলোকে তিনি যাত্রা করেন নি—আগের মতো।

'দেখা' কবিতায় কবি অলস মুহূর্তে দেখেছেন—একটি দৃশ্য, তাকে গেঁথে রেখেছেন। কবি প্রতি মুহূর্তে দরকারী-অদরকারী—কত দৃশ্যই না দেখেন। কবি এই সব দৃশ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে কয়েকটিকে তাঁর কাব্যে স্থান দেন। সাধারণ মানুষও তাই করে, অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য তার মনেই থাকে না, জীবনের পথ চলতে কত মুহূর্তে-ই না হারিয়ে যায়। কবির কাছে ঠিক তেমনটি হয় না, কবি অনেক মুহূর্তকে, অনেক দৃশ্যকে মনে রেখে দেন।

বর্ষণক্লান্ত পরিষ্কার শ্রাবণ আকাশে অনাহূত অতিথির মতো রোদ দেখা দিয়েছে। সেগুন গাছে মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে আলো পড়লো, চমকে উঠলো বনের ছায়া। বিকেলে আবার আকাশ জুড়ে এল মেঘ —মোটা কালো মেঘ, ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন। বাঁধের জল

হলো কালো, বটতলায় থমথমে অন্ধকার নামলো। বৃষ্টি এল।

বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে

ছেলে মানুষের মতো ,

ধৈর্য থাকে না তালের পাতায়, বাঁশের ডালে।

একটু পরেই পালা হল শেষ,

আকাশ নিকিয়ে গেল কে।

কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগ শয্যা ছেড়ে

ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

চলতি পথের এই টুকরো দেখার দৃশ্যগুলিকে কবি অনির্বচনীয় করে তুলতে চান না, টুকরো দৃশ্যও যে কাব্যের বিষয় হতে পারে, রসের দিক থেকে আস্বাদ্য হতে পারে-তাই তিনি করবেন। কবি এখানে টুকরো মুহূর্তকে টুকরো পটভূমিতেই দেখতে চেয়েছেন, অসীমের রহস্য উদ্ঘাটনের সহকারী হিসেবে বিচার করেন নি, তাই এই টুকরো দৃশ্য-কেন্দ্রিক কবিতাকে কুঁড়েমির সৃষ্টি বলেছেন।

'সুন্দর' আগের 'দেখা' কবিতার মেজাজেই লেখা বটে, কিন্তু কবি এখানে রোমান্টিক আমেজে আত্মহারা হয়েছেন। 'পুনশ্চে' তিনি সহজ হতে চেয়েছেন গদ্য কবিতা লিখে, সাধারণ মানুষ যাতে অতি সহজে তাঁর কাব্যে প্রবেশ করতে পারে--সেই জন্যে তিনি বিন্যাসকে বদলেছেন— অন্তত গদ্য কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে সকলেই একবার এরকম উক্তি করেছেন, এবং আমরা 'পুনশ্চে'র আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলেছি যে এখানে কবির ভাষা-বিন্যাস এমনই আশ্চর্য কারুকার্যমণ্ডিত যে এর সৌন্দর্য সাধারণ মানুষ বুঝবে না, তাই এই মাধ্যমটি সাধারণের উপযোগী বলে অনেক সমালোচক খুব উচ্ছ্বসিত হলেও আমি সন্দেহ করেছি যে—গদ্যকাব্যের এই অভূতপূর্ব বিন্যাসের জন্যেই সাধারণ মানুষ 'পুনশ্চ' গ্রন্থটি থেকে তেমন করে রসগ্রহণে সক্ষম হবে না। আরো অনেক কবিতার মতো 'সুন্দর' কবিতাটি এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

একটি অলস দিনে কবি প্রকৃতির একটি ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।

আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ ;

মাঝখানেব ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।

অবকাশের মধুতে ভরা এই মধ্যাহ্নটি কবির অনুভূতিলোকে একটি সাড়া জাগিয়ে তুলেছে—কবি এই মধ্যাহ্নের ছবিটি উপলব্ধি করছেন—সুন্দর লাগছে তাঁর, সম্মোহিত হচ্ছেন। একে ধরা-ছোঁয়া যায় না ; এই দিনকে দূরকালের আরেকটা দিনের মতো মনে হচ্ছে। যা সুন্দর, যা সুখের—তাকে বর্তমানে ভালো লাগলেও অতীতের সামগ্রী বলে কবি তাকে মনে করেন। তাই এই সুন্দর দিনটিকে বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে যাওয়া দিন বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানের যা-কিছু ভালো—তা সবই অতীতের বলে মনে হয়। এমন কি, বর্তমানের প্রেয়সীকে মনে হয় সে যেন সুদূর অতীতকালের প্রিয়া, জন্মান্তরের জানা। তেমনি আজকের এই সুন্দর দিনটিও কোন্ বিস্মৃত অতীতের সম্পদ, এর মাধুরীকে মনে হয়—আছে তবু নেই। অর্থাৎ এ দিন প্রয়োজনের গণ্ডীতে বাঁধা নেই, আবার স্বপ্নময় রোমান্টিক চেতনায়ও এর স্থান নেই। 'সুন্দর' কবিতা প্রসঙ্গে 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ছত্রিশ সংখ্যক পত্র অবশ্য পঠনীয়।

'শেষদান' কবিতাটিকে নিছক বর্ণনামূলক না ধরে রূপক হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ছেলেদের খেলার মাঠের একধারে পৃথিবীর শ্যামল এলাকার বাইরে শুকনো গরীব ধুলোর মধ্যে একটি কাঞ্চন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেটি যেমন রুক্ষ, তেমনিই রিক্ত। সেবার যখন বসন্ত এল বনে বনে, উচ্ছ্বসিত সহজ কোলাহলের মধ্যে ওর মনেও জাগলো চাঞ্চল্য, কাঞ্চন গাছে ফুল ফুটলো, ফিকে বেগুনি ফুল, যতই তার ফুল ঝরে, ততই ফের ফোটে, সে হাতে রাখলো না কিছুই। তার সব দান এক বসন্তে সে উজাড় করে দিলে। তারপরে সে এই ধূসর ধূলির ঔদাসীন্যের কাছে বিদায় নিল চিরদিনের মতো।

কাঞ্চন গাছের শেষবারের মতো ফুল ফোটানো ও ঝরানো, নিজেকে

উজাড় করে দেওয়া এবং বিস্মৃতির মধ্যে দিয়ে অবলুপ্ত হওয়ার কথায় কি আমাদের কবির শেষ দানের কথা মনে পড়ে না? কাঞ্চন গাছের শেষদানের মতো কবির শেষ ফসলের কথাও পাঠকের মনে থাকবে না, বিশেষ করে কবির এই শেষ দান—গদ্য কবিতার এই বিন্যাস—তাঁর শেষ জীবনের ফসল—তিনি উজাড় করে হৃদয়কে যে ব্যক্ত করে যাচ্ছেন—পাঠক কি তা গ্রহণ করবে না? না, তাঁকে পাঠকের চরম ঔদাসীন্যের মাঝখানে বিদায় নিতে হবে?

'কোমলগান্ধার' কবিতাটিও একটি মেয়ের জীবনবেদনার রূপায়ণ, কিন্তু এখানে কবি স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, ফলে কাব্য-ব্যাখ্যাতাদের অনেকের মনেই অনেক রকম সন্দেহ জেগেছে। এমন কি কবিতাটির মধ্যে কবির আত্মদর্শনের আভাস পর্যন্ত কল্পিত হয়েছে, কবি তাঁর নিজের অন্তর বেদনাকেই বুঝি কোমলগান্ধার বলেছেন, এমন ইঙ্গিতও সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ দিয়েছেন। আমি কিন্তু ওদিকের পথ মাড়াই নি। 'কোমল গান্ধার' কবিতাটির নামকরণের প্রতি নজর দিলেই কবির কাব্যভাবনা বা কাব্যবস্তুর স্বরূপ বোঝা সহজ হয়ে আসবে। কোমল গান্ধার সংগীত জগতের কথা। ভৈরবী রাগিণীর মধ্যে চারটে কোমল স্বর এবং তিনটে মাত্র শুদ্ধ স্বর থাকে, ঐ চারটে কোমল স্বরের একটি হলো গান্ধার। বরং সংক্ষেপে এই বলা যায় যে ভৈরবী রাগিণীর সংবাদী স্বর হলো কোমল গান্ধার। এই রাগিণীর রূপ হলো কারুণ্য, কোমলতা মাখা এবং গান্ধার স্বর এই রূপকে ফুটিয়ে তুলতে খুব কার্যকরী হয়।

'কোমল গান্ধার' নামের কবিতার মধ্যেও আমরা একটি কোমল অথচ করুণ, স্নিগ্ধ অথচ ঔদাস্যেভরা একটি নারীমূর্তির পরিচয় পাই। সাধারণ স্তরেরই নারী, নিজের প্রাত্যহিক জগতের কাজে কর্মে সে ব্যস্ত; নিজের জীবনানুভূতির সৌরভেই সে মশগুল হয়ে থাকে। তবু তার জীবন যেন ভৈরবী রাগিণীর করুণ ধ্বনিতরঙ্গের মতো, তবু তার চলনবলন সঞ্চরণে একটি করুণ কোমল রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে রূপের দিকে তাকালে

কবির ভৈরবী রাগিণীর শান্ত অথচ করুণ সুরমূর্ছনা মনে পড়ে। কবি তাই এই মেয়েটির নাম দিয়েছেন—কোমলগান্ধার। সাধারণ জীবনের মেয়ের প্রতি কবির দরদ তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে যেমনটি ধরা পড়েছে, তেমনটি আগে এমন করে দেখা যায় নি ; তাই এই কবিতাটিতে কবির আত্মদর্শনের স্বরূপ ধরা পড়েছে বলা যায় না।

যে মেয়েটিকে দেখে কবি কারুণ্যে ও মমতায় বিগলিত হয়েছেন—সেই মেয়েটি কিন্তু নিজের করুণ কোমল রূপের পরিচয় জানে না, তাই তাকে কবি যে কোমলগান্ধার নামে অভিহিত করেছেন—তা নিয়েও তার মনোব্যথা নেই। নিজেকে সে নিজে জানে না বটে, তবু কারুণ্যে তার মন ভরা, ব্যথায় তার মনে টান পড়ে, চোখ আসে ছলছলিয়ে,—

গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।
চলায় বসায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কে লাগায় চোখের জলের মিড়।

'বিচ্ছেদ' কবিতাটি তত্ত্বপ্রধান। ভাদ্রমাসের কোনো বর্ষার দিনে কবির বিরহী মনে মেঘদূতের কথা জাগতে পারে, তাই তিনি বিচ্ছেদ ও বিরহের কথাকে কাব্যে রূপদান করেছেন। বিচ্ছেদ আর বিরহ ঠিক এক জিনিস নয়, বিরহে মিলনের আনন্দ লুকিয়ে থাকে, বিচ্ছেদে দুঃখেরই প্রাধান্য।

আজকের বাদলার দিনকে কবি মেঘদূতের দিন বলছেন না, বৃষ্টির দিনে মন যদি অভিসারী না হয়, প্রিয়মিলনে উৎসুক না হয়—তবে বাদলার দিনকে মেঘদূতের দিন বলা যাবে কি করে? নিশ্চল জড়ের মতোই পড়ে

থাকতে হয়, বিচ্ছেদ বয়ে আনে বেদনা। কিন্তু কবি যেদিন মেঘদূত লিখেছিলেন—সেদিন বৃষ্টি চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়েছিল, নীলপাহাড়ের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, ঝড় বইছিল উদ্দাম বেগে। মেঘ বিরহের দৌত্য করতে ছুটেছিল, বিরহে ব্যথার কোনো ছাপ ছিল না, সেদিন নদনদী, আকাশ, অরণ্য-সব কিছুই চঞ্চল ছিল, মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী দুলে উঠেছিল সর্বত্র। যক্ষ যতদিন যক্ষপ্রিয়ার কাছে ছিল—ততদিন জগৎ ছিল বাইরে, মিলন নিবিড় ও সম্পূর্ণ হলে বিশ্ব-সংসার থেকে বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু যখন বিরহ আসে, বিচ্ছেদ ঘটে, তখন অভিসার চলে—বাঁধনছেঁড়া দুঃখ নদী গিরি অরণ্যের ওপর দিয়ে ছুটে চলে। অপূর্ণ ছোটে পূর্ণের দিকে।

এমনকি যে পরিপূর্ণ—তাকেও স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করতে হয়, —সে তাকে মালা দেবে—তার জন্যে, নচেৎ সে যে একাকী হয়েই থাকবে। তাই অভিসারিকারই জয়-জয়কার, সেই জন্যে—সে যে আনন্দে বাধা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলে। পূর্ণ যে—সে বাঁশিতে ডাকে, আর অভিসারিকা সেই ডাক শুনে ছুটে চলে, একের সুর, অন্যের গতিচ্ছন্দ—একই একতালে মিলে যায়।

বাঁশিতে আহ্বান আর অভিসারিকার চলা,
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

এই কবিতাটি যে তত্ত্বপ্রধান—সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রকারান্তরে অন্যত্র স্বীকার করেছেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে এই কবিতাটির সরল ও বিস্তৃত গদ্যরূপ আমরা দেখতে পাবো—এবং কবি সেখানে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন এবং বুঝিয়েও দিয়েছেন যে—'এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই।'[৭] এই প্রসঙ্গে সে রচনা অবশ্য-পাঠ্য।

'স্মৃতি' কবিতার নামেই পরিচয়। কবির কৈশোর-জীবনে পশ্চিমের

একটি শহরে কবে কোন্ এক তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ এক পরবাসী মেয়ে কবিকে বিদেশী কবির কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল—আজ তা মনে পড়ছে। সে কবিতা শুনে কবির প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়িয়েছিল বিদেশী-ভাষার মধ্যে আপন হৃদয়ের ভাষা, সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা সেই কবিতার মধ্যে কবির কাছে ধরা পড়েছিল। বিলিতি মৌসুমি ফুলেও যেমন প্রজাপতি ঘুরে বেড়ায়, তাকে বর্জন করে না, তেমনি বিদেশী কাব্যেও কবির সংবেদনশীল হৃদয় মানবহৃদয়ের অপার রহস্যরস খুজে পেয়েছে,—আজ বহু দূরে ফেলে আসা সেই মন্থর দিনটির স্মৃতি কবির মনে জেগেছে। পশ্চিমা শহরের সুন্দর একটি চিত্রময় বর্ণনা দিয়ে বিদেশী কবির কবিতায় তার 'প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভায়া' বলে স্মৃতিচারণ করেছেন কবি।

'ছেলেটা' ছোট গল্পরসের কবিতা, একটি চরিত্র-চিত্রণই এখানে প্রধান হয়েছে, কিন্তু শেষে কবির আত্মভাষণে তার কাব্যের একদিকের অপূর্ণতার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার সমালোচনা করেছেন। 'ছেলেটা' কবিতার উপসংহারেও বলেছেন যে তিনি এই রকম ছেলেদের উপযোগী কবিতা তো লিখতে পারেন নি, ব্যাঙ কি গুবরে পোকা কি নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি তাঁর কাব্যে রূপ পায়নি।

'ছেলেটা' কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক দুরন্ত ছেলের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। দুষ্টুমির তার সীমা নেই, সেই দুষ্টুমি যদি দৌরাত্ম্যের পর্যায়ে যায়—তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্যের বাগানে ফল পেড়ে খেতে বাধ বাধে না, এমনকি প্রচণ্ড মার খেলেও কুল পাড়তে গিয়ে কখনো হাড় ভাঙে, বুনো ফল খেয়ে ওর ভিরমি লাগে, রথ দেখতে দূরে যায়, কখনো পথ হারায়, কখনো কাদায় পড়ে, শাসন মানে না, ছাড়া পেলে আবার দৌড় দেয়। মরা নদীর দাম-জমা জলে ডুব দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে তার শোনা নাগলোকের রূপ কেমন। কিন্তু দামে জড়িয়ে গেল দেহ।

চেঁচিয়ে উঠে খাবি খেয়ে তলিয়ে গেল কোথায়।

ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু—

জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে,

তখন সে নিঃসাড়।

কোনোমতে সে যাত্রা বেঁচে উঠলো। আস্তে আস্তে জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে মজার মনে হয়েছিল, ছোটবেলায় হারানো মায়ের ছবি জেগেছিল মনে; সে তার সঙ্গীকে লোভ দেখিয়ে বলে—ডুব দে না একবার, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে তুলবো। সঙ্গীটি রাজী হয় না। ছেলেটা রেগে বলে— ভীতু কোথাকার।

বক্সীদের ফলের বাগানে চুরি করে ফল খেতে গিয়ে মারই খায় বেশী, কিন্তু তাতেও তার লজ্জা নেই। পাকড়াশিদের মেজ ছেলের কাছে কাঁচ-পরানো চোঙের ভেতর দেখলে সাজানো নানা রঙ, নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে; ছেলেটা তার ঘষা ঝিনুকের বদলে ওটি চাইলে, কিন্তু ও দিলে না—কাজেই চুরি করে আনতে হলো, লোভে নয়, নিজের কাছে রাখার জন্যে নয়, শুধু ভেতরে কি আছে তা দেখার কৌতূহল মেটানোর জন্যে। চুরি করার জন্যে দাদা কানে মোচড় দিয়ে প্রহার শুরু করলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা বললে—

'ও কেন দিল না?'

যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ছেলেটার ভয়ডর নেই। এক কোলা ব্যাঙ ধরে বাগানে খোঁটা পোতার গর্তে রেখে তাকে পুষতে থাকে, গুবরে পোকা এনে কাগজের বাক্সে রাখে, স্কুলে যায় পকেটে কাঠ বিড়ালি নিয়ে। একদিন একটা হেলে সাপ মাস্টারমশায়ের ডেস্কে রেখেছিল। ডেস্ক খুলে মাস্টার মশাই যে দৌড় দিলেন—সেটাও উপভোগের বস্তু ছিল তার।

একটা দেশী কুকুর পুষতো, মনিবের মতো তারও অনাদরেই দিন কাটতো; পরের বাড়িতে চুরি করে খেতে গিয়ে চতুর্থ পা খোঁড়া হয়েছিল, ছেলেটার বিছানাতে শুত সে,—নইলে উভয়েরই ঘুম হতো

না। একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে তার দেহান্তর ঘটলো. ছেলেটা—যাব চোখে কেউ কখনো জল দেখে নি, লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগলো। সেই প্রতিবেশীদের সাত বছরের এক ভাগ্নেব মাথার ওপব একটা ভাঙা হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে এল।

সকলে তাকে দূব দূর কবে তাড়ালে কি হবে, সিধু গয়লানী তাকে আদব কবে, প্রশ্রয় দেয়; তার ওপবেও ছেলেটার অত্যাচার কম নয়। বাঁধা গরুর দড়ি কেটে দেয়, ভাঁড় লুকিয়ে রাখে, কিন্তু গয়লানীর মমতা তবু কমে না, তার মবা ছেলের সমবয়সী হবে এ,—তার ছেলের মতোই প্রায় দেখতে। লোকে গয়লানীর হয়ে ছেলেটাকে কিছু বলতে গেলে সিধু গয়লানী নিজে ছেলেটাবই পক্ষ নিয়ে বসে।

মাস্টাবমশাই এসে কবিকে জানিয়ে যান—শিশু পাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো পর্যন্ত এ বাঁদবটা পড়ে না—এমন নিবেট বুদ্ধি। কবি বললেন যে সে ত্রুটি তাঁর। ওব নিজেব জগতেব কবি যদি ওব জগৎকে রূপ দিতে পারতেন—তবে ওকি সেগুলি না পড়ে পারতো? তিনি তো কোনোদিনই ব্যাঙেব খাঁটি কথা কি ওর নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডির রূপ দিতে পাবেন নি।

'ছেলেটা' কবির সহানুভূতিতে সজীব হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির জগতে দামাল একটি ছেলে, বাল্যকালে যাব মা মারা গেছে, অনাহত ও স্নেহবঞ্চিত হয়ে সংসারের থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, পিছনে কোনো টান নেই বলেই কেমন যেন বেপরোয়াভাবে বেড়ে উঠেছে। কবি সুন্দরভাবে সরল কথার রেখায় ছেলেটার চরিত্র-পরিচয় দিয়েছেন। যদিও ছেলেটা শব্দে অনাদরের সুর ধ্বনিত হয়, ছেলেটিতে মমত্বের, তবু কবি 'টা' প্রত্যয় দিয়েই মমতাকরুণ সহৃদয়তার অবলেপে ছেলেটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'সহযাত্রী' কবিতাটি 'বিশ্বশোক' রচনার একই তারিখে অর্থাৎ ১১ই ভাদ্র ১৯৩৯ সালে রচিত; এটি কাহিনীমূলক কবিতা। একটি অদ্ভুত-দর্শন লোক জাহাজে করে যাচ্ছে—আরও অনেকেই যাচ্ছে সেই

জাহাজে। ঐ অদ্ভুতদর্শন সহযাত্রী শুধু দেখতেই যে বেয়াড়া—তা নয়, আচরণও তার কেমন বে-খাপ্পা ধরনের। কোথায় একটি আলপিন পড়ে আছে—সে সেটি তুলে নিয়ে জামায় বিঁধিয়ে রাখে, তা দেখে জাহাজের মেয়েযাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে।

পার্শেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে,
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি,
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে।

আহারের ব্যাপারেও সে সাবধান, খাওয়ার সঙ্গে হজমিগুড়ো জলে মিশিয়ে খায়। সে স্বল্পভাষী। তাকে নিয়ে সকলে হাসে, কেউ ব্যঙ্গ করে ছবি আঁকে। সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে, সেটা ওর আগে থেকে সয়ে গেছে। জুয়াড়ীর সঙ্গে ও মেশে না—ওকে কৃপণ বলে। ও মেশে খালাসিদের সঙ্গে পরস্পরের ভাষা না বুঝলেও আলাপ চলে, খালাসিদের মধ্যে একটি অল্পবয়সী ছেলে ছিল—তাকে ও আপেল কমলালেবু এনে দেয়, ছবির বই দেখায়। যখন সিঙ্গাপুরে জাহাজ এল তখন ও খালাসিদের দশটা করে টাকার নোট আর সিগারেট বখশিশ দিলে, ছেলেটাকে সোনা বাঁধানো একটা ছড়ি দিয়ে সে নেমে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে বিদায় নিয়ে। তখন সকলে জানলে কত বড় মানবদরদী এই লোকটা। জুয়াড়ীর দল তখন হায় হায় করে উঠলো। এইখানেই কবিতাটির শেষ।

সহযাত্রী একটু অসংগত চরিত্রের, বে-খাপ্পা ধরনের মন তার, গড়ন আরো বেয়াড়া। কবির সহানুভূতি এই মানুষটিকে ঘিরে। অভিজাত পোশাকী মানুষদের প্রতি তার ব্যবহার উন্মোচিত হয় নি—তাই সে এই সম্প্রদায়ের লোকের কাছে অবহেলার পাত্র হয়েছে। তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু খালাসি বা শিশুর কাছে সে আদর্শস্থান, তার অন্তরে সাধারণ মানুষ ও শিশুর জন্যে যথেষ্ট দরদ রয়েছে। সে যে কত বড় বিখ্যাত মানব-প্রেমিক—তা বোঝা গেল কবিতাটির শেষাংশে। বাইরের বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে গোপন অন্তরের

মানুষটিকে কবি অপূর্বভাবে এঁকেছেন। এমন বেয়াড়াবেখাপ্পা সহযাত্রী যে এতবড় মানবদরদী—তা বোঝার মধ্যে কবি ঈষৎ নাটকীয়তার চমক সৃষ্টি করেছেন।

'পুনশ্চে'র 'বিশ্বশোক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনের দুঃখকে কি ভাবে সহ্য করতে হয়—তার উল্লেখ করেছেন। এই কবিতাটির একটু পটভূমি আছে। কবির একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ ২২শে শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল (৭ই আগস্ট ১৯৩২ সাল) জার্মাণীতে মারা যান। নীতীন্দ্র কবির ছোট মেয়ে মীরাদেবীর ছেলে। মীরাদেবী সংসার-জীবনে বিশেষ সুখী ছিলেন না, কবি তাঁকে মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন। বলা বাহুল্য কবি মীরাদেবীকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন। আমরা 'পরিশেষে'র 'ধাবমান' কবিতাপ্রসংগে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কবি বিশেষভাবে ব্যথিত হন। যদিও প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে তিনি ডুবে থাকতেন, রুটিন মাফিক কাজ করে যেতেন—তবু তার মনে বেদনা ছিল, নীতীন্দ্রের জন্যে তাঁর কাতর মনের ব্যথা প্রকাশিত হতে চাইতো। 'পরিশেষ' গ্রন্থের 'ধাবমান', 'যাত্রা' কবিতায় এবং 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের 'মাতা', 'দুর্ভাগিনী' প্রভৃতি কবিতায় এই বেদনার কিছু প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করে থাকবো। 'পুনশ্চে'র এই 'বিশ্বশোক' কবিতাটিতেও সেই বেদনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটেছে।

কবি গভীরভাবে ব্যথিত—সেই ব্যথা রূপলাভ করতে চায়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের বেদনাকে প্রকাশ করে সকল জনের গোচরে আনা ঠিক নয়; নিজের ব্যক্তিক দুঃখকে সর্বজনীন করার মধ্যে যেমন লজ্জা আছে, তেমনই মানসিক নিঃস্বতাও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কবি তাই বলছেন—

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি,
লজ্জা দিয়ো না!
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।

বিরাট বিশ্বে হাজার হাজার মানুষের হাজার হাজার দুঃখ—এই জাগতিক দুঃখের স্রোতেই ব্যক্তিক মানুষের দুঃখকে মিশিয়ে দিতে হবে। সংসারে যখন সকলেরই দুঃখ আছে—তখন নিজের দুঃখকে বড় করে দেখার কোনো মানে হয় না। বরং নিজের দুঃখকে ভুলে গিয়ে অন্যের দিকে তাকালেই বিশ্বজনের দুঃখ বোঝা যায়। নিজের দুঃখকে যদি মন জুড়ে বসিয়ে রাখা যায়—তবে অন্যের দুঃখানুভবের স্থান কোথায়? এই বিশ্ব সংসারে সব মানুষের জীবনস্রোতে দুঃখের ঢেউ—সেই স্রোত উদ্দাম হয়ে কখনো সংসারকে ভাসিয়ে নেয়, কখনো তা গোপনে বয়ে চলে, ব্যক্তি-জীবনকে বিব্রত করে, কাতর করে।

শাখাপ্রশাখায়,
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবন-স্রোত ঘরে ঘরে।

কবির অন্তরে চিরকালের দুঃখ-প্রবাহের ঢেউ জেগেছে, কবি বিহ্বলতা প্রকাশ করছেন। চিরবিরহ এবং চিরকালীন শোক-প্রবাহের রেশ কবিকে উন্মন করেছে। কবি তখন বিশ্বজনীন শোক প্রবাহের মধ্যেই নিজের দুঃখবোধকে সমাহিত করে দিলেন, নিজের ব্যক্তিক শোককে বিশ্বশোকের চলমানতায় সংস্থাপিত করে তুললেন। ব্যক্তিগত দুঃখকে ভুলে, বিশ্বে ব্যাপ্ত সার্বিক দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধি করে তাকে নিজের লেখনীতে ধরতে চাইলেন, বিশ্বশোকের সবকালীন সুর বাজাতে চাইলেন।

'বিশ্বশোক' কবিতায় তিনি যে কথা বললেন—তা তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করলেন। নিজের দুঃখে বিকল হয়ে যদি কবি আচ্ছন্ন হন—তা হলে তাঁর পক্ষে কাব্যরচনা সহজে সম্ভব হতে পারে না। তাই যেদিন তিনি ব্যক্তিক শোক থেকে জাত 'বিশ্বশোক' শীর্ষক কাব্যতত্ত্বমূলক কবিতা লিখলেন—সেই দিনই তিনি অন্য সুরের আরো দুটি কবিতা রচনা করলেন। সে দুটি কবিতা হলো 'ফাঁক' এবং 'সহযাত্রী'। "দুঃখের উপরে উঠিবার অপরিসীম অধিকারী তিনি, তাই দেখি এই নিদারুণ

দুঃখের পর্বে প্রতিদিন 'পুনশ্চ'র গল্প কবিতা লিখিতেছেন। নীতুর মৃত্যু-সংবাদ আসে ২৩শে শ্রাবণ, আর ২৫ তারিখ হইতে ভাদ্র মাস-ভোর কবিতা লেখা, পত্রধারা লেখা, ভাষণ লেখা চলিতেছে; এমন কি 'দুই-বোন' গল্পোপন্যাসের খসড়াটিও করেন। বিচিত্র রচনার মধ্যে মন ডুবিয়া আছে। মনের সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি জ্বালাইয়াছেন।"[১৫]

"শেষ চিঠি" একটি করুণ রসাত্মক কবিতা। পিতার প্রতি মা-মরা ছোট্ট একটি মেয়ের টানকে কবি নাটকীয় চমৎকারিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, সাধারণ কাহিনী, বক্তব্যও অতিসাধারণ, তবু ট্র্যাজেডির একটি নিগূঢ় বেদনা মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। মা-মরা অমলা, বাপ কত স্নেহে যত্নে নিজের কাছে ধরে রাখেন। লেখাপড়া শেখা হচ্ছে না, মেয়ের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করার চেষ্টা হচ্ছে না—ইত্যাদি অভিযোগে মেয়ের মাসি তাকে নিয়ে যায় বেনারসে।

> ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে,
> বললে, 'এমন করে চলবে না;
> নিজে ওকে যাব নিয়ে,
> বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে—
> ওকে বাচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে'
> মাসির সঙ্গে গেল চলে।
> অশ্রুহীন অভিমান
> নিয়ে গেল বুক ভ'রে
> যেতে দিলেম ব'লে।

বাবা বদ্রিনাথের তীর্থে বেরিয়ে পড়েন। চারমাস কোনো খবর পান না মেয়ের, মনে মনে দেবতার হাতেই মেয়েকে সঁপে দেন, বুকের থেকে যেন বোঝা নেমে যায়। কাশীতে মেয়েকে দেখতে যাবার পথেই চিঠি পেলেন তিনি—মেয়ে নেই, দেবতাই তাকে নিয়েছেন। সেই মেয়েটির ঘর ছিল এতদিন বন্ধ, মেয়ের স্মৃতি-ঘেরা সেই ঘর আজ ভাড়া দিতে হবে বলে বাবা সে ঘরের তালা খুলেছেন, ইতস্ততঃ ছড়ানো

মেয়ের জিনিসপত্র, একজোড়া আগ্রার জুতো, চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল এসেন্সের শিশি। শেলফে তার পড়বার বই, ছোটো হার্মোনিয়াম। একটা অ্যালবাম্, আলনায় তোয়ালে, জামা, খদ্দরের শাড়ি, ছোট কাঁচের আলমারিতে নানা রঙের পুতুল, শিশি, খালি পাউডারের কৌটো। এমনি আরো কত কি। অঙ্ক কষবার খাতার মধ্য থেকে হঠাৎ একটি আধখোলা চিঠি, তাতে ঠিকানা লেখা অমলার বাবারই, অমলার কাঁচা হাতের অক্ষরে।

বাবা সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখেন—

তাতে লেখা—

'তোমাকে দেখতে বড্‌ডো ইচ্ছে করছে'।

আর কিছুই নেই।

এইখানেই 'শেষ চিঠি' কবিতাটির সমাপ্তি। পাঠকের সংবেদনশীল অথচ স্নেহময় চিত্তে বেদনার তড়িৎপ্রবাহ বইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ছোটো একটি মেয়ের অভিমানমেশানো আবেগ, বাবাকে দেখার আর্তি, পিতৃস্নেহের প্রত্যক্ষ স্পর্শের জন্য দুদম আকুলতার একটি করুণ ছবি আকা হয়েছে এই শেষ চিঠির একটি পঙ্‌ক্তিতে—'তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও পিতা হিসেবে কম স্নেহময় ছিলেন না, এবং তার বড় মেয়ে বেলা দেবীকেও তিনি খুব বেশি ভালবাসতেন। সেই বেলা দেবীর মৃত্যুতেও তিনি রীতিমতো বিষণ্ণ হন। 'শেষ চিঠি'তে অমলার বাবার যে বেদনা—তার মধ্যে কবির আত্মিক জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই 'শেষ চিঠি' কবিতা লেখার প্রায় চোদ্দ বছর আগে কবির বড় মেয়ে বেলা দেবী এই সংসার ত্যাগ করে চলে যান, তারিখটা বোধহয় ১৬ই মে ১৯১৮। তখন তিনি ভেতরে ভেতরে যে কতদূর শোকার্ত হয়ে পড়েন তা তাঁর বাইরের আচার ও আচরণে ধরা পড়েনি। তিনি একটি পত্রে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তাঁর মনের এই বেদনা প্রকাশ করেছেন। চিঠিপত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে বাইশ নম্বরের পত্রটি পড়লেই কবির

সেই শোকসন্তপ্ত মনের খবর পাওয়া যাবে। 'পলাতকা' গ্রন্থে 'শেষ প্রতিষ্ঠা' বলে যে কবিতাটি আছে সেটিও এই সময়ে লেখা। আমাদের আলোচ্য 'শেষ চিঠি' কবিতাটির অন্তর্নিহিত বিষণ্ণতার সঙ্গে 'শেষ প্রতিষ্ঠা' কবিতার বেদনায় বেশ খানিকটা মিল আছে। সেখানেও কন্যাহারা পিতার বেদনার্ত উক্তি—

এই কথা সদা শুনি 'গেছে চলে', 'গেছে চলে'।
তবু রাখি বলে
বোলো না, 'সে নাই,'
সে কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে
মর্মে গিয়া বাজে।

পিতৃস্নেহ যে তার কত গভীর ছিল—তা কি কাবুলিওয়ালা গল্পের রহমন চরিত্র দেখে বোঝা যায় না? সেই রুক্ষ আপাতকঠোর মেওয়া-ফেরিওয়ালা বুক পকেটে হাতের পাঞ্জা বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে—তার মধ্যে কি বিশ্বপিতার স্নেহময়তার একটি বিধুর ছবি আঁকা নেই? 'শেষ চিঠি' এই স্নেহময়তার আরেক বেদনার্ত প্রকাশ। কবিতাটির মধ্যে করুণ গল্পরসের ছোঁয়া আছে—এবং তা নাটকীয়তার মাধ্যমে মনকে ভাবাতুর করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিরহ-বেদনার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, 'শেষ চিঠি' সেই বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করছে।

'বালক' কবিতাটি মা-মরা একটি ছেলেকে নিয়ে শুরু হয়েছে, মাসির কাছে সে মানুষ হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া দুরন্তপনায় তার জুড়ি মেলা ভার, দিঘির জলে তার দাপাদাপি, বনবাদাড় খালবিলে তার দৌরাত্ম্য। নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির, তেঁতুল গাছের ওপরের ডালটা—সমস্ত কিছুই যেন তার দখলে, ধোপাদের গাধার পিঠে চড়ে ঘোড়দৌড় জমায়, সর্দার পোড়ো ওকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে বাঁশবন দিয়ে হেঁচড়ে টেনে এনে হাজির করে পাঠশালায়।

মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ ;

হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেয়ালে,

মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে

পুঁথির পাতার গায়ে।

মা-মরা বালকের এই সূত্র ধরে কবি নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা'য় ভৃত্যতন্ত্রশাসিত গৃহবন্দী যে অসহায় বালকটির ছবি আমরা দেখেছি, এখানে কবি সেই বালকটির ছবি আবার আঁকতে বসলেন। তার চোখের অগোচরে কিন্তু মননের সীমানায় 'অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ' ছিল। 'শিশু' গ্রন্থের 'পুরানো বট' কবিতার কথা আবার স্মৃতিপথে উদিত হলো, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের শ্রাবণ সন্ধ্যায় যে উপমা আমরা পেয়েছি—সেটির কাব্যিক রূপ আবার এখানে হাজির হলো, গৃহবন্দী বালকের কাছে দূরের হাতছানি আসতো—কিন্তু কবির সে জগতে যেতে ছিল মানা।

পৃথিবীতে ছেলেরা যে খেলা জগতের যুবরাজ

আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে। শুধু কেবল

আমার খেলা ছিল মনের সুধায়, চোখের দেখায়,

পুকুরের জলে, বটের-শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,

নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ পোহানো ছাদে।

অশোকবনে এসেছিল হনুমান,

সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।

আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে

আকাশ কালো করে

সজল নবনীল মেঘে।

স্মৃতিলোক থেকে কবি তার বালক-কালের বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করেছেন এখানে। শেষে কবিতাটির উপসংহার টেনেছেন একথা বলে যে ছোটদের মনের কথা ছোটরাই ভাল বোঝে। তিনি শিশুমনের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারলেন না। এই গ্রন্থের 'ছেলেটা' কবিতাতেও তিনি জানিয়েছেন যে

দুরন্ত ছেলের মনের উপযোগী কবিতা তিনি লিখতে পারেন নি বলেই 'ছেলেটা' তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতাগুলি পড়তে অনিচ্ছুক। অসম্পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন বেদনা যে এখানেও ধরা পড়েছে—তা অস্বীকার করা যায় না।

'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' কবিতাটি কাহিনীমূলক। প্রেমের ব্যর্থতা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই প্রেমকে বিরহের মাধ্যমে সার্থক করে তুলেছেন, সেইটিই তাঁর প্রিয় ভাব, কিন্তু আমাদের আলোচ্য এই কবিতায় দেখি বিরহের বেদনায় প্রেমের সার্থকতার কথা নেই, প্রেমের ব্যর্থতার কথা ও প্রেমিকার বিচ্ছেদজনিত ঈষৎ বেদনার ইঙ্গিতেই কবিতাটি শেষ হয়েছে। কাহিনী কাব্য, কিন্তু গল্পাংশ অপেক্ষা বিন্যাস-ব্যাখ্যানই বিস্তৃত প্রাধান্য লাভ করায় কাহিনী দানা বাঁধে নি, কেমন যেন শিথিল বলে মনে হবে।

সুনৃতা মা-মরা মেয়ে, বাপের আদরে মানুষ। বাবা সুনৃতার পছন্দমতো ছেলে অনিলের সঙ্গে সুনৃতার বিয়ে দিতে অমত করায় সে বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় অনিলের বাড়িতে, সেখানেই তার বিয়ে হবে।

বাবা বললেন, 'অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে?'
সগর্বে বলে উঠল সুনৃতা
'চেন না তুমি অনিলবাবুকে,
তার জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।'

কিন্তু সে বিয়ে হলো না, অনিল তখন তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে—বাবা মত দেয় নি, সুতরাং—সুনৃতার বাবা মা-মরা মেয়েকে নিয়ে হোসেঙ্গাবাদে মামার বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেলেন।

এদিকে অনিলের বিয়ে, বাড়িতে ইলেকট্রিক বাতির মালা খাটানো হয়েছে, সানাই বাজছে। অনিলের মনটা হুহু করে উঠছে। সে একবার এল সুনৃতাদের বাড়িতে, কৈলাস সরকারের সঙ্গে দেখা,—আমতা আমতা করে অনিল বললে—'পার্বণীটা ভুলেছিলেম'—তাই দিতে এসেছি, অমনি তোমাদের সুনিদিদির খবরটাও দেখে যাব।

অনিল ঘরে গেল, সেখানে কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ—চুলের না শুকনো ফুলের বোঝা গেল না। টেবিলের নিচে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা পড়ে রয়েছে। সেটা অনিল কোলে তুলে নিলে।

দেখলে, ঝুড়ি-ভরা রাশিরাশি ছেঁড়া চিঠি—
ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতের লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো-টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।

তথ্যবহুলতার জন্যে কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের কাছে সহসা ধরা পড়ে না। অনিলের প্রেমের মধ্যে কোনো গৌরব নেই, লেখকের বর্ণনায় অবশ্য সেই প্রেম সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা জাগে না, সে প্রেমিকার বিচ্ছেদ-বেদনা ভোগ করেছে—তবু বর্ণনার আতিশয্যেই বোধহয় অনিলের প্রেমের কোনো মূল্য দিতে পাঠকের ইচ্ছা জাগে না, কারণ অনিলের নিজস্ব কোনো মত নেই। সে দুর্বলচিত্ত, বিয়ের ব্যাপারে পিতৃভক্ত। তাই বোধহয় অনিলের বেদনার চিত্র ফুটলে তার অন্ত[illegible] বেদনায় পাঠকের কারুণা ও সহানুভূতি জাগে না। তাছাড়া, আগেই বলেছি এটি প্রেমের ব্যর্থতার দিক নিয়ে লেখা কবিতা, বিরহ নিয়ে নয়, তাই এর আবেদনও পাঠক মনে দূরপ্রসারী হয় নি। কাহিনীকাব্য হিসাবেও বিশেষ উৎরোয় নি, কারণ কাব্যের শেষে কোনো চমক নেই।

'কীটের সংসার' কবিতায় কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন কীটের জীবনের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ পরিচয় ঘটলো না বলে। একদা কামিনী ফুলের ডালে কবি মাকড়সার বাসা দেখলেন, বাগানের পথের ধারে দেখলেন পিঁপড়ের বাসা। বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসার দেখতে ছোট, তবু খুব ছোট নয়। তেমনি এই কীটের সংসার—ভালো করে চোখে পড়ে না, তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে ওরা আছে। জীবনধারণে ওদেরও সমস্যা আছে ভাবনা আছে, সমাজ আছে, আছে দীর্ঘ ইতিহাস। ক্ষুৎপিপাসায় ওরাও কাতর, জন্মমৃত্যুর চক্রে ওরাও আবর্তিত। কিন্তু

কে তার খবর রাখে।

ওদের জীবনের সঙ্গে এই অপরিচয় কবির জীবনের পক্ষে একটা অসম্পূর্ণতা, কবি ওদের জানতে পারলেন না—সেই বেদনা এখানে প্রকাশ করেছেন। কল্পনার মাধ্যমে গ্রহনক্ষত্রে প্রবেশ অনায়াসসাধ্য হয়েছে।

কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ সংসারের ধারেই।

কবি কীটের সংসারকে মানব-সংসারের মতোই দেখতে চান, মানুষের জীবনের মতোই কি কীটের জীবনের এই সব উপলব্ধি জাগে—কবির কাছে তা অজানাই রয়ে গেল।

'ক্যামেলিয়া' গল্পরসের ভিয়েনে পাক দেওয়া একটি ঘটনাপ্রধান কাব্য-বিশেষ। 'পুনশ্চে'র মধ্যে সাধারণ মানবের মহত্ত্বকে তিনি স্বীকৃতিদান করেছেন, এবং অসামান্য অপেক্ষা সামান্যের জীবন যে আদৌ কম শ্রদ্ধান্বিত নয়—তা দেখিয়েছেন। 'ক্যামেলিয়া' কবিতাতেও তিনি সাধারণ এক সাঁওতাল রমণীকে তথাকথিত অসাধারণ শোভনদৃশ্য কৃষ্টিময়ী নারী অপেক্ষা বেশী মাহাত্ম্য দান করেছেন।

'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি ছোট গল্পের মতো চমকপ্রধান। ভালো লাগতে পারে এমন মার্জিত ভব্য অসাধারণ মেয়ের জন্যে সযত্নে লালিত ক্যামেলিয়া ফুল সাধারণ অশিক্ষিত এক সাঁওতাল মেয়ে কানে গুঁজে সামনে হাজির হয়েছে তখনই দেখা গেল ঐ ফুলটির পূর্ণ সৌন্দর্য স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠেছে। অভাবিতপূর্ব শোভায় ক্যামেলিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নায়ক খ্যাতিমান ফুটবল খেলোয়াড়, চওড়াগোছের নাম। ট্রামে যেতে যেতে কলেজ-পড়া সহযাত্রিণী কমলা নামের একটি মেয়ের প্রতি

তাব একতবফা আত্মসমর্পণ। ছেলেটিব 'সিভাল্‌বি'তে কমলার কুণ্ঠা জাগে, সে ট্রামে যাওয়া ছেড়ে দেয়।

গরমের ছুটিতে কমলাবা দার্জিলিঙে যায় শুনে ছেলেটি দার্জিলিং গেল। কিন্তু শোনা গেল সেবাব কমলাবা আসবে না সেখানে। খেলোযাড়েব এক ভক্ত—নাম মোহনলাল, তাব বোন খেলোয়াড়কে একটি দামী দুর্লভ ফুলেব গাছ উপহাব দিলে, ক্যামেলিয়া ফুলেব গাছ। নামটা চমক লাগাব মতো—ক্যামেলিয়া, কমল'বই বড় কাছাকাছি।

কিছুদিন পবে সাওতাল পবগনাব ছোট জায়গায় কমলা মাকে নিয়ে বেড়াতে গেল। সেখানে কমলাব মামা-বেলেব ইঞ্জিনিয়াব-থাকতেন। খেলোয়াড়ও খোঁজ কবে যায় সেখানে, নদীব ধাবে তাবু বিছিয়ে সে দিন কাটায়।

ওপাবে কমলা যে খেলোয়াড়কে চিনতে পেবেছে সেটা বোঝা যায কমলা খেলোয়াড়কে লক্ষ্য না কবে এড়িয়ে যায়—তা থেকেই। কমলা বন্ধুদেব নিয়ে নদীব ধাবে কাছে পিকনিক কবে। খেলোয়াড়েব মনটা ছটফট কবে উঠে। সে উপলব্ধি কবে সাঁওতাল পবগনাব নির্জন কোণে সে যেন অসহ্য, যেন অতিবিক্ত। কদিন পবে ক্যামেলিযা ফুটবে, উপহাব পাঠিযে তবে তাব ছুটি।

যে সাঁওতাল মেযেটি বান্নাব কাঠ এনে দেয় তাব হাত দিযে শালপাতায মুড়ে খেলোয়াড়টি ক্যামেলিয়া উপহাব পাঠাবে ঠিক কবেছে। তাঁবুব মধ্যে বসে তখন খেলোয়াড় ডিটেকটিভ গল্প পড়ছে। এমন সময় সেই সাওতাল মেযেটি এসে হাজিব, বললে, বাবু ডেকেছিস কেনে? বেবিয়ে এসে খেলোয়াড় দেখে ক্যামেলিযা সাঁওতাল মেয়েব কানে, কালে গালের ওপব আলো কবে বয়েছে।

সে আবাব জিগেস কবলে—'ডেকেছিস কেনে'?

আমি বললেম, 'এই জন্যেই'।

তাবপবে ফিবে এলেম কলকাতায়।

এই কাহিনীব শেষাংশে নাটকীয় চমক আছে, আধুনিক প্রেমেব

অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু সবোপরি সাধারণ একটি সাঁওতাল মেয়েকে মানবিক মূল্য ও মর্যাদা দান করার অপূর্বতা আছে। যাকে ভাল লাগে, তাকে আমরা সর্বস্ব দিতে চাই। যদি অনাদর ও প্রত্যাখ্যানের দ্বারা সেই প্রেম অপমানিত হয় তবে তার বেদনা বুকে বড় লাগে। 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় সেই বেদনার ট্র্যাজেডী বর্ণনা কিন্তু কবির আসল বক্তব্য নয়, প্রকৃতির শ্যাম-সৌন্দয প্রকৃতি-কন্যারই উপযুক্ত আভরণ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে তারা একে অপরের পরিপূরক, এই কথাই কবি বলতে চাইছেন। কমলাকে এই ফুলটি পাঠানো হলে প্রেম নিবেদনের দিক থেকে একটা মূঢ় সার্থকতায় খেলোয়াড়ের বক্ষোদেশ স্ফীত হতো হয়তো, কিন্তু সাঁওতাল মেয়েটির কানে স্থান পেয়ে ক্যামেলিয়া ধন্য হয়েছে—যোগ্যের সঙ্গে যোগ্য সংযোজনের চেয়ে প্রাকৃতিক এবং সহজাসিদ্ধ আর ব্যাপার কিছু নেই এমন স্বভাবসুন্দর স্নিগ্ধতাটুকু দেখেই নয়ন মন সার্থক হয়ে ওঠে। এই স্বভাবসুন্দর মেয়ের 'ডেকেছিস কেনে' প্রশ্নের উত্তরে বলবার কিছু থাকে না, শুধু সৌন্দর্যাবলোকন আর কবিতাটির সেইখানে আনন্দোপলব্ধি ঘটে।

গল্পরস 'ক্যামেলিয়া'র উপজীব্য হলেও দীর্ঘ বিন্যাসের কোথাও ঘটনার ঘন সন্নিবদ্ধ রূপ নেই। সুদীর্ঘ কাহিনী উপস্থাপনা এবং তার বর্ণনার মধ্যেই কবিতাটির ব্যাপ্তি; জমাটবাঁধা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত না হওয়ায় গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কবি এখানে বলবার রীতির প্রতিই বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছেন বলবার বিষয় তাই হয়েছে নির্দিষ্ট।

একটি শালিখ পাখিকে দেখে কবি ভাবছেন—পাখিটা একা, সঙ্গীহারা কেন? 'শালিখ' কবিতায় কবির এই চিন্তা ও তার অনুক্রম প্রকাশিত হয়েছে। রোজ সকালে পাখিটা আসে, পোকা শিকার করে, ঘোরে, কবিকে ভয় না করেই নেচে নেচে বেড়ায়। কিছুদূরেই শালিখের জটলা, বকাবকি করছে, ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি, শিরিষের গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এই পাখিটা কেন একা, সমাজের কোন্ শাসনে এ নির্বাসিত? কারুর ওপর কি অভিমান

হয়েছে, না বৈরাগ্য-গর্ব দেখাতে চায়? কবি মানুষের মনোভাব নিয়ে পাখির মন ও ধর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চান।

সন্ধ্যায় বা রাতে তো ওই পাখিকে কবি দেখেন নি,—সে তখন একলা তার ডালের কোণে থাকে!

কবির অদম্য কৌতূহল জেগেছে শালিখের জীবনের রহস্য জানার, অথচ সে কৌতূহল মেটানোর কোনো উপায়ও নেই, তাই কবি যেন কেমন-ধারা ব্যথিত বোধ করছেন!

এর আগে 'কীটের সংসার' কবিতায় আমরা দেখেছি কবি ব্যথিত হয়েছেন পিঁপড়ে বা মাকড়সার জীবন ও সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে না পেরে, এখানেও শালিখ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলপূর্তির সম্ভাবনা নেই।

'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি 'পুনশ্চে'র বহুপঠিত কবিতা, অন্ততঃ 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটির মতোই এর খ্যাতি। 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটির মধ্যে নাটকীয় চমক আছে, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোকে 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটির পঠন-পাঠনে ওটির গৌরব বাড়তে পারে, কিন্তু 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির মধ্যে মহত্ত্বের বাণী বড় একটা নেই। নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়ে, তার প্রেমের ভাঙাগড়া, তার মনের কল্পনা-বাসনা, তার ঈর্ষা-কামনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মোহ-বেদনা—সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতকে কবি পাশ কাটিয়ে গিয়ে সাধারণ মেয়ের প্রেমের মূল্য বোধের স্বীকৃতি জানাচ্ছেন বাস্তব চেতনার ভিত্তিতে। সাধারণ মেয়ের জীবনে প্রেম এসেছিল একবার—তার যৌবন বয়সে, সাধারণ রূপ নিয়ে জন্মেছে সে, সৌন্দর্যের কোনো বড়াই নেই তার। কিন্তু তা বলে প্রেমের পাওনাকে সে হাতছাড়া করতে রাজী নয়। সে চায় প্রেমের লৌকিক সার্থকতায় তার জীবন পূর্ণ হোক, সে চায় তার প্রিয়তমকে, সে প্রিয়তম তার কাছ থেকে চলে গেলে সে বেদনাহত হয়, ঈর্ষা ও আর্তিতে সে ভেঙে পড়ে। কবি এই সাধারণ মেয়ের অসফল প্রেমকে মহৎ বিরহের কোনো মহিমান্বিত রূপ দান করেন নি।

'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির গল্পাংশ সহজ এবং সাধারণ। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সাধারণ মেয়ে—তার না আছে রূপের জৌলুস, না আভিজাত্যের চমক। তবু কাঁচা বয়সে তার প্রেমে বাঁধা পড়েছিল একটি যুবক। ধরা যাক তার নাম নরেশ। সেই নরেশের দৌলতেই তার জীবনে প্রেমের আস্বাদ, সেই অমৃত যন্ত্রণার উপভোগ। কিন্তু নরেশ গেল বিলেতে পড়াশুনো করতে, সেখানে গিয়ে সে উজ্জ্বল বুদ্ধির, ভব্য চারুচিক্যের অনেক মেয়েকে পেলে সহজ সান্নিধ্যে। নরেশ পত্রে সে সব মেয়ের খবর জানায়, বিশেষ করে লিজির কথা লেখে,—লেখে লিজির সঙ্গে সে সমুদ্রস্নানে গিয়েছিল।

স্বাভাবিক কারণেই ব্যথা বাজে সাধারণ মেয়ের বুকে, দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে সে আবেদন জানায় সাধারণ মেয়ের একটি গল্প লিখে দিতে যেখানে সেই সাধারণ মেয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠে, নরেশের মতো ছেলের পাব যোগ্য নয়— তাই যেন প্রতিভাত হয়। বিশ্ববিদ্বৎসভার সেই সাধারণ মেয়ের অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় সকলে ধন্য ধন্য করে, নরেশের তাক লেগে যায় যেন!

এখানেই গল্প শেষ। কবিও কবিতাটি শেষ করেছেন এই বলে—

আর তার পরে ?

তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োল,

স্বপ্ন আমার ফুরোল !

হায় রে সামান্য মেয়ে !

হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয় !

কবি যে সাধারণ মেয়ের প্রতি কি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল তা এই শেষ পঙ্‌ক্তিটি দেখলেই বোঝা যাবে।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতি পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শরৎচন্দ্র দরদী কথাশিল্পী, সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের জীবন-বেদনার বর্ণনায় তার রচনা মহিমময় হয়েছে। তিনি বাঙালী ঘরের মেয়ে ও বধূর জীবনের আর্তি ও বেদনাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন,

রবীন্দ্রনাথ তাই সাধারণ মেয়ের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রকেই আকুল ভাবে ডেকে একটি গল্প লেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাঙালী সাধারণ মেয়ে ও বধূর জীবন বিপর্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বে একাধিক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সে সব কবিতার মধ্যে বাস্তব বোধের আলোকে স্বর্গীয় দ্যুতির প্রকাশনাই মুখ্য কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পলাতকা' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'পুনশ্চে' কবি মাটির কাছাকাছি এসে মাটির মানুষকে মৃন্ময়ীই দেখেছেন—তাকে দেবীত্বের বেদীতে বসান নি। রবীন্দ্রনাথের গোধূলি পর্যায়ের সেটি এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—সে কথা গ্রন্থের আলোচনা আরম্ভের সময়েই উল্লেখ করা হয়েছে।

একেবারে কাছের মানুষের প্রতি কবি বাস্তব অথচ দরদী দৃষ্টি মেলে ধরেছেন—এই গ্রন্থে। এতাবৎকাল- বিশেষ করে রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে তাঁর কাছে সাধারণ লোক, অতি সাধারণ একজন মানুষ মানব-মহিমার দিব্যদ্যুতিতে অন্তর্নিহিত হয়ে দেখা দিত। (পুরাতন ভৃত্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছে)। কিন্তু ১৯৩১ সালের পর থেকে কবি তাঁর নিতান্ত কাছের লোকজন সম্পর্কে সচেতন, একেবারে কাছের পরিবেশের মানুষকে অতি সাধারণ বাস্তব-গুণসম্পন্ন করে অঙ্কিত করেছেন। কি তার হওয়া উচিত—অর্থাৎ normative আদর্শটিকে সরিয়ে রেখে যা তাই—অর্থাৎ positive গুণের মাধ্যমেই বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে 'একজন লোক' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে।

ভাদ্র মাসের এক সকালবেলায় কবি একজন রোগা লম্বা আধবুড়ো হিন্দুস্থানীকে যেতে দেখলেন। হিন্দুস্থানীটির পাকা গোঁফ, দাড়ি কামানো মুখ, ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি, লাঠি হাতে, পায়ে নাগরা,—শহরের দিকে সে চলেছে। শরৎকালের প্রকৃতিতে কেন যেন শ্যামলিমা, লোকটির খেয়াল নেই,—কবিও লোকটিকে একটি

লোক হিসেবেই দেখলেন,—ওর নাম নেই সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই, কোনোকিছুতে দরকার নেই, কেবল হাটে-চলার পথে ভাদ্র মাসের সকালবেলায় একজন লোক। কবি তার সম্পর্কে কিছুটা কল্পনা করতে পারেন—তার ঘরে তার বাছুর আছে, খাঁচায় ময়না আছে, তার স্ত্রী আছে—জাঁতায় আটা ভাঙে পিতলের মোটা কাঁকন হাতে।

কবিকে সেও দেখে গেছে—এবং একজন লোক হিসেবেই দেখে গেছে। সেই দেখায় তার মনে কোনো চাঞ্চল্য জাগে নি, কোনো কৌতূহল গড়ে ওঠে নি। কবির মতো কল্পনাপ্রবণ মন তার নয়, সে সাধারণ—তাই কবিকে সে একজন লোক বলেই জেনেছে। কবি কিন্তু তাকে একজন লোক বলে জেনে ক্ষান্ত হতে পারেন নি, তাকে কেন্দ্র করে তার কল্পনার বাধ ভেঙে গেছে। অথচ স্বাভাবিক কারণে বাস্তব পরিপার্শ্ব নিয়ে লোকটির মাথা ব্যথা—তাই কবি তার কাছে আর কিছু নন শুধু একজন লোক মাত্র।

'খেলনার মুক্তি' কবিতাটি রূপক ধরনের। এর ওপরে এক রকমের মানে আর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে কবির ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অর্থ করলে দাঁড়ায় আরেক মানে। বাহ্যিক অর্থটিও বেশ সুন্দর—সেটি ছোটদের উপভোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়রাই তা থেকে বেশী রস পাবেন—সেই জন্যে কবিতাটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে সংকলিত না হয়ে 'পুনশ্চে' স্থান পেয়েছে। কবিতাটির সরলার্থ হলো এই রকম :—

মণিদিদির ঘরে আছে একটি জাপানি পুতুল, নাম হানাসান। বিলেতের হাট থেকে আরেক রাজপুত্র পুতুল এল তার বর হিসেবে, কোমরে তলোয়ার, মাথায় পাখির পালক আঁটা টুপি। কাল অধিবাস, পরশু হবে বিয়ে। সন্ধ্যার পর যখন হানাসান পালঙ্কে শুয়ে, কোথা থেকে এক কালো চামচিকে এল। হানাসান তাকে মেঘের দেশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে বললে—

জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ

সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।

মণিদিদি এসে দেখে যে পালঙ্কে হানাসান নেই। আঙিনার পারে বটগাছের ব্যাঙ্গমার কাছ থেকে সে হানাসানের খবর জানলে, আর ব্যাঙ্গমাকে ধরে বসলো যে তাকেও সেখানে নিয়ে যেতে-- যাতে সে হানাসানকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

ব্যাঙ্গমার পাখায় ভর দিয়ে সারা রাত উড়ে মণিদিদি অবশেষে মেঘেদের পাড়া চিত্রকূট গিরিতে এসে পৌঁছল। পৌঁছেই সে আকুল হয়ে হানাসানকে ডাকতে লাগলো—

মণি ডাকে—হানাসান, কোথা হানাসান—
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে।
নীল মেঘ বলে এসে,
'মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে!'*

মানুষ খেলনাতে বাঁধে, কিন্তু মেঘেদের খেলা অন্যরকম। হানাসান নানানখানা হয়—নানা রঙে নানা চেহারায় আলোয় হাওয়ায় উদ্ভাসিত হয় মণিদিদি উদ্বিগ্ন হয়—হানাসানের বিয়ের কি হবে—বর এসে শেষে বলবে কি। ব্যাঙ্গমা বলে—চামচিকে ভায়া বরকেও নিয়ে আসবে, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় ঝলমলে গোধূলির মেঘে বিয়ের খেলাটা হবে। মণিদিদি কেঁদে বলে—তা হলে কি শুধু কান্নার খেলা বাকি থাকবে? ব্যাঙ্গমা বলে—সেই কান্নার খেলারও কোনো চিহ্ন থাকবে না, সকালে বৃষ্টি ধোওয়া মালতীর ফোটা ফুলের মতোই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই কবিতাটিকে দুটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে, খেলনার দিক থেকে, আর কবির নিজের জীবনের দিক থেকে। খেলনা মুক্তি চায়—নিজে আত্মপীড়নের মাধ্যমে সে অন্যের আনন্দবিধান করে। নিজে বদ্ধ থেকেই সে অন্যের খুশির সামগ্রী হয়ে উঠে সে নিজে মুক্ত হতে পারে না, খেলনার তাই প্রয়োজন মুক্তির। খেলনা তথা পুতুল

যদি বিয়েব কনে সেজে কিংবা বর হয়ে এসে যদি মণিদিদির আনন্দ বিধানেব জন্যে বদ্ধ হয়ে থাকে—তাতে খেলনাব কি লাভ? তাই খেলনা চায় মুক্তি। খেলনাব দিক থেকে এই কবিতাটির এভাবে বিচাব করা চলে, কিন্তু একটা জায়গায় এসে একটু অসুবিধে হয়। শেষেব দিকে বাঙ্গমা একটি তত্ত্বগভীব কথা বলেছে—খেলা পুরানো হলে তার কোনো মূল্য নেই, আজকেব খেলা শেষ হলে কাল সে নতুন হয়ে দেখা দেয়। তাই এই খেলাব শেষে অন্য খেলাব আবির্ভাব। সকালেব বৃষ্টি ধোওয়া মালতী ফুলেব মতোই খেলা নিত্য নতুন হযে ফুটে ওঠে।

খেলনাব দিক থেকে কবিতাটিব বিচারে বাঙ্গমাব এই উক্তিব প্রয়োজনীয়তা কি—তাব সদুত্তব দেওয়া মুস্কিল হযে ওঠে, সেইজন্যে এটিকে কবিব জীবনেব দিক থেকে ব্যাখ্যা কবা যায়। কবিব জীবনভোর খেলা চলছে, সে খেলা কাজেব খেলা; তাব জীবনে এক কাজ শেষ হয় তো আর এক কাজ এসে পড়ে। তবে এদিক দিয়ে অর্থ কবলে কবিতাটিব মধ্যে কিছু রূপ-কল্পনা এসে যায়, তবু কবিতাটিব রূপকার্থ হিসেবে এই রকম অর্থ মনে হতে পাবে। এই কবিতাটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকাব শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় মশাইও বলেছেন—"এই কবিতাটি কবির একটি অপরূপ সৃষ্টি, রূপ-কল্পনা রূপক-অর্থ দুইই অসামান্য বলিয়া মনে হয়।"[১১] অবশ্য রূপকার্থ উন্মোচনেব তিনি চেষ্টা করেন নি এবং সে ইঙ্গিতও দেন নি।

'পত্রলেখা' কবিতাটিব বক্তব্য শুধু একটিঃ প্রাত্যহিক জীবনেব পবিসবে প্রবাসী প্রিযজনেব অনুপস্থিতি বড গভীবভাবে বাজে—শুধু এই হৃদয়-বৃত্তিটুকুই জাগানো হয়েছে। প্রিয়জন বিদেশে গেছে চলে, বলে গেছে পত্র দিতে, পত্র-লেখাব সাজসরঞ্জামেব ত্রুটি নেই। কিন্তু সংসাবেব বিভিন্ন খুঁটিনাটিব কথা লিখতে গিয়ে শুধু একটা খবরই ফুটে ওঠে, বড হযে দেখা দেয়—যে খববটি প্রিয়জনেরও অজানা নয়।

একটি খবর আছে শুধু—

তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারও ত' জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি, এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে, এ খবর সহজ তো নয়।

'পত্রলেখা' কবিতার বিষয়টি অবশ্যই লিরিক কবিতার—মনে হয় ছন্দে এর ব্যবহার আরো বেশী খুলতো : গদ্য কবিতার মাধ্যমে কবি এটির মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রেম ও ভালবাসার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন—সামান্য একটি কথার ইঙ্গিতে—তুমি চলে গেছ। এই চলে যাওয়ার খবরই পত্রলেখার বিষয়, এছাড়া আর যা কিছু—সে সব ব্লটিঙের ওপর হিজিবিজি আঁকাজোকা - স্পষ্ট লেখা নয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক রুটিন মাফিক দৈনন্দিনতার কথা লেখা বিষয় নয়, বক্তব্যও নয়—সে যেন ব্লটিং পেপারে ছাপ পড়া একে অন্যের ঘাড়ে চড়া উল্টো হরফের হিজিবিজি।

'খ্যাতি' একটি কাহিনীমূলক কবিতা। কবি নিজেকে একজন বড় লেখকের ভক্ত হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, বড় লেখকের (যার নাম নিশি) উৎসাহ উপরোধ এবং প্ররোচনায় ভক্ত দেশের সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে গল্প লেখা শুরু করলেন—এবং অচিরাৎ খ্যাতিমান হয়ে পড়লেন। এই খ্যাতি যখন ব্যাপক এবং বিস্তৃত হয়ে পড়লো—তখনই বড় লেখক নিশি এবং তার ভক্ত—নতুন লেখকের মধ্যে একটু ঈর্ষার ভাব দেখা দিলে। ভক্ত চায় নি বড় লেখক এবং তার মধ্যে খ্যাতির কাঁটার বেড়া ঘন হোক। ভক্ত জানে—নিশি সত্যই বড় লেখক, দেশের লোক না বুঝে ভক্তকে নিয়ে হৈহৈ করছে। তাই খ্যাতির মোহ অপেক্ষা ভক্ত বন্ধুত্বকে বড় বলে স্বীকার করে নিলে, ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি

পয়সায় বন্ধুত্বকে বিকোলে না, তার লেখার জন্যেই এই খ্যাতি, তাই লেখাগুলোকে সে পুড়িয়ে ফেললে।

সাময়িক ঘটনার মধ্যে থেকে উত্তেজনাকর অংশ ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখলে সস্তা খ্যাতি একটা জোটে, কিন্তু তা বেশী দিন টেঁকে না। বন্ধুদের কর-তালির রথে অক্ষম রচনা বেশী দিন মাথা উঁচু রাখতে পারে না···তাকে তোয়াজ করে বেশীদিন উঁচুতে ধরেও রাখা যায় না···কারণ, সে নিজের দুর্বলতায় নীচে নুইয়ে পড়ে। সেই খ্যাতির মোহে পড়ে মানুষ যদি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলির অপমান ঘটায়—তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তাই মিথ্যা-খ্যাতির কাঁটায় বিদ্ধ না হয়ে প্রীতি-ভালবাসা-বন্ধুত্ব-আত্মীয়তাকে মর্যাদা দেওয়াই মানুষের কর্তব্য। এই কথাই এইখানে স্পষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া কবিতাটিতে কোনো সাময়িক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত আছে কি নেই—তা চট করে বলা যায় না।

এবার 'বাঁশি' কবিতা। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কবি ছিলেন, এবং এই গোধূলি পর্যায়ে রচিত তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় ('পরিচয়'—সেঁজুতি) তিনি বলেছেন যে আমার শুধু একটিমাত্র পরিচয় থাক যে—"আমি তোমাদের লোক", সেই হোক তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা যে তীব্র এবং সত্য ছিল—তার অজস্র প্রমাণের মধ্যে 'বাঁশি' কবিতাটি একটি প্রমাণ।

আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবনে দেখা—হাজারবার দেখা সুপরিচিত এই হরিপদ কেরানি! শহুরে, সভ্য, শিক্ষিত, জীবন-বিপর্যয়ের চাবুকে ঘা-খাওয়া আধমরা কেরানি গোষ্ঠীর তরুণ প্রতিভূ এই হরিপদ। অর্থাৎ আমাদেরই প্রতিনিধি এই হরিপদ। স্বল্প কথায় কবি বর্তমান কালের অভিশাপগ্রস্ত জীবনের বেদনাকে রূপদান করেছেন।

হরিপদ কেরানির মেসের চুনবালি-খসা একটি ঘরের বর্ণনা দিয়ে কবিতাটির আরম্ভ। এই পরিচিত ঘরটি—যে আমাদের জীবনে একান্ত সত্য—কবি কল্পনা-দৃষ্টি দিয়ে অঙ্কিত করলেও বাস্তবতার দিক থেকে তা

নির্মমভাবে সত্য। কবি এই নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অধিকারী মানুষের আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ ও বেদনা, সুখ-দুঃখ—এক কথায় জীবনের পূর্ণ অনুভব-লোকটিকেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু কোথাও তিনি বাহুল্যের বশবর্তী হন নি। পঁচিশ টাকা মাইনের কনিষ্ঠ কেরানি, দত্তদের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে খেতে পায়। এই কেরানির মনেও বসন্তের ছোঁয়া লাগে; জীবনের পূর্ণতার হাতছানি আসে। ধলেশ্বরী নদীতীরের এক গ্রামে তার পিসিমার দেওরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নিজের দুরবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজ্ঞান বলেই হরিপদ বিয়ে করে নি, পালিয়ে এসেছে। তার মনের রাজ্যে তখন এই সুর ধ্বনিত—

মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

তারপর কবি আবার বস্তুগত প্রত্যক্ষ সংসারের বর্ণনায় ফিরে এসেছেন। স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাশে স্যাঁৎসেঁতে ঘর, বৃষ্টিভেজা পরিবেশ। সব মিলিয়ে দিন রাত মনে কোন আধমরা জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে।

কান্তবাবুর বাজানো কর্নেটের সুর হঠাৎ কানে আসে, মনে হয়—

আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

বাইরে নোংরা বাস্তব পরিবেশ, মনে অনন্ত গোধূলিলগ্ন, বৈকুণ্ঠের অক্ষয় আশীর্বাদ।

একই সঙ্গে কবি হরিপদর অন্তর্জীবনের এবং তার বস্তুগত অবহেলিত

বহির্জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় মানবদরদী ছিলেন তা এই নিচে উদাহৃত কটি পঙ্‌ক্তিতেই বোঝা যায়; তিনি তুচ্ছ অবহেলিত জীবনের অধিকারী হরিপদ কেরানির মধ্যেও আকবব বাদশার অনুভূতির সঞ্চার ঘটিয়েছেন। সামান্যের মধ্যে অসামান্যের স্পর্শ তিনি বরাববই পেয়েছেন, সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, ক্ষয়শীলের মধ্যে চিরন্তনের ছোঁয়ার কথা তিনি সর্বদাই বলেছেন। তুচ্ছ মানুষেব জীবনও যে উচ্চ অনুভূতি-লোকের সম্পদ—সেই কথাই তিনি বললেন—

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোঁয়ায় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে—
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

এই সুরেব ধ্বনি আমরা আবো শুনেছি। চিত্রা-চৈতালীর মধ্যেও কবি মানব-মহত্বের জয়গান করেছেন, তুচ্ছের মধ্যে উচ্চের আসন আবিষ্কার করেছেন। চিত্রায় সেই বিখ্যাত 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাধারণ মানুষ হরিপদ কেরানি, সে আমাদের প্রতীক, তার জীবনবেদনা আমাদেরই মনোলোকের আর্তির পরিচয়বাহী। আমাদের বঞ্চিত জীবনের সাধ-আহ্লাদ, বাসনা-ব্যাকুলতা এমন করেই মনে বাজে, ধলেশ্বরী নদীতীরের গ্রামের একটি সৌন্দর্য-রূপিণীকে কেন্দ্র করে মন বিষণ্ণকাতর হয়,—যে আমাদের জীবনে অপেক্ষা করে আছে, যার পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। কবি কথাগুলি বেশীবার

বলেন নি, কিন্তু তবু যেন আমাদেব মর্মবেদনা স্পষ্ট, প্রকট এবং উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। 'বাঁশি' কবিতার বাঁশি যেন আমাদেব মনে বৈকুণ্ঠের অমব আশীর্বাদেব সুবকে জাগিয়ে তুলেছে। সমাজব্যবস্থায অবহেলিত মানুষের মনেও স্বর্গীয় খ্যাতিব এবং অমব বাসনায় আনন্দলোক সৃষ্ট হয—তাবই সুব বাঁশি বাজাচ্ছে। এদিক থেকে কবিতাটি যেমন প্রতীকধর্মী, তেমনই সার্থকনামা।

'উন্নতি' কবিতাটির পেছনে যদিও ক্ষীণ একটি কাহিনীব লেবেল আঁটা আছে—তবু আখ্যানেব চেযে এখানে তাত্ত্বিকতা যেন একটু বেশী এসে পড়েছে। কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক পড়িযে কযেকটা পাস কবলেই জীবনেব যথার্থ উন্নতি ঘটে না, মানসিক উৎকর্ষ এবং চিদ্‌বৃত্তি বিকাশেব দিকটাও শিক্ষাব অঙ্গ হবে—তবেই যথার্থ উন্নতি। মাথায বড যেমন সত্যিকাব বড নয, তেমনি ডিগ্রীধাবী মাত্রেই যথার্থ শিক্ষিত নয়। এই তত্ত্ব কথাটি কবি তাব বহু লেখাব মধ্যেই প্রকাশ কবেছেন। 'উন্নতি' কবিতাতেও সে-কথা আছে, সেই সঙ্গে তথাকথিত ডিগ্রীধাবী শিক্ষিতেব অসফল জীবনেব একটি বিষাদ-করুণ ছবিও আকা হযেছে। যদিও এই কারুণ্য একটু হাস্কা কবে বলা হযেছে—তবু এব বেদনা আদৌ কম বাজে না।

কবিতাটিব বর্ণনায একটু নাটুকেপনাও আছে—বিশেষ কবে একটা কুল গাছকে এই কবিতাব মধ্যে টেনে এনে।

কবি নিজেকে নাযক হিসেবে এখানে খাড়া কবেছেন।

নীলমণি মাস্টাবেব কাছে তাকে ইংবেজী পড়তে হতো। মাস্টাব মশাই ছাত্রের নির্বুদ্ধিতায বিহ্বল হযে তাকে মর্কট-বুদ্ধি বলে মনে ভর্ৎসনা কবতেন, কান মলে দিতেন।

ছুটি হলে ছাত্র উদ্ভিদ মহলে মাস্টাবি শুরু কবতো, বাড়িব গা ঘেষে জন্মানো এক কুলেব চাবাই ছিল তাব ছাত্র। কুল গাছেব ওপব বেত্রাঘাত চলতো, তাকে বলা হতো—

'দেখ্, দেখি বোকা,

উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল—
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।'

ছাত্রের পিতা উন্নতি সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিতেন, ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে কে লক্ষপতি হয়েছে—তার গল্প করতেন, বড় হতে হবে, নিদেন পক্ষে বাজিদ্‌পুরের মহাজন ভজু মল্লিকের মতো ধনী হতে হবে, তবেই তো জীবনে উন্নতি! কুল গাছের ওপর সপাসপ বেতের বাড়ি পড়ে, তার উন্নতি হচ্ছে না বলে তার ওপর শাসন চলে!

ছাত্রের পিতা মারা গেলেন, ডিগ্রীধারী ছাত্রের চাকরি হলো সেক্রেটারিয়েটে। তারপর—

বহু কষ্টে বহু ঋণ ক'রে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনাস এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে।
নব বসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই
এমন সময়ে—রিডাক্‌শান।

ছাত্রের আর বিয়ে করা হলো না, অফিসের লক্ষ্মীর মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মীও স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র নিরুদ্দিষ্ট হলো। শুকনো মুখে, ছেঁড়া জুতো পায়ে বড়লোকদের কাছে চাকরির জন্যে ধর্না দিতে হয়। খবর পাওয়া যায় যে ভজ্ মহাজনেরও ভিটেবাড়িটা ক্রোক হয়েছে। ওপরের ঘরে উঠে জানলা খুলতে দেখা গেল সেই কুল গাছটার ডালে জানলাটা ঠেকে যাচ্ছে শেষ কালে সেই উদ্ভিদ্-ছাত্রই উন্নতির স্পষ্ট প্রমাণ দিলে!

কবিতাটির মধ্যে ব্যঙ্গ অপেক্ষা বেদনাই বেশী রয়েছে, তবে সেই বেদনার সুরটি লঘু; "ঘরের লক্ষ্মীও স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ" বলার মধ্যে প্রেমের যে নিষ্ফলতা—তার বাচনিক দিকটা অবশ্যই হাল্কা, কিন্তু বেদনার দিকটা তত হাল্কা নয়। এর সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে

ডিগ্রী লাভই জীবনের উন্নতি বা সার্থকতার একমাত্র শর্ত নয়—একথাটাও স্পষ্ট বলা হয়েছে।

এবার 'ভীরু' কবিতা।

দুর্বল, লাজুক এবং স্বভাব-ভীরুকে সহজে খেপানো চলে ঠিক কথা, কিন্তু সেই ভীরু যদি সাধনার মাধ্যমে সত্যকার শিল্পী হয়ে দাঁড়ায় একবার, সে কারুব উপহাসকে তখন আর গ্রাহ্য করে না; প্রেমিক হলেও করে না। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদেব সামনে সর্বদাই সাহসী। বলিষ্ঠ প্রেমেব সঙ্গে বীর্য ও সাহস বোধ হয় একাত্মভাবে জড়িত। ম্যাট্রিক ক্লাসে ভীরু সুনীতকে ব্যঙ্গনিপুণ বটেকৃষ্ট প্রথমে 'পরমহংস', পরে 'পাতিহাঁস' এবং শেষে হাঁসখালি' বলে খোঁচা দিত, অহেতুক এই আঘাতে সুনীত মনে খুব কষ্ট পেত। বড় হয়ে সুনীত হলো পসারহীন উকিল, কিন্তু ভালো গাইয়ে আর সুন্দর সেতার বাজিয়ে। সুনীতের বোন সুধা, অঙ্কে এম, এ দেবে, তার বন্ধু উমা দর্শনের ছাত্রী। সুনীত উমাকে ভালবেসেছিল, একদিন বর্ষণমুখর দিনে সুধার কৌশলী অনুরোধেই সুনীত গান শোনাচ্ছিল উমাকে,—

'আওয়ে পিয়রওয়া,/ঝিমিঝিমি বরখন লাগে।'

তখন হঠাৎ বটেকৃষ্টর আবির্ভাব,—মাঝে মাঝে যেমন সে এসে সুনীতের পড়ুয়া-জীবনের অন্ধ ভয়টাকে জাগিয়ে দিয়ে যেত পাতিহাঁস কি হাঁসখালি বলে; আজো তেমনি এসে অট্টহাস্যে হাঁক দিলে—"কোথা ওরে, কোথা গেল হাঁসখালি।" কিন্তু সুনীত আজ নিঃসংকোচে ঘৃণিত দৃষ্টি হেনে বটেকৃষ্টের স্থূল বিদ্রূপের উর্ধ্বে উঠে দাঁড়ালো; বটু একটু থতিয়ে গেল, কি যেন বলতে গেল, সুনীত হাঁকল—'চুপ'। বিদলিত ব্যাঙের ডাকের মতো বটুর হাসি থেমে গেল।

কাহিনী অংশ এইটুকুই—এবং এর মূল বক্তব্যও তদনুরূপ যার মনে যথার্থ প্রেম জাগে—তার মনে সাহসও আসে; সাধক যে, সে কখনো ভীরুতার দাসত্ব করে না। মুখচোরা ভয়-কাতর সুনীতও ব্যঙ্গসুচতুর বটেকৃষ্টকে আর ভয় করে না!

'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি T. S. Eliot রচিত The journey of the Magi নামক কবিতাটির বাংলা অনুবাদ। বেথেলহেমের এক অখ্যাত স্থানে মানবপ্রেমিক এক দেবশিশুর জন্ম হয়েছে—সেই শিশু এসেছে পৃথিবীর কল্যাণ করতে—সুতরাং দেবতার মর্যাদা আরোপিত হয়েছে সেই শিশুর উপর, তাই শিশুকে দেখতে, শিশুর জন্মস্থানে আসবার জন্যে মানুষ ক্লেশ সহকারে পথ পরিক্রমণ করেছে—এই পথ-পরিক্রমাই হচ্ছে তীর্থযাত্রা।

কন্‌কনে দুর্জয় শীতের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে যাত্রা : ঘোরালো রাস্তা, পথের কষ্টও অপরিসীম। ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গলা বরফে শুয়ে পড়ে, অনেক পথশ্রম থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আরাম খোঁজে, উটওয়ালারা মদ আর মেয়ের খোঁজে ছুটে পালায়। পথের শ্রমকে জয় করার দুর্বার আবেগ নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে যাত্রা শুরু হলো। দুর্গম পথ-পরিক্রমা শেষ করে তীর্থস্থানে পৌঁছানো গেল, কিন্তু মন সেখানে তিষ্ঠোতে চায় না, ফিরে আসতে চায় অভ্যস্ত স্থানে, পূর্বেকার জীবনধারণে। তীর্থে এসে দেখা গেল—পুরানো যা-কিছু, যা-কিছু জীর্ণ ও অসত্য,—তার যেন মৃত্যু ঘটেছে, নবীন জন্ম নিচ্ছে, নতুন প্রত্যয় এবং আশা পুরানোকে সরিয়ে নিজের স্থান করে নিচ্ছে।—

কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড় কঠোর,

দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।

তারা ফিরে এল পুরানো সেই জীবনযাত্রায়, ফিরে এল আপন-আপন দেশে। ফিরে কিন্তু দেখলে যে সেই পুরানো বিধিবিধানে তেমন আরাম নেই, এবং দুর্গম পথের ওই কঠিন শ্রান্ত জীবনই বেশী কাম্য, ঐ তীর্থ-যাত্রার মৃত্যুকল্প বিপদসঙ্কুল জীবনই বরং শ্রেয়।

এই কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়, তাই মনে হয় তিনি এটির অনুবাদ করেন। জীর্ণ সংস্কারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন জীবনধারার প্রতি আগ্রহ—এবং সেই নবীনতাকে বরণ করার

জন্য ক্লেশ স্বীকার এমন কি মৃত্যুপণেও সেই নবীন আদর্শকে গ্রহণ কবার ব্রত নেওয়া—রবীন্দ্রকাব্যেব একটি প্রধান কথা। এলিয়টেব এই কবিতাতেও সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে। পথেব শ্রম অপেক্ষা ঘরোয়া আরামের জীবন কাম্য নয়। পুবাতন পদ্ধতিতে নিশ্চিন্ত আবামেব শান্ত জীবন অপেক্ষা লক্ষ্যপথে পৌঁছুবার উদ্দেশ্যে মৃত্যু-ঘেঁষা পথের বিপদ অনেক বাঞ্ছনীয়। স্থির হয়ে আবামে বসে থাকাব চেয়ে বিপদেব ঝুঁকি নিয়ে চলা অনেক বেশী কাম্য। রবীন্দ্রনাথেব কবিতাতেও আমবা এই সুব লক্ষ্য কবি।✓

'চিবরূপের বাণী' কবিতাটি ববীন্দ্রনাথেব দার্শনিক মননেব কাব্যময় প্রকাশ। যদিও এটি 'রূপবাণী' সিনেমাব উদ্বোধন উপলক্ষে বচিত, তথাপি এই কবিতায় সিনেমার কোনো কথা নেই, এমনকি লঘু আনন্দ-লাভেব কোনো ব্যাপাবই নেই এতে। ববীন্দ্রনাথেব দার্শনিক চিন্তাব একটি প্রকাশ এই কবিতায় রূপলাভ কবেছে, এবং কবি রূপকেব আড়ালে সেই দার্শনিক তত্ত্বেব অবতারণা কবেছেন।

আমবা রূপকে দেখি কোথায়? নিশ্চয়ই কোনো বস্তুকে অবলম্বন কবে রূপ থাকে। নীলাকাশের সৌন্দর্য, সমুদ্রেব শান্ত সমাহিত মহিমা, পাখির ডানাব ও বঙেব বৈচিত্র্য, বৃক্ষলতাব শ্যাম সমাবোহ—এইগুলি বস্তু এবং এই বস্তুনিচয়েব মধ্যেই বাসা বেঁধে বয়েছে রূপ। সুতরাং রূপ কোনো-না-কোনো আধারকে আশ্রয় করে থাকে। তাই রূপ হলো আধেয়—আব যাব মধ্যে রূপেব স্থিতি—তা হলো আধাব।

এখন কথা হচ্ছে কোন্‌টা সত্য—রূপ, না রূপ যে বস্তুকে আশ্রয় কবে আছে সেই বস্তু? আধেয় না আধাব? জড়বাদী দার্শনিক বলেন আধারই সত্য, কাবণ আধার না থাকলে আধেয়েব অস্তিত্ব কোথায়? আধার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আধেয়েবও অস্তিত্ব ঘুচে যায়। কিন্তু তাই কি? ভাববাদীর চিন্তালোকে আধেয় নিরপেক্ষভাবে কি বিরাজ করে না? স্থূল বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে কি সত্যিই সৌন্দর্যের অস্তিত্ব? না স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্ম বলে কোনো জিনিসের ধ্যান বা ধারণা আমরা করতে পারি?

বস্তুর সঙ্গে বস্তুর অতীত কোনো সৌন্দর্যসত্তা কি আমাদের মনে বাসা বাঁধে না ? স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্ম কি জড়িয়ে থাকে না ?

রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী কবি ; 'পুনশ্চ' তাঁর পরিণত বয়সের রচনা, তখন তিনি দার্শনিক। সেই দার্শনিক কবি 'চিররূপের বাণী' কবিতায় এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি জড়বাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধারের সত্যতা স্বীকাব করলেও আধারের সঙ্গেই আধেয়ের একমাত্র যোগ, আধেয়ের নিরপেক্ষ সত্যতা নেই—এরকম বিশ্বাস করেন না। সমগ্র সৃষ্টিলোকের দিকে তাকিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মের মিলন ঘটেছে। স্থূল মোটাভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে, আর সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মাধ্যমে রসিকের কাছে শুধু অভিব্যক্ত হচ্ছে। তাই একই বস্তু জড়বাদীর কাছে স্থূলভাবে পদার্থপিণ্ডরূপে ধরা পড়ে, আর রসিক ভাববাদীর কাছে বস্তুর অতীত কোনো সৌন্দর্যের কল্পরেখা ব্যঞ্জনা হিসেবে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাই সহজেই রূপের পদ্মে অরূপ-মধু পান করতে পারেন। বস্তুর মধ্যে রূপের এই ব্যঞ্জনা তাই ভাববাদীর কাছে একান্ত সত্য, বস্তুবাদীর মতো তিনি কখনোই ঘোষণা করতে পারেন না যে বস্তুর বিনাশে সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই দেহাবসানে সব কিছুর শেষ হলো এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, দেহ আধার কিন্তু প্রাণ এবং মন হচ্ছে আধেয়। কণ্ঠ আধার কিন্তু স্বর আধেয়। তাই দেহের বিনাশে প্রাণমনের অভিব্যক্তির শেষ একান্তভাবে সত্য নয় ; কণ্ঠযন্ত্র লয়প্রাপ্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে সুরেরও মৃত্যু ঘটে—একথা ঠিক নয়। 'চিররূপের বাণী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি রূপকের ছলে বলেছেন। দেহের মাধ্যমেই রূপ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, কিন্তু তাই বলে দেহের অবসানে রূপের সার্বিক মৃত্যু কি ঘটে থাকে ? বস্তু থেকে কবি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ পান এবং তা তিনি বস্তুকেন্দ্রিকভাবে পেলেও নিরপেক্ষ সত্য হিসেবেই তা পান, তাই কবি সেগুলির মূল্যায়ন করেছেন চিরন্তন বলে। কবির কাছে সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত থাকে বটে, কিন্তু সত্য হিসেবেও থাকে। তাই দেহের ধ্বংস

হলেও রূপ থাকে, কণ্ঠের নাশ হলেও সুর থাকে।

কবি গোড়াতে রূপের চিরন্তনতা প্রমাণ করার জন্যে দেহ এবং দেহাতীত প্রাণমনের কথোপকথনের মাধ্যমে রূপের জয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পরে কণ্ঠযন্ত্র এবং কণ্ঠাতীত সুরের কথাবার্তার দ্বারা সুরের তথা বাণীর জয় ঘোষণা করেছেন। এইভাবেই কবি দেখালেন—

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

'শুচি' কবিতাটি অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এখানে মানব-প্রেমের এক মহিমময় মন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে। সকল মানুষই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, সেদিক থেকে সকলেই সমান। কিন্তু সেই সত্য বিস্মৃত হয়ে মানুষ নানা শাসনের চোখরাঙানিতে বিভেদমূলক সমাজ তৈরি করে কাউকে ছোট, কাউকে বড়, কাউকে বা অশুচি বলে চিহ্নিত করেছে। এর দ্বারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি অমর্যাদা দেখানো হয়। এতে মানুষের অন্তর পাপে পূর্ণ হয়ে যায়।

রামানন্দজীর মতো নিষ্ঠাবান্ সাধকও এই পাপ থেকে মুক্ত নন। মনে হয় এই রামানন্দই দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপূজক সাধক এবং প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, এবং 'রামাত' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এ রকম জনশ্রুতি আছে যে কবীর এঁর শিষ্য। এঁর রবিদাস, সেনা, ধন্না, পীপা প্রভৃতি বারোজন শিষ্য ছিলেন।

রামানন্দজীর মনে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার ছিল তীব্র, তিনি নিষ্ঠাবান্ সাধক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সমস্ত মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে একান্ত করে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন নি। তাঁর মনে মানবতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল না—তাই তিনি অন্তরে ঈশ্বরের দয়ার স্পর্শ পান নি—

তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি। বর্ণ ধর্মের কুসংস্কারে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন—তাই ঈশ্বরের করুণা লোকে প্রবেশ তাঁর কাছে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

সহসা তিনি অনুভব করলেন—বর্ণভেদের জ্ঞান পাপ এবং তা লোপ না করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। তখন তিনি শ্মশানচারী চণ্ডাল এবং অস্পৃশ্য মুসলমানকে আলিঙ্গন দান করে বুকে টেনে নিলেন—তাঁদের বরণ করে, তাঁদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে তিনি শুচি হলেন, তাঁর অন্তর শুদ্ধ হলো।)

এই কবিতাটি ১৯৩২ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা। এই সময়টির একটু ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে; 'শুচি' কবিতা-রচনার মূলে সেই তাৎপর্যটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৯৩২ সালে বিলাতে দ্বিতীয়বার 'গোলটেবিল' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড—এবং তিনি ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি উপহার দেন। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির বিরুদ্ধে দেশে প্রবল বিক্ষোভ সুরু হয়, মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে কারারুদ্ধ, সেখানে তিনি এই নীতির প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি কিছুটা সংশোধিত হলো। মহাত্মাজী তখন হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করেন—এবং বর্ণভেদের বিরুদ্ধে দেশকে সচেতন হবার নির্দেশ দেন।

ঠিক এই সময় কি এর সামান্য কিছু পরে দক্ষিণ ভারতের কোচিন রাজ্যে কেলাপ্পন নামে জননেতা সকল হিন্দুর কাছে—বর্ণহিন্দু এবং অস্পৃশ্য—সকলের কাছেই দেবতার মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে—এই বলে তীব্র এক আন্দোলন শুরু করলেন। শুধু আন্দোলন নয়, তিনিও আমৃত্যু অনশন শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কোচিনের মহারাজকে জননেতা কেলাপ্পনের দাবি মেনে নেবার জন্যে এক পত্র লেখেন। সেই সময়ই এই 'শুচি' কবিতাটি লেখা হয়।)

অহঙ্কার আমাদের সত্যবোধকে আচ্ছন্ন করে, সুন্দরকে আমাদের কাছ

থেকে সরিয়ে নেয়, ঈশ্বরের স্পর্শলাভ কবার পথে বাধার সৃষ্টি কবে, অথচ আমরা অহঙ্কারমত্ত হয়ে প্রেম এবং হৃদয়ের অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রাখি। এব চেয়ে মূঢ়তা আব কি হতে পাবে? অহঙ্কাব যদি মনে বাসা বাঁধে—তবে আমাদেব দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, আমরা হৃদয়বোধকে উপলব্ধি করতে পাবি না। আব যদি হৃদয়ানুভবের দ্বারা কাউকে ধরতে পারি—তবে সেই পাওয়া পবম-পাওয়া হয়। হৃদয়েব মাধ্যমে যাকে পাই, তাকে নিবিড় কবে পাই, আনন্দের মধ্যে পাই, আর অহঙ্কারেব মধ্যে যাকে ধবি, তাকে বাইবে থেকে ধবি, হৃদয়বৃত্তিব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক থাকে না।

'রঙরেজিনি' কবিতাব মূল কথাই হলো এই। যদিও একটি কাহিনীব মধ্যে দিয়ে কবি উপবোক্ত সত্য প্রকাশ কবেছেন, তবু কাহিনী এখানে প্রাধান্য লাভ কবে নি। শংকবলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তকে তিনি অক্ষতকপাল, বিপক্ষীয় পণ্ডিতকে যুক্তিব জালে সদাই ঘায়েল করে থাকেন। সুদূব দাক্ষিণাত্য থেকে নৈয়ায়িক পণ্ডিত এসেছেন—বাজ-বাড়িতে তাই শংকবলালেব ডাক পড়েছে তক কবতে। শংকবলাল সেই আসন গ্রহণ কবে দেখলেন যে তাব পাগড়ি মলিন ও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। সেটি বঙ কবতে তিনি জসীম বঙরেজিব কাছে দিলেন। শংকবলালেব পাগড়িব এক কোণে লেখা ছিল 'তোমাব শ্রীপদ মোব ললাটে বিবাজে'। (তাব অহঙ্কাবই তাঁকে ঐ বিশ্বাস যুগিয়েছিল, পাগড়িতে তাই ঐ অহঙ্কাবেবই স্বীকৃতি, হৃদয়ে দেবতাব অস্তিত্ব উপলব্ধি না কবে কপালে—অর্থাৎ বাইবে তাঁব অধিষ্ঠান ভেবে নেওয়াব মধ্যে আন্তবিকতা নেই, শুধু অহঙ্কাবই প্রকাশিত)। জসীমের মেয়ে আমিনা পিতাব কাজে সাহায্য করে, বঙ বাটে, বঙেব বাটি যুগিয়ে দেয়। আমিনা পাগড়ি ধুতে গিয়ে কোণেব ঐ লেখাটি দেখলো। আমিনা তখন

বসে বসে ভাবল অনেক ক্ষণ,

ঘুঘু ডাকতে লাগলো আমেব ডালে।

রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে

আর-এক চরণ লিখে দিল—

'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে।'

দুদিন পরে শংকরলাল পাগড়িতে কার হাতের লেখা জিজ্ঞাসা করতে জসীমের কাছে এলেন। জসীম তো ভয়েই কাতর, সে সেলাম করে বললে— আমার অবুঝ মেয়ের এই ছেলেমানুষি পণ্ডিতজী। শংকরলাল এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন হৃদয় দিয়ে না পাওয়ার ব্যাপারটা কি। অহঙ্কারের মধ্যে দিয়ে তো ঈশ্বরের চরণকে কপালে ধরতে পারা যায়, কিন্তু তা তো পাওয়া নয়, ললাটে শ্রীপদ বিরাজ করলে হৃদয়ের মধ্যে তো তার স্পর্শ পাওয়া যায় না। শংকরলালের কাছে সহসা সত্যদৃষ্টির এই আবরণটা উন্মোচিত হলো, তিনি স্বীকার করলেন—

'রঙরেজিনি,

অহঙ্কারের-পাকে-ঘেরা ললাট থেকে

নামিয়ে এনেছ

শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে

তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।

রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল—

আর পাব না খুঁজে।'

শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানের সাধনা অহঙ্কারবোধকেই লালন করেছে, জ্ঞানের মাধ্যমে তর্কের দ্বারা জিনিসের বাইরেটা অধিকার করা যায়, কিন্তু হৃদয়-মন মেলে দিয়ে খোলা চোখে জিনিসের প্রাণকে ধরা যায়, তার স্পর্শ মেলে। শংকরলালের এই শিক্ষা হলো। সত্য ধরা দেয় শাস্ত্র বা জ্ঞানের পথে নয়, সহজপ্রেমের পথে, হৃদয়ের মাধ্যমে।

অস্পৃশ্য রঙরেজিনি আমিনার কাছে দিগ্বিজয়ী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শংকরলালের এই ধরা দেওয়ার কাহিনীতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এখানেও 'শুচি' কবিতার মতো অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সরল, শাস্ত্রজ্ঞানানভিজ্ঞ এক অস্পৃশ্য মেয়ের কাছে খ্যাতিমান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শংকরলাল

তাঁর আভিজাত্যে বিসর্জন দিয়ে ধরা দিলেন। অক্ষতকপাল বলে যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের অভিমান উত্তুঙ্গ ছিল, হৃদয়ের দৈন্যে যিনি অপূর্ণ— তাঁকে এই সত্যটুকু এক অস্পৃশ্য অশিক্ষিত মেয়ের কাছে শিখতে হলো। কাহিনীর চমৎকারিত্বই হলো এখানে।

'শুচি' কবিতার কিছুদিন পরেই তিনি 'মুক্তি' কবিতাটি রচনা করেন। স্বার্থপর দীন জীবনযাপন শুধু গর্হিত নয়, নিজেকে খর্বিত করে পঙ্গু করে একেবারে আত্মলগ্ন থাকতে হয়, সে জীবনে না থাকে আনন্দ, না কোনো প্রীতির প্রকাশ। শুধু অহংবোধ মানুষকে তখন মূঢ় করে দেয়। অহঙ্কার এবং আভিজাত্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার নামই মুক্তি। স্বার্থলীন মূঢ় জীবনযাপনের গ্লানিময় গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার নামই মুক্তি। আলোচ্য 'মুক্তি' কবিতাতেও তাই দেখি যে বাজিরাও পেশোয়ার মুক্তি রাজসিংহাসনের গৌরবের মধ্যে আবদ্ধ থাকলো না, পথের মধ্যে সেই মুক্তি উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

মানুষ ঈশ্বরকে পাবার জন্যে সর্বদা নানা রকমে চেষ্টা করছে, নানা পথে ও নানা মতে সাধনা করে যাচ্ছে। কেউ বা মন্দির বানাচ্ছে, ধর্মের প্রমত্ত আকুলতায়, সোচ্চারে ভক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। অহঙ্কারের তাড়নায় সোনার দেববিগ্রহ বানাচ্ছে। এইভাবে দেব-মন্দির নির্মাণে বা দেববিগ্রহস্থাপনে ভক্তিসাধনার কিংবা দেবপূজার গৌরব বাড়ে, কিন্তু মোক্ষলাভ ঘটে না, এবং ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, এবং সকলের আরাধ্য বস্তু। তিনি যেমন ধনীর তেমনই দরিদ্রের। তিনি যেমন স্বর্ণরেণুতে বিরাজিত, তেমনি ধূলি-কণাতেও অধিষ্ঠিত। যদি সোনাদানায় বা হীরামুক্তাতেই শুধু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ঘটে,—তবে মৃন্ময় মূর্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব সম্ভব নয়। যদি স্বর্ণবিগ্রহেই শুধু দেবতার আবাহন ঘটে, তবে দেবতার কাছ থেকে গরীবদের সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু দেবতা যে সকলেরই—এই সত্য-বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হলে কখনোই দেবতার করুণা পাওয়া যায় না। সকলেই তাঁর কাছে যেতে পারে—তিনি সকলেরই স্পৃশ্য।

সকলেই তাঁকে হৃদয়ের ভক্তি জানিয়ে পূজা করতে পারে। তিনি সকলেরই আরাধ্য। মন্দির নির্মাণ করে যদি কাউকে সেখানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়—তবে তা বাজবে। 'শুচি' কবিতার সুরের সঙ্গে 'মুক্তি' কবিতার মিল এখানেই।

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক—সেজন্য উৎসব শুরু হয়েছে। কনক-মন্দিরে সোনার সিংহাসনে দেবতার অধিষ্ঠান, সেই দেবতার কাছে গেঁয়ো অমূল্য কীর্তনিয়ার প্রবেশাধিকার ঘটে নি, সে তাই মন্দিরের বাইরে থেকে একতারা বাজিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করে—

'প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে?
তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে ব'লে।'

বাজিরাও পেশোয়া সেই গান শুনতে পেলেন। বাইরের পূজা যে যথার্থ পূজা নয়,—তা যেন বোঝা গেল। কীর্তনিয়ার গানের মধ্যে স্পষ্টতর হচ্ছে যে পরম প্রেয়কে পেতে গেলে বিরহীর অন্তর বেদনা নিয়ে, সাধনা নিয়ে অভিসার করা দরকার। ভক্তকে বিরহীর মতো সাধনার পথে এগোতে হয়। ঈশ্বর হচ্ছেন প্রেয়, ভক্ত তাই বিরহী। কীর্তনিয়ার গান শুনছেন বাজিরাও পেশোয়া,—

'তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল-দেওয়া ঘরের থেকে।
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে।
ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয়-মাঝে।
থাক্‌গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দীশালায়
অহংকারের কাঁটার-বেড়া-ঘেরা।'

রাত যখন পোহালো, তখন পুরুত এল তীর্থবারি নিয়ে, তোরণে

রাজলো বিভাস ললিত রাগ, অভিষেকের স্নান হবে। অর্থাৎ দেবতার মর্যাদায় মানুষকে সাজিয়ে লোকজীবন থেকে বিচ্যুত করলে মানুষ অবতার হয়ে দাঁড়ায়। রাজিরাও পেশোয়া সেই সত্য উপলব্ধি করেছেন, তিনি ভক্ত পথিকরূপে বিরহীর মন নিয়ে ঈশ্বরের সাধনার পথে বের হয়েছেন। ঐশ্বর্য ও অহংকারের বেড়াজাল থেকে তিনি মুক্ত হলেন, যথার্থ মুক্তিলাভ ঘটলো তাঁর।

অস্পৃশ্যতা আন্দোলন সম্পর্কিত আরেকটি কবিতা হলো 'প্রেমের সোনা'। কবি প্রথমে যখন এই কবিতাটি লেখেন—তখন এটির নাম ছিল 'প্রেমের সাধনা'। পরে তিনি এর নাম বদলে দেন। সংস্কার এবং আভিজাত্যের বেড়াজালে বাঁধা থাকলেই ধর্ম বা দেবভক্তিকে রক্ষা করা যায়—আর সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, ধর্ম নষ্ট হবে, এ বোধ ত' ভাল নয়, সুস্থও নয়। জাতিতে জাতিতে যে ভেদ—তা কৃত্রিম, মানুষ তাকে তৈরি করেছে, ঈশ্বরের প্রেমের সীমানা থেকে নিজেকে বিসর্জিত করেই এ বিভেদ রচনা করেছে। যিনি অন্তরে ঈশ্বরের প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারেন—তিনি মানুষে মানুষে কোনো ভেদ মানেন না। রামানন্দ প্রভুর অন্তরে যখন ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধ হয়েছে—তখন তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকে নি। চিতোরের রানী শ্রীমতী ঝালির অন্তরে কোনো সংস্কারের বড়াই ছিল না, তাই যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিককে গুরু বলতে তাঁর বাঁধে নি। রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত শুধু আচার বিচারের হাজার গ্রন্থি বেঁধে জীবনচর্যাকে ভক্তিসাধনাকে আবদ্ধ করে রাখেন। চামার রবিদাস রাজপথে ঝাঁট দেয়, সকলে তাকে অস্পৃশ্য ভেবে সরে দাঁড়ায়। গুরু রামানন্দ স্নান সেরে যাচ্ছিলেন দেবালয়ের পথে—দূর থেকে রবিদাস তাঁকে প্রণাম জানালো, রামানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—সে কে; রামানন্দ উত্তর পেলেন—

'আমি, শুকনো ধুলো—
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,

ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙ-বেরঙের ফুলে।'

এই কথা শুনে রামানন্দ তৎক্ষণাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এই ভাবে চিতোরের রানী ঝালি রবিদাস চামারের কাছে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন। রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত স্মৃতিশিরোমণি রানীকে ধিক্কার জানালেন:

'ধিক্, মহারানী, ধিক্।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাট দেয় ধুলো—
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু ব'লে।
ব্রাহ্মণের হেট হল মাথা এ রাজ্যে তোমার।'

রানী তখন সত্য কথাটি ব্যক্ত করলেন—সংস্কারের বাঁধনে এবং আচারের বেড়াজালে প্রেমের সোনাকে বেঁধে রাখলে সে থাকে না, কখন খসে পড়ে, সেই সোনা আমার ধুলোমাখা গুরু ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। রানী আরো বললেন—

'...অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর,
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনি
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।'

কবিতাটির একটি ইংরেজী তর্জমা করে কবি যারবেদা জেলে কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর কাছে এটি পাঠান—মহাত্মাজী তখন সেখানে অনশন ব্রত পালন করছিলেন—হরিজন আন্দোলনে কয়েকজন কর্মীর দুর্বলতার কথা শুনে।

'স্নানসমাপন' কবিতাটিও সামাজিক অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত। শুচি, মুক্তি, প্রেমের সোনা প্রভৃতি কবিতাগুলির যা বক্তব্য, এই কবিতাটিরও ঠিক তাই বক্তব্য। সকল মানুষকে সমানভাবে ভালবাসতে না পারলে

ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। বৃত্তি বিচার করে মানুষকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে ঈশ্বরের বিধানকেই অপমান করা হয়। উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের ও নীচ বৃত্তির মানুষকে ঘৃণা করে তাকে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এতে ঈশ্বরের নিয়মকেই লঙ্ঘন করা হয়। গুরু রামানন্দ সেই সত্যটি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন—তাই তাঁর কাছে ভাজন মুচি আর অস্পৃশ্য নয়।

'স্নান সমাপনে'র কাহিনীর মধ্যেই এই সত্য ব্যক্ত হয়েছে। সকালে গুরু রামানন্দ গঙ্গায় স্নানের জন্যে জলে নেমে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছেন—

'—হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।'

সকাল প্রায় বয়ে যেতে চললো, কিন্তু রামানন্দের মনে দেবতার প্রসন্ন করুণা বর্ষিত হয় নি। তাঁর তনু শুচি হলো না, গঙ্গা যেন হৃদয় থেকে অনেক দূরে সরে রইলো। তখন গুরু রামানন্দ জল ছেড়ে উঠলেন, বনঝাউ ভেঙে গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্যে দিয়ে চললেন—অস্পৃশ্যদের গ্রামের দিকে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো- 'কোথায় যাও প্রভু—ওদিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।' গুরু বললেন, 'চলেছি স্নান-সমাপনের পথে।'

গুরু একেবারে ভাজন মুচির কুটীরে গিয়ে হাজির। শিষ্য ভ্রূকুটি করে গ্রামের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভাজন মুচি সাবধানে স্পর্শ বাঁচিয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, গুরু তাকে বুকে তুলে নিলেন। ভাজন কুণ্ঠিত হয়ে বললে—

'কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।'

রামানন্দ তখন বললেন—গঙ্গা স্নানে গিয়েছিলাম তোমাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে, কিন্তু মন আমার ধৌত হয় নি। এতক্ষণে তোমাকে বুকে

নেবার পর দেহে উপলব্ধি করছি বিশ্বপাবনধারা। সূর্যের জ্যোতিও যেন ম্লান হয়েছিল, এতক্ষণে তাঁর দর্শন পাওয়া গেল,—এবার থেকে দেবের প্রসন্নতা মনকে মহীয়ান করে তুলবে। মন্দিরে আর যেতে হবে না।

'প্রথম পূজা' কবিতাটির সুরও আগের কবিতাগুলির মতো—অস্পৃশ্যতার পাপবিমোচনের উদ্দেশ্যেই এটি লিখিত। তবে আগের কবিতাগুলির তুলনায় এই কবিতাটির গঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 'প্রথম পূজা'য় একটি পরিপাটি কাহিনী আছে--কাহিনীটি অবশ্য অস্পৃশ্যতা যে সামাজিক অপরাধ এবং মানবতা-বিরোধী—সেই আদর্শই প্রচার করছে। কবি এর আগে কাহিনীমূলক অনেক কাব্য লিখেছেন। 'কথা' গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য বলে মনে করি, কিন্তু কথার অন্তর্গত কবিতাগুলিতে কাহিনী আছে ঠিকই, তবে গল্প সেখানে সর্বস্ব হয় নি গীতিকাব্যের রসই সেখানে প্রাধান্যলাভ করেছে। কিন্তু 'পুনশ্চে'র কাহিনীমূলক কবিতাগুলির ঘটনাসবস্বতা বেশী। 'পুনশ্চে'র কাহিনীধর্মী কবিতাগুলিতে অনেক চিত্রনির্মিতি আছে, সেই চিত্রগুলি 'কথা'র পদ্য-কাব্যের মতো কাব্যিক সুষমায় প্রদীপ্ত নয়, কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নেই, বাইরের সৌন্দর্য-বস্তু হিসেবে এখানকার চিত্রগুলির সৌন্দর্য আহরণ করতে হবে। 'প্রথম পূজা'য় এরকম অনেক চিত্রের সমাবেশ আমরা দেখতে পাবো। উৎসবের আয়োজনের যে উল্লাস—তার সীমাহীনতার বর্ণনা অপরূপ চিত্রধর্মিত্বের মাধ্যমে উপ-স্থাপিত হয়েছে।

কবিতাটির বিষয়বস্তু ঈষৎ নাটকীয়। জনশ্রুতি হলো যে সুপ্রাচীন ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরটি স্বয়ং বিশ্বকর্মা গড়ে থাকবেন কোন্ মান্ধাতার আমলে, হনুমান এর পাথর বয়ে এনে থাকবে। আগে এটি ছিল কিরাতদের মন্দির—কিরাত-দেবতারই পূজা-অর্চনা হতো এখানে। কালক্রমে ক্ষত্রিয়ের দ্বারা কিরাতেরা বিজিত হলো, মন্দিরের পূজাপদ্ধতি গেল বদলে, কিরাত হলো অস্পৃশ্য ; এই মন্দিরের প্রবেশাধিকার তার

লুপ্ত হয়ে গেল।

ভক্ত কিরাত নদীর পুব পারে সমাজের বাইরে থাকে, আজ তার মন্দির নেই কিন্তু গান আছে। সে ভক্ত, সে শিল্পী।

সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়,
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।

দূর থেকে সে ত্রিলোকেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানায়।

কার্তিক পূর্ণিমায় পূজার উৎসব, স্বয়ং মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে আসবেন, তাঁর আগমন-পথের দুধারে সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা, মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব। মেলা বসেছে—চারিদিকে অফুরন্ত উল্লাস, জমকালো পোশাকে ঘোড়ায় চড়ে রাজপ্রহরী তদারকি করছে, রাজ-অমাত্য হাতির ওপর হাওদায় বসেছেন, কিংখাবে ঢাকা পাল্কীতে বড়-লোকের গিন্নী। নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা—নানাধরনের সন্ন্যাসীরা এসে ভিড় করেছে। মাঝে মাঝে চারিদিকে চীৎকারধ্বনি উঠছে—জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।

শুক্ল ত্রয়োদশীর রাতে প্রকৃতির রুদ্ররোষ দেখা গেল। প্রচণ্ড ভূমিকম্প ঘটলো, জ্যোৎস্না ঝাপসা হলো, বাতাস রুদ্ধ, গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট। কুকুর আর্তনাদ করছে, ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠছে।

হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে,
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু গুরু গুরু গুরু!

মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে, প্রচণ্ড দুর্যোগে লোক দিশাহারা হয়ে পড়লো, মাটি ফেটে গরম জল, ধোঁওয়া উঠতে লাগলো, মন্দিরের চূড়োয় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা প্রলয়ের ঘণ্টার মতো বাজতে লাগলো যেন!

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌বিদিক যখন শোকার্ত তখন রাজ-

সৈনিকদল মন্দির ঘিরে-দাঁড়ালো, পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে। মন্দিরের পাঁচিল ভেঙে গেছে, দেবতার বেদীর ওপর ছাদ ভেঙে পড়েছে। পণ্ডিতদের পরামর্শে রাজা মন্দির সংস্কারের হুকুম দিলেন। কিরাত ছাড়া কেউ পাথরের কাজ করতে জানে না, তাই রাজা কিরাত দলপতি মাধবকে ডেকে আনালেন। মাধব স্পর্শ বাঁচিয়ে এক মুঠো কুন্দ ফুল দিয়ে রাজাকে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।'

'আমাদের 'পরে দেবতার এ কৃপা'

এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।

নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই—

দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?'

মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।

যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।'

মন্দিরের বাইরে কিরাতদল কাজ করে, আর মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব, তার চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা, দিনরাত সে ধ্যান করে, গান করে আর কাজ করে চলে। মন্ত্রী এসে তাগাদা জানায়, মাধব বলে—'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা, / আমি তো উপলক্ষ।' অমাবস্যার পর আবার শুক্লপক্ষ এল, পণ্ডিত জানালে একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ। অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা বলে, পাথর যেন সাড়া দিতে থাকে। প্রহরী পাহারা দেয়—পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে। ক্রমে শুক্লা একাদশীর রাত এল।

মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—

'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে

মাধবের কাজ শেষ হল আজ।

লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'

প্রহরী গেল রাজাকে খবর দিতে। মাধব চোখের বাঁধন খুলে ফেললো, হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে দেবতার সামনে বসলো, তার দু-চোখে

জল। দেবতার সঙ্গে ভক্তের দেখা হলো—হাজার বছরের ক্ষুধিত সেই দেখা যেন সার্থক হলো।

বাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।

তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।

বাজাব তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হলো সেই মাথা।

দেবতাব পায়ে এই প্রথম পূজা,

এই শেষ প্রণাম।

এইখানেই কবিতাটিব সমাপ্তি। মাধবেব এই নাটকীয় অথচ কাব্যময় আত্মদানেব সঙ্গে/সঙ্গেই কবিতাটি শেষ হয়েছে। অস্পৃশ্য মাধব বিগ্রহকে দেখেছে—এই অপবাধে মাধবেব প্রাণ গেল। সংস্কাবেব বেড়াজালে জ্ঞানান্ধ মানুষ দেবতাকে নিজেব কবে ধরে বাখে, তাদেব ধ্যানে দেবতাব রূপ ধবা পড়ে না, তাই সংস্কাবেব আনুগত্যকেই এবা পূজা মনে কবে, ধ্যানেব পবিচ্ছন্ন শক্তিতে এবা দেববিগ্রহ গড়তে পাবে না, তাই এবা যথার্থ সাধককে সইতেও পাবে না। চোখ বাধা থাকলেও মাধব নিজেব ধ্যানদৃষ্টিতে দেবমূর্তি বচনা কবেছে,—অন্তবের সাধনাব রূপ দেবতাব বাইবেব রূপে প্রোতভাত হবাব পরই মাধব নয়ন ভবে দেবতাকে দেখেছে—অন্তবেব ধ্যানলগ্ন সত্যদৃষ্টি দিয়ে দেবদর্শন সার্থক হলো, তাই মাধবেব আত্মদানে যথার্থ পূজা অনুষ্ঠিত হলো, এবকম আড়ম্বরশূন্য অথচ প্রাণময় পূজা এই প্রথম, সেই জন্যে কবিতাটিব এই নাম।

'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'অস্থানে' কবিতাটি নিয়ে পাঠকমহলে তেমন হৈচৈ নেই, কিন্তু এই কবিতাটি ববীন্দ্রনাথের এক জীবন-সত্য বহন কবছে। কবিতাটিব বিষয়বস্তু সামান্য—এবং ওই সামান্য বস্তুব মাধ্যমে কবি একটি অসামান্য কথা প্রকাশ কবেছেন। একই লতাবিতানে চামেলি আব মধুমঞ্জরী গাছ গায়ে গায়ে বেড়ে উঠেছে, প্রকৃতির রাজ্যে সৌন্দর্যের পসবা সাজিয়েছে। চামেলি আব মধুমঞ্জবী একই ডালে বেড়ে উঠলেও পবস্পব পবস্পরকে ঈর্ষা কবে নি, প্রাণের আনন্দে তাবা

বিশ্বসৌন্দর্যসভার সভ্য হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু চামেলি তার ক্রমবর্ধমান দেহ নিয়ে বিজলী বাতির লোহার তারে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিলে; চামেলি বুঝতে পারে নি যে ওই লোহার তার ভিন্ন জাতের, মানুষের প্রচণ্ড প্রয়োজনের তাগিদে তার জন্ম, প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকের বাসিন্দা সে নয়। শ্রাবণ-শেষে শরতের আগমনে চামেলি ফুলের মেলা বসে গেল। কিন্তু বিজলী বাতির রক্ষকেরা এসে চামেলির স্পর্ধা দেখে ত' বাঁচে না—লোহার তারে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই অপ্রয়োজনের বিস্তার কেন?

শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়ালো কেন।

তৎক্ষণাৎ সেই বিজলী বাতির অনুচরের দল নিষ্ঠুর আঁকশি নিয়ে কচি কচি চামেলির ফুলে-ভরা ডালগুলি ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল।

এত দিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লিবাতির তারগুলো ঐ জাত আলাদা।

রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনের জগৎ এবং নিষ্প্রয়োজনের জগৎকে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানো প্রজাপতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনের ব্যাপার, কিন্তু আমরা তাকে নিষ্প্রয়োজনের নজির হিসাবে দেখে থাকি। চামেলির লতা ও ফুল নিজেকে ব্যাপ্ত করে প্রকাশিত করে যে প্রাকৃতিক লীলায় মগ্ন হয়—তা কাজের লোকের কাছে—নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। স্থানকালের মাহাত্ম্য না বুঝেই এই পুষ্পলতা অবাধ্যতা প্রকাশ করে ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিষ্প্রয়োজনেরও একটি রাজ্যের সীমানা গড়েছেন। শিল্পীর কাছে নিষ্প্রয়োজনের রস অনস্বীকার্য নয়, সাধনার জগতে লীলাবিলাসের একটা স্থান থাকে। বিশ্বকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণায় চামেলির এই বিস্তৃতি একেবারে বাজে ব্যাপার নয়। বিজলী বাতির

কর্মকঠোর মানুষদের কাছে এই লীলাবিলাসের প্রয়োজন নেই সত্য—কিন্তু বিশ্বসৌন্দর্যের চত্বরে এই নিষ্প্রয়োজনেব আয়োজনে ফাঁকি নেই। চিরকালের শ্রী ও সৌন্দর্যশালায় চামেলির বিস্তারের দরকার আছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে বাস্তব-রূঢ় জীবনে, দৈনন্দিন স্থূল জীবনে লীলাময়ের সৌন্দর্যপ্রকাশের প্রয়োজন নেই, সেখানে সে অনাহূত, অচেনা আগন্তুক, কিন্তু শিল্পীচেতনায় সাধকের ধ্যানে লীলাময়ের লীলার স্পষ্ট পরিচয়কে প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরতে—চামেলির প্রকাশ অসম্ভব রকমে প্রয়োজনীয়। বাস্তব প্রয়োজনের রূপ এক রকম—সেখানে সৌন্দর্যপিপাসু সত্তার স্থান নেই। তাই বিজলীর তারে চামেলির মৃত্যু ঘটেছে। বিজলীর তারে তাই চামেলীর পুষ্পগৌরব প্রকাশের স্থান নয়, অস্থান। নিত্যকালের লীলাবিকাশে চামেলীর স্বতন্ত্র সীমানা—সেখানেই সে সার্থক। প্রয়োজনের এবং নিষ্প্রয়োজনের ক্ষেত্র তাই ভিন্ন—একের কাজ অন্যের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে রবীন্দ্রনাথ 'প্রয়োজন' এবং 'নিষ্প্রয়োজন' শব্দদুটি প্রয়োগ কবেছেন, 'প্রয়োজন' এবং 'অপ্রয়োজন' ব্যবহার করেন নি। প্রয়োজনাতীতকে তিনি 'নিষ্প্রয়োজন' বলেছেন।

'ঘর ছাড়া' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের গৃহবন্ধনের দিক এবং ঘর-ছাড়া বিশ্বমুখী মানুষের ছুটে চলাব দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। গৃহকে আমবা ভালবাসি, বিচিত্র জগতের মধ্যে ঘর আমাদের প্রিয়: সংঘাতময় পৃথিবীর মধ্যে ঘর আমাদের আশ্রয়—একথা ঠিক, কিন্তু ঘরের বাঁধন তা বলে সব নয়। গৃহ-জীবন বৃহত্তর জগৎকে দেখতে শেখায় না, বিশ্বজীবনের আস্বাদ দান করে না। তাই যারা ঘর ছাড়া—তাবাই প্রাত্যহিক জীবনের সুখকে তুচ্ছ করে বহির্জীবনের আনন্দকে পাবার জন্যে ছুটে বের হয়।

'ঘরছাড়া' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এক দেশের মানুষ নিজের ঘর, নিজের স্বদেশ, নিজের ভৌমিক পরিবেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে এল, বিদেশের মানুষের সঙ্গে তার যোগ ঘটলো, মনের যোগ, ধর্মের যোগ,

সংস্কৃতির যোগ—সব রকমের আত্মিক যোগ ঘটলো, বৃহত্তর মানব-সমাজের পক্ষে তা কল্যাণপ্রসূ। ঘর ছাড়া না হলে—তা সম্ভব হয় না। জার্মান থেকে অচেনা মানুষ অন্য দেশে এসে সহজ চালে অল্প আয়াসের মধ্যে দিন কাটিয়ে বন্ধুতা স্থাপন করে সে জগৎ জয় করে যায় নিজের জোরে।

খেলাধূলা হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারই মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।
কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।

ওকে সব মানুষের মধ্যে—সে তার যতই অপরিচিত, অজ্ঞাত হোক—মানুষ বলেই মনে হয়; এর বেশী তার আব কিছু পবিচয় প্রতিভাত হয় না। অর্থাৎ মানুষেব সঙ্গে মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক কথায় মানবতার যোগ ঘটাতে এই ঘরছাড়া মানুষই সহজভাবে সমর্থ।

তার দেশের আর একজন শিল্পীও এসেছে।

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে
যা খুশি তাই ছবি এঁকে এঁকে,
যেখানে তার খুশি।

ওরা দুজনেই লঘুচালে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা পড়ছে না, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চাপে ধরা পড়ছে না, যেন টুকরো শরৎকালের মেঘ। ওরা শিকড়-বাঁধা গাছের মতো নয়, দৈনন্দিন দুঃখ সুখের বেড়াজালে ঘেরা গৃহজীবনে ধরা পড়া নয়, ওরা ঘরছাড়া মানুষ।

ছুটি ওদের সকল দেশে, সকল কালে;
কর্ম ওদের সবখানে;
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।

ঘরছাড়া মানুষেরা মানবমৈত্রী ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ছোট মানব-সংসারে তারা বাঁধা নয় বটে, কিন্তু সমস্ত জনমানবের মধ্যে

সংস্কৃতির সাঁকো তৈরী করার কাজে ব্রতী।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি বাউল মন আছে, সর্বত্র চলতে চায় এমন একটি প্রাণ আছে, 'বলাকা'র যে কবিকে চঞ্চল করেছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন, সেই গতিমান কবিটি স্থায়ীভাবে প্রাত্যহিক সংসার বিছিয়ে বসতে চান না,—তাই কবি ঘরছাড়াদের প্রতি এমন করে দরদী হয়ে উঠেছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী বিশ্বসভায় সার্থক হয়ে উঠবে —তা সম্ভব হবে শুধু এই ঘর-ছাড়াদের জন্যেই।

সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত-সব ঘরছাড়াদের দল।

'ছুটির আয়োজন' কবিতাটি একদিকে যেমন বর্ণনামূলক দীপ্তিতে ভরা, তেমনি 'বিষণ্ণতার একটি [illegible]'। একটু চিত্রধর্মী আমেজে কবি—বালকের, যুবকের এবং অভি[illegible] [illegible] পরিবারের শারদ ছুটিকে অভিনন্দন করার কথা জানালেন, সেই আসন্ন শরতের অনুষ্ঠেয় পূজায় ছাগশিশু বলিদানের ইঙ্গিত দিলেন।

প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ শারদীয় আকাশ বাতাসের বর্ণনায় তার বরাবরের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই কবিতায় তিনি বলছেন যে পুজোর ছুটি কাছে এল প্রকৃতির রূপ রঙের বর্ণনা সুন্দর। ছেলে স্কুলে বসে আছে কিন্তু মাস্টার মশায়ের পড়ানো শুনছে না, মন তার পল্লী প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে, কমলদিঘির ফাটল-ধরা ঘাটে, ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা আতাগাছের কাছে, কিম্বা তিসির ক্ষেতের পরে আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে নদীর ধারে। এই হলো প্রথম চিত্র।

দ্বিতীয় চিত্র যুবকের। ইকনমিক্সের ক্লাশে বসেই মন তার উড়ে চলে কোন্ উপন্যাস কিনবে - তার চিন্তায়, প্রেমিকার জন্যে কেমন শাড়ী কেনা যায়, কিম্বা রোমান্টিক কোন কবিতার বই কেনা যায় সেই ভাবনায়। ছুটির আয়োজনে মন তার ক্লাশের পড়ায় নেই; গল্প

উপন্যাস কাব্যের মধ্যে চলে গেছে। নিজের বিলাসী চটি জুতো কি প্রেমিকার শাড়ির মধ্যে বিচরণ করছে তার মন, যদিও সে চশমা-চোখে মেডেল পাওয়া ছাত্র।

তৃতীয় ছবি অভিজাত একটি পরিবারের। তেতলা বাড়িতে সরু মোটা গলায় আলাপ চলছে—পুজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় এবার—আবু পাহাড়—না মাদুরা, না ড্যালহৌসি কিংবা পুরী, না সেই চিরকেলে চেনা দার্জিলঙে—সে নিয়ে মস্ত আলোচনা।

এই তিনটি চিত্রের মধ্যে ছুটির আয়োজনের আনন্দের দিক বর্ণিত হয়েছে। পল্লীগ্রামের স্কুলে-পড়া একটি ছেলে শারদীয় ছুটির পটভূমিকায় পল্লীপ্রকৃতিকেই মনে করে। নদীর ঘাটে, কিংবা হাটের পথে, আতাগাছের পাকা ফলে, কমলদীঘির জলে ছেলেটির মন ছুটে যায়; কলেজে পড়ুয়ার মন একটু শহুরে হয়ে পড়ে, তাই ছুটির আমেজে সে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে হাঁফ ছাড়তে চায়—হাল আমলে প্রকাশিত রোমান্স পড়তে কাতরতা বোধ করে। অভিজাত পরিবারের লোকেরা ছুটির হাওয়া বইতে শুরু করলে বাইরে যেতে চায়, শরতের আকাশে রোদের রঙে সোনা ধরলেই কোথায় যাওয়া যাবে—তারই তোড়জোড় শুরু করে, ছুটির আয়োজন—তাদের সেই রকমই।

কবি সব শেষে গল্পশিল্পের ঈষৎ কারুণ্যের ফোড়ন দিয়েছেন; কচি কচি ছাগশিশুর দলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পূজামণ্ডপে বলিদানের জন্যে,—

তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।

তারা যে যাচ্ছে জীবনোৎসর্গের আয়োজনে—এতেই কি তারা বুঝেছে যে তাদের শারদীয় ছুটির দিন এসেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন ধারা অসহায় ছাগশিশুর আর্ত কান্নার স্বর কবি উল্লেখ করতেন না, কিন্তু তাঁর মনে বেদনা জেগেছে। শরতের মুখে সহজ সুন্দর হাসি, পল্লীগ্রামের বালক যেমন করে শারদীয় ছুটিকে ভোগ করতে চায় পাড়াগাঁয়ের পরিবেশে—তেমন করে সে ছুটির

সৌরভ ভোগ করছে, কলেজের যুবকটির মনেও ছুটির যথার্থ আরাম উঁকি দিচ্ছে, অভিজাত পরিবারের লোকেরা ছুটির আয়োজনে খুশী। এমন সহজ সুন্দর আবহাওয়ায় শুধু ছাগশিশুর দল অসহায়ভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে তাদের জীবনাবসানের ব্যাপারটা। আনন্দময় পরিবেশে এই বিষণ্ণতার অসঙ্গতিই কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে। তাই ছুটির আয়োজন কবিতাটি করুণ হয়ে উঠেছে।

'মৃত্যু' কবিতাটি তত্ত্বপূর্ণ। পরিণত জীবনে কবি বারংবার মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পান, কিন্তু মৃত্যু যে কি, কি তার রূপ, কি বা স্বরূপ—তা জানার জন্যে তার ব্যাকুলতা জাগে। মৃত্যু জীবনের পরিণাম কিংবা অবসান আনার ব্যাপার—এ কথা বললে মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। এর পর 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রাক্কালে ১৩৪৪ সালের ২১শে ভাদ্র কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন জ্ঞানহারা হয়ে থাকেন, পরে যখন সুস্থ হন—তখন তিনি শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সার নীলরতন সরকারকে যে কবিতাটি লেখেন—তাতে মৃত্যুগুহার অন্ধতামস গহ্বর সম্পর্কে একটু কথা আছে। সেখানে কবি 'অন্ধতামস গহ্বর', 'অচিহ্নিতের পার', 'অরূপলোকের দ্বার' প্রভৃতি বলে মৃত্যুকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এই প্রসঙ্গে 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের 'উৎসর্গ' দ্রষ্টব্য।

'পুনশ্চে'র মৃত্যুতে কবি বলতে চান যে মৃত্যু সম্পর্কে মনে ধারণা করতে তিনি ইচ্ছুক। মৃত্যুর স্বরূপ কি—তা কেউ বলতে পারে না; কেন না মৃত্যুকে জেনে কেউ সেই অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে পারে না। হয়তো মৃত্যুর অনুভব জাগে, কিন্তু সে সাময়িক, তাকে প্রকাশ করা যায় না। জীবন-চেতনায় এই জগতের অস্তিত্ব।

রয়েছে দেশে কালে—
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশানৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত

—তা সবই কবির চৈতন্যকে কেন্দ্র করেই কল্পিত হচ্ছে। চৈতন্যের এই

পারে এক পা, আর অন্য পা রেখার ওধারে বাড়ানো।

সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রেম-প্রীতি—সবই তো থাকবে, শুধু মৃত্যু ব্যক্তিকে সরিয়ে নেবে। আর ব্যক্তির এই অপসারণ চিরসমাপ্তি নয়, ফলে অতীত বিদায় নেয়—অনাগত আসে, অতীত প্রসারিত হয় ভবিষ্যতে। জীবনবোধ এবং ব্যক্তিত্ব দিয়েই তো যা-কিছু মানুষ সৃষ্টি করে। সুতরাং 'আমি নেই' মানে আমার মনে তৈরি হওয়া আমার জগৎও নেই, কবি এ কথা মানতে পারছেন না, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। জীবনের যা-কিছু আছে প্রেম ভালবাসা, প্রীতি বিশ্বাস—সব কিছু জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে না—'নাস্তিত্বপ্রাপ্ত' হবে—এ বড় উদ্ধত ব্যাপার। কবি এই ব্যাপারে ব্যথিত বোধ করছেন।

মৃত্যুর পর কবি আবার নবজীবন ও নবীন ভালবাসা পাবেন—তিনি এই বিশ্বাস ছাড়তে পারছেন না। সবই থাকবে, শুধু তিনি থাকবেন না—এই বিশ্বাস করতে পারছেন না। ধারাবাহিকতা বা সমগ্রতার দিক থেকে মৃত্যু তো প্রতিবাদ নয়!

'মানব পুত্র' বলতে কবি খৃস্টকেই বলেছেন, তিনি মানবতার মূর্তি—তিনিই মানুষের কল্যাণময় পবিত্র চেতনার রূপ, তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ মানবতার সাধকের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করেন—তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ নরই ঈশ্বর। মানুষের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ—তার প্রতিরূপ হলেন খৃস্ট, তাই তাঁকে 'মানবপুত্র' বলা হয়েছে।

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে যীশুখৃস্ট মানুষের পাপের বিরুদ্ধে সেদিন প্রাণদান করেছিলেন, আজো তেমনি ধর্মান্ধতা; পাপ, কলুষচারিতা, মানবতার নামে ব্যাভিচারিতা চলছে। অতীতের মানুষের অন্ধতা আজো অন্য-ভাবে রয়েছে, অতীতের নিষ্ঠুর আঘাতের উপকরণ আজো রয়েছে অন্য চেহারায়। আজো তাই এই অন্ধতা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে কল্যাণকর জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাব প্রয়োজন। পরিশেষের 'প্রশ্ন' কবিতায় কবি তাই বলেছেন—ভগবান্ তুমি যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছো বারে বারে। মানুষের সংসারে মানব-কল্যাণ সাধনের

প্রয়োজন হলেই মৃত্যুঞ্জয় পুরুষেরও আবির্ভাব ঘটে, ঈশ্বর তাঁর দূতকে পাঠান। এই যুগে কল্যাণসাধক মহামানব এসে দেখলেন যে এখানে আয়োজন চলেছে মানবাত্মাকে ধ্বংস করার, ঈশ্বরের নাম দিয়েই ধর্মান্ধতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন ;
বুঝলেন—শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্ম মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে।

তারাই পূজামন্ত্রের সুরে ঘাতককে ডেকে বলছে—'মারো, মারো!' চারিদিকে এই মূঢ় অসৎ অকল্যাণ যখন প্রভাব বিস্তার করে—তখন অসহায় মানুষের আত্মা কেঁদে ওঠে, তার মনে হয় ঈশ্বর বুঝি মানবলোক ত্যাগ করেছেন! মানবপুত্র তাই যন্ত্রণায় বলে ওঠেন—'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করলে!' মানুষের পাপে, মানুষের অশুভ বুদ্ধিতে মানবপ্রেমিক কল্যাণময় পুরুষ আক্ষেপ করেন। আত্মবিসর্জন দিয়ে শুভকে প্রতিষ্ঠা করার দীক্ষা দান করেন!

১৯৩০ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জার্মানি ভ্রমণে যান ; দক্ষিণ জার্মানির মিউনিক শহরে যখন তিনি ছিলেন, তখন সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে 'ওবেরয়ামারগাউ' নামে এক গ্রামে কবির নিমন্ত্রণ আসে একটি Passion play দেখার জন্যে। এখানকার passion অভিনয় খুব বিখ্যাত ; কারণ passion-এ যিনি যীশুখৃস্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—তাঁকে নাকি সুদীর্ঘকাল খৃস্টের সাধনায় সংযত থেকে নিজেকে এই ভূমিকার উপযোগী করে তৈরি করে নিতে হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে যীশুখৃস্টের শেষ জীবনকেই ইংরাজিতে passion

বলে অভিহিত করা হয়। ওবেরয়াম্মারগাউ-এর passion play অভিনয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল, এবং গোটা ইউরোপের লোক এই অভিনয় দেখার জন্যে ভেঙে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন এই অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ আসে—তখন তিনি ওবেরয়াম্মারগাউ-গ্রামে যান এবং সেখানে গিয়ে জার্মান ভাষায় যীশুখৃস্টের জীবনের শেষাংশ অভিনীত হতে দেখেন।

রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখছেন—"রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিন বসিয়া এই অভিনয় দেখিযাছিলেন—যদিও নাটকের ভাষা জারমান। এই ঘটনা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়! মনে হয়, ইহারই প্রভাবে কবি লিখিলেন the child, কিছুকাল পূর্বে জারমেনির বিখ্যাত বড় কোম্পানী কবিকে ফিল্‌মের উপযুক্ত একটা কিছু লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে।"[১৪]

ওবেরয়াম্মারগাউয়ে অনুষ্ঠিত অভিনয় দেখেই কবির মনে যে '(The Child)' রচনা লেখার প্রেরণা আনে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে ১৩৩৭ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত একটি পত্রের মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি যে কবি এই Passion Play দেখে ফিল্মের জন্যে ইংরেজীতে একটি অভিনব নাটক লিখেছেন। তিনি সারা দিন রাত ধরে নতুন রকম টেকনিকে উফা কোম্পানীর ফিল্মের জন্যে The Child নাটকটি ইংরেজিতে লেখেন। এইটিই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে একমাত্র মৌলিক ইংরেজী রচনা।

চরম আদর্শলাভের জন্যে মানুষের যুগ যুগ ধরে যে সাধনা—তারই প্রতীক নিয়ে এই কবিতা। নানা অবস্থা-বিপর্যয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্যে মানুষ আদর্শে পৌছতে পারে না। এই পৃথিবীতে মানুষ স্বার্থ নিয়ে হানাহানি করে, পশুত্বের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে। পশুশক্তি নিয়েই আমরা বড়াই করি। এক সাধু তাদের পাশে থেকে জানালো যে মানুষ এত ছোট নয়, সে মহান্, সে অমৃত-

সন্তান। সকলে তাকে অবিশ্বাস করে, বলে সে প্রতারক। রাত্রের অন্ধকার সরে গেল, সকাল হলো; ভক্ত সাধু তখন বললেন—চলো যাত্রা করি, সার্থকতার পথে যাই।

সকলের শোভাযাত্রা শুরু হলো। ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে সকলে ভেঙে পড়লো এবং মিথ্যাবাদী বলে সাধুকে হত্যা করা হলো। তারপর যাত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে সকলে অনুতপ্ত, বিহ্বলচিত্ত। তখন এক বয়স্ক মানুষ বললে—আমরা যাকে মেরেছি—সেই আমাদের পথ দেখাবে, সে মরে আমাদের মধ্যে অমর হয়ে আছে, সে মৃত্যুঞ্জয়। তরুণেরা খুশিতে এগোতে লাগলো সাহসভরে, অক্লান্ত পরিশ্রমে। তারা অমর জ্যোতির্লোকে যাবে—সেই প্রতিজ্ঞায় তারা অগ্রসর হতে লাগলো। ক্রমে তারা নগররাজ্য পেরিয়ে মন্দ্র ও পুথি-শাসিত দেশ ছাড়িয়ে এক সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে পর্বতের পাদদেশে বনের এক শান্ত গ্রামে ঝরনার ধারে পর্ণকুটিরে এসে মায়ের কোলে এক নবজাত শিশুকে দেখতে পেল। সকলে বললে—জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের

'শিশুতীর্থ' 'বিচিত্রা'য় যে সময় প্রকাশিত হয়—অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের [illegible], ঠিক তার পরের মাসে ঐ 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ 'তীর্থযাত্রী' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন—সেখানেও তিনি এই 'শিশুতীর্থে'র মূল বাণীকে গদ্যরূপ দান করে বলেছেন—আদিকাল থেকে মানবসংসারে যাত্রীরা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে। নানা দেশে নানা কালে। সে তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, সে তীর্থ সেইখানে, পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেছেন—যিনি ঘোর দুর্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েছেন: সম্ভবামি যুগে যুগে। ক্লান্ত আসছে, পীড়িত আসছে, ক্ষুধাতুর আসছে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে; প্রশ্ন করলে, তুমি এসেছ?' মাতা বললেন—'তুমি আমার ধন'। সকলে বললে, 'জয় হোক নবজাতকের।'

এই রূপকের মধ্যে রয়েছে মানুষের চরম আদর্শের জন্যে অভিযান। সেই চরম আদর্শ হলো মানুষের আত্মস্বরূপের দর্শনলাভ, তার অন্তরস্থিত নিত্য-মানবকে উপলব্ধি। কিন্তু পশুশক্তির বিকাশে লোভ, কাম, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানা কলুষ তার অন্তরস্থিত দেবতাকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয়। সে ভুল করে ভাবে পশুশক্তিই বুঝি কাম্য। ক্রমে জ্ঞানী-গুণীর সংস্পর্শে এই মূঢ়তা কেটে যায়। দানবশক্তি মানবতাকে চিরদিন দমিয়ে রাখতে পারে না; সুস্থ ও সত্য মানবতা একদিন পশুশক্তিকে হারিয়ে দিয়ে নিজের জয়পতাকা উড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ চিরন্তন মানব-সত্য পশুশক্তিকে হারিয়ে দিয়ে নিজের জয় ঘোষণা করবেই!

শিশুতীর্থ কবিতাটির মধ্যে এপিক কাব্যের সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। একটি উপমার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি আরো বিস্তৃত সুন্দর বিন্যাসের দ্বারা এপিক সৃষ্টির আবহাওয়া তৈরী করেছেন।

> অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত
> আলোড়িত হতে থাকে—
> ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহা বিদারণের কলরোল!
> ও কি ঘূর্ণতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ!
> ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ!
> এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট
> ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
> যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদ্‌গদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
> তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি
> কুৎসিত জনশ্রুতি,
> অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।

এই রকম বিন্যাসেই কবিতাটি আদ্যন্ত লেখা এবং এখান থেকেই গদ্য কবিতার ভঙ্গীর প্রতি কবির আবার নতুন করে মনোনিবেশ। এটি যখন প্রথম আধুনিক বাংলা কবিতা গ্রন্থে সংকলিত হয়, তখন কবি ঐ

গ্রন্থের সম্পাদকদের লেখেন এই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে তিনি খুশি হয়েছেন।'

'শাপমোচন' কবিতাটি এই নামের যে নৃত্যনাট্য—তারই কথারূপ। এই কবিতাটিব সঙ্গে কবির 'বাজা' শীর্ষক রূপক নাটকটির কিছুটা সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়, তবে 'রাজা' নাটকে আধ্যাত্মিকতাব প্রশ্নটি আলোচিত আর 'শাপমোচন' কবিতায় মানবিক প্রেমেব আদর্শ উন্মোচিত হয়েছে। ভক্তির মাধ্যমে আত্মসমর্পণেব দ্বাবা অরূপকে প্রাণে, অনুভবে, উপলব্ধিতে মূর্তিমান করে গড়া যায়, ভক্তিতেই ঈশ্বর সাধনার চূড়ান্ত কথা—'রাজা' নাটকে এদিকটায় বিশেষ জোব দেওয়া হয়েছে আর 'শাপমোচন' কবিতায় দেখানো হয়েছে মানবিক প্রেমের সার্থকতা কোথায়। প্রেম যদি রূপের মোহ কাটিয়ে ঊর্ধ্বে অন্তরের রসে পুষ্ট হতে পারে—তা সার্থক; তবে এটাই মানবীয় প্রেমসাধনার চূড়ান্ত কথা। এছাড়া 'রাজা' নাটকের কাহিনীতে অভিশাপেব ব্যাপাব নেই,—অথচ 'শাপমোচন' কবিতাটির শুরুই হলো অভিশাপের মাধ্যমে।

'শাপমোচন' কাহিনীনির্ভব কবিতা,—অন্তর্নিহিত ভাবটি হলো মানবীয় প্রেমের সাধনায় রূপমোহ অপেক্ষা আন্তবিকতারই যথার্থ জয়। রূপেব মোহ অপেক্ষা খাঁটি প্রেমই মানুষেব ভালবাসার ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করে, আব মোহমুক্ত প্রেমই রূপেব আবেদনকে সবিয়ে দিয়ে জয়ী হয়,—এই কবিতায় এই কথাটাই সুবিস্তৃত কাহিনীব মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে।

'শাপমোচনে'র কাহিনীটি মোটামুটি এইবকম :

সুরলোকেব সংগীতসভায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী গন্ধর্ব সৌরসেন সেদিন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন—তার প্রেয়সী মধুশ্রী সুমেরু শিখরে গেছে সেজন্য, তাই উর্বশীব নাচের সময় অনবধানবশতঃ তার মৃদঙ্গেব তাল কেটে গেল। দেবতাব অভিশাপ পড়লো তাব ওপব, কুৎসিত দর্শন হয়ে তার জন্ম হবে মর্তো; দেবলোক থেকে তার নির্বাসন। অরুণেশ্বর নাম

নিয়ে গান্ধার রাজগৃহে অত্যন্ত কুশ্রী হয়ে জন্ম নিলেন তিনি। মধুশ্রীও এই বিচ্ছেদ সইতে না পেরে মর্ত্যে আসার অনুমতি ভিক্ষে করলে, সেও কমলিকা নাম নিয়ে মদ্ররাজকুলে জন্ম নিলে।

একদা গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি। তিনি প্রস্তাব করলেন বিবাহের। মদ্ররাজ প্রস্তাবে খুশী হলেন। ফাল্গুনের পুণ্য এক তিথির শুভলগ্নে মহারাজ অরুণেশ্বর প্রেরিত বীণার সঙ্গে রাজকন্যা কমলিকার বিবাহ হলো।

যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।

নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।

কমলিকা বলে, 'প্রভু তোমাকে দেখবার জন্যে

আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'

রাজা বলে,

'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'

অন্ধকারে বীণা বাজে।

অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে

বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।

কমলিকার মনে সেই নৃত্যকলা মোচড় ধরিয়ে দেয়। একদিন রাতের তৃতীয় প্রহরের শেষে কমলিকা রাজাকে বললে—আদেশ করো, আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে দেখি। রাজা নিষেধ করলেন। মহিষী ক্ষুব্ধ হলো।

রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি।

নাগকেশরের বনে নিভৃত সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।

প্রাসাদশিখর থেকে চেয়ে দেখো।'

মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল; বললে, 'চিনব কী করে?'

রাজা বললে, 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো,

সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

মহিষী নাচ দেখে খুশি, বললে—সবই সুন্দর হয়েছে, শুধু একজন রাহুর

অনুচরের মতো কুশ্রী লোক রসভঙ্গ করলে। রাজা একটু থেমে বললে—
'ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান। স্বর্গের করুণা যখন মর্ত্যে নামে—তখন তো শ্যামলরূপেই নামে। সে রূপ তোমাকে মুগ্ধ করে না?'

'না, মহারাজ, না' ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল—

বললে, 'যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভবে উঠত

তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে!'

রাজা বোঝাতে চাইলেন—কুশ্রীর আত্মত্যাগেই সুন্দরেব সার্থকতা। রাণী আশ্চর্য হয়ে জানতে চায় রাজার কেন এই পক্ষপাত অসুন্দরের দিকে!

সকালে দেখা হলো! কমলিকা চমকে উঠলো, 'কী অন্যায়! কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা' বলে ছুটে পালালো। গেল বহুদূরে—অবণ্যে, যেখানে মৃগয়ার জন্যে আছে নির্জন বাজগৃহ। রাত্রে আধঘুমে সে শোনে বীণাধ্বনি, মনে হয় এ সুব তাব চিরচেনা। দুঃখ ও বিরহের পীড়ন শুরু হলো। এই নিপীড়নেব মাধ্যমেই তার মনেব যে দৈন্য প্রেমকে কলুষিত করে—তা দূর হলো।

বাইবের রূপের জন্যে ইন্দ্রিয়াতুব মনেব কামনা-বাসনার তীব্রতা কমে এল, দুঃখ ও বিরহের পীড়নে এই সত্যটুকু ধরা পড়লো যে কামনাজড়ানো ইচ্ছা দিয়ে রূপবানকে পাওয়া যায়, সুন্দরকে পাওয়া যায় না, রূপের মোহ বর্জন করে যখন মন সুন্দবকে আহ্বান জানায়, তখনই সুন্দর এসে হাজির হয়। রানীব মোহ কেটে গেল, রাজার বীণার ধ্বনি লক্ষ্য করে মহিষী এসে থমকে দাঁড়ালো।

রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'

তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূব গুরুগুরু ধ্বনির মতো।

'আমার কিছু ভয় নেই—তোমারই জয় হল'

এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,

ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার!'

প্রেমের ব্যাপারে বাইরের রূপ কিছুই নয়। নরনারীর মধ্যে যেখানে প্রেমের যাথার্থ্য, সেখানে রূপাতুরতা বাধা নয়, অন্তরের নিবিড় বোধই প্রেমিককে জাগ্রত করে ভালবাসায়। অন্তরের মাধুর্যই প্রেমের ভিত্তিভূমি। এখানে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকথাটি সুন্দর করে বলেছেন।

'ছুটি' কবিতাটিতে মিল নেই বটে, কিন্তু এতে যে একটি ছন্দপ্রবাহ আছে—উচ্চকণ্ঠে এটি পাঠ করলেই তা ধরা যাবে। শুধু এটিতে নয়, এর পরের দুটি কবিতাতেও—'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন'—ছন্দের দোলা অনুভব করা যাবে। কবি আজ ছুটি চাইছেন, পরে আমরা 'সেঁজুতি' গ্রন্থে কবি ছুটি চেয়েছেন দেখতে পাবো, সেখানে জীবনাবসানের সঙ্গে ছুটি সমার্থক হয়ে গেছে।

কিন্তু এখানে কবি ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে আলস্যের মাধ্যমে অবসর কাটাতে ছুটি চাইছেন। প্রকৃতির শান্তশ্রী ও সুন্দর পরিবেশেব মধ্যে গিয়ে কবি অবসরের সময়টুকু কাটাতে চান। সেখানে কর্মের ডাক নেই, সেখানে অবসর সময়ে স্মৃতি চেতনার দরজায় আঘাত হানতে আসে না, সময়সীমা মেপে কাজ করতে হয়, সেখানে আলস্যে-আরামে-আমেজে কাল কাটানো যায়, কবি সেখানে গিয়ে ছুটি উপভোগ করতে চান।

'গানের বাসা'-য় কবি বলতে চেয়েছেন যে আপন ভুবনে পাখিরা প্রেমের বাসা আপনা-আপনিই বাঁধে, তার জন্যে বিবিধ প্রয়াস বা চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানুষকে ভালবাসার জন্য যখন বাসা বাঁধতে হয়—তখন তাকে বিব্রত হতে হয়। আমরা—মানুষেরা—ভালবাসার জন্যে যখন বাসা বাঁধি, তখন গানের সুরে তার চির-কালের ভিত গড়ি। আর গাঁথনির জন্যে জরাবিহীন বাণী নিয়ে আসি।

সকলের জন্যেই সে গান থাকে, সব প্রেমিকেরই সেখানে আসন মেলে।
'পয়লা আশ্বিন' কবিতাটির মধ্যে শারদী-প্রকৃতির রূপ-সম্মোহের প্রতি লুব্ধতা লক্ষ্য করা যায়। শরতের হিমেল আমেজ লেগেছে হাওয়ায়, চারিদিকে সাদার উজ্জীবন।
আশ্বিনের সকালে পূব আকাশের যেন শুভ্র আলোর বিজয়শঙ্খ বাজছে—সেই ধ্বনিতে কবি যেন বিশ্বজয়ী অমর প্রেমসন্ধানীর জয়-ঘোষণা শুনতে পেয়েছেন। শরৎ প্রভাতের মেঘে যেন তাদের শুভ্র কেতনগুলি উড়ছে। কবি নবোদিত সূর্যের পথে নিজের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চান—ভয়, লোভ ও ক্ষোভের পথে যেন তাঁর মন চালিত না হয়।
'শারদীয়' প্রকৃতির সুন্দর রূপবর্ণনার মধ্যে দিয়ে কবিতাটির শুরু, কিন্তু 'ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না, জাগো আমার মন'—বলে যে ঘোষণা উচ্চকিত হলো, তাতে কবিতাটির সৌন্দর্যহানি ঘটেছে বলে মনে হয়। কবিতাটির রসপর্যায়ে যেন বিঘ্ন এল, রসাভাস ঘটলো, কবিতাটি আপন মাহাত্ম্যের কিছু অংশ হারিয়ে ফেললে!

বিচিত্রিতা

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের আঁকা কিছু ছবি দেখে কবি 'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলি রচনা করেন। 'বিচিত্রিতা'র উপজীব্য চিত্ররাজির মধ্যে কবির নিজের আঁকা খান সাতেক ছবি আছে, এবং সেগুলিকে নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। বিশেষরূপে চিত্রিতা বলেই এই গ্রন্থের এই 'বিচিত্রিতা' নাম।

দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসে কবি যখন শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকায় নিমগ্ন ছিলেন, সে সময় শিল্পী নন্দলাল বসুর ৫০তম জন্মোৎসব পালিত হয় ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ন'ই তারিখে; ঐ দিনটা ছিল রাসপূর্ণিমা এবং শিল্পীর পঞ্চাশতম জন্মতিথি। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে কবিতায় আশীর্বাণী লিখে দেন—তার ভূমিকাতেই ঘোষণা করেন—"পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।" এই কবিতাটি 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থের প্রারম্ভে 'আশীর্বাদ' নামে উৎসর্গ পত্রের গোড়াতেই আছে। শিল্পী নন্দলাল বসুর গুণপনা ব্যাখ্যা করে নিজের কথাও কিছু বলেছেন কবিতাটির উপসংহারে। এই গ্রন্থটি শিল্পী নন্দলাল বসুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। 'আশীর্বাদ' নামের ওই কবিতায় বিশ্বজগৎ প্রকৃতির মায়ালোক—তাদের অপার রহস্যময় বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যের মঞ্জুষা উন্মুক্ত করে দিয়েছে শিল্পীর কাছে।

> বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
> তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
> বিধির সাথে কেমন ছলে
> নীরবে তব আলাপ চলে।

শিল্পী নন্দলাল বসুর ছবিতে বিশ্বভুবন মুগ্ধ হয়ে আপনাকে খুঁজে পায়,

নটরাজের জটার রেখাও সেখানে জড়িত হয়ে গেছে। বিশ্বশিল্পী চির শিশুর মতো এই ভুবনের ছবি এঁকে যাচ্ছেন, আর আমাদের শান্তি-নিকেতনের শিল্পী মাটির খেলাঘরে যেন তার সমবয়সী সঙ্গী।

চিরবালক ভুবন ছবি আঁকিয়া খেলা করে,
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা-'পরে।

সত্তরোত্তর 'প্রবীণ যুবা' কবিও আজ শিল্পীর খেলায় মেতে উঠেছেন, নতুন আলোয় এক নব বালক আজ জন্ম নেবে, তার ভাবনা ভাষায় ডোবা, তার মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা, শিল্পের পথে তার মন ছুটেছে। কবিতার দোসর হিসেবে তিনি চিত্রাঙ্কনকে এ সময় সমান ভাল-বেসেছেন, সে-কথা অকপটে স্বীকারও করেছেন তিনি।

ছবি দেখে কবিতা রচনা করার ব্যাপারটা নতুন হলেও কবির পক্ষে এই 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে তা কিন্তু একেবারে নতুন নয়, কারণ এর আগে 'মহুয়া' গ্রন্থের কিছু কবিতা কবি নিজেরই আঁকা ছবির ভাব নিয়ে লিখেছেন। এ বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশাই লিখছেন—
"আমাদের মনে হয় 'মহুয়া'র যে কবিতাগুচ্ছ আশ্বিন ১৩৩৫ সালে রচিত, তাহার অনেকগুলিই ছবি হইতে ভাষা ও ছন্দ পায়। এ বিষয়ে গবেষণার সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র আছে এবং আশাকরি কোনো সুনিপুণ রূপদক্ষ কবি-সাহিত্যিক এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ও চিত্রের নূতন সমন্বয় সাধন করিবেন।"[১]

কলকাতায় টাউন হলে কবির যখন ৭০ বছরের জয়ন্তী উৎসব হয়, তখন সেখানে কবির আঁকা একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কবির আঁকা ছবি নিয়ে বহু আলোচনাও হয়। সে সময় তিনি কলকাতায় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে কিছু ভালো ছবি দেখেন এবং তিনি সেগুলি সংগ্রহ করে নিজের কাছে এনে রাখলেন। এই

ছবিগুলির য়্যালবাম দেখে তাঁর মনে হলো—এই ছবিগুলি যে ভাব প্রকাশ করছে—তা নীরবে ঘোষিত হচ্ছে, এদের ভাবকে ধ্বনিময় ও সোচ্চার করে তুলতে তাঁর ইচ্ছা হলো, তিনি তাদের মূক মুখে আবেগময় ভাষা যুগিয়ে দেবার জন্যে কলম ধরলেন। ছবিতে আঁকা স্থির চিত্র জীবন্ত হয়ে যেন কথা কয়ে উঠলো।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মশাই এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততম সমালোচনায় বলেছেন—"এ কথা উল্লেখযোগ্য যে অধিকাংশ সার্থক রচনা গগনেন্দ্রনাথের ছবি উপলক্ষ করিয়া; নিঃসন্দেহে গগনেন্দ্রনাথের সাদায়-কালোয় রূপরহস্যময় ছবিগুলি কবির কল্পনাকে শক্তি ও মুক্তি দিয়াছে সকলের চেয়ে বেশি।"[২] ছবির উপলক্ষ ছাড়িয়ে কাব্যরসের লক্ষ্যে গিয়ে পৌছল।

'বিচিত্রিতা'য় যে সব ছবি আছে—তাদের নামকরণ শিল্পীরা করেছেন—না কবি চিত্রগুলিতে নাম দিয়েছেন, তার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ কোথাও নেই। তবে স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে মাত্র ষোলো লাইনে এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে কবিই এই ছবিগুলির নাম দিয়েছেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে খড়দ' গেলেন—বলা বাহুল্য, ছবিগুলি সঙ্গে নিয়েই গেলেন। সেগুলি দেখেই 'বিচিত্রিতা'র কবিতারাজি লেখা। "'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুচ্ছ মাঘ মাসে লিখিত হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যে।"[৪]

খণ্ড এবং স্বতন্ত্র ছবি দেখে 'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলি লেখা বলেই—এই গ্রন্থে কবির একটি ভাবের সমতা রক্ষিত হয় নি, তাঁর মনোজগতের ও ভাবুকতার একটি বড় ক্যানভাসেরও দেখা মেলে না; বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো ভাবের মিছিল এসে উপস্থিত হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে ছবি দেখে কবি কবিতাগুলি লিখেছেন বলে যে এদের কাব্যমূল্য কিছু কমে গেছে—এমন নয়, ছবির সূত্রকে ছাড়িয়ে কবি-কল্পনা সুদূরে প্রসারিত হয়েছে। ছবিকে যখন তিনি বাঙ্ময় প্রতিমা দান করেছেন—

তখন তাতে বিচিত্র রূপ ও রসের সংযোগ ঘটেছে, কবির অন্তর্জগতের মন্ময় সংবেদনের তুলিতে শিল্পীব চিত্রে আব এক পোঁচ ব্যঞ্জনা আবোপিত হওয়ায়—তার আস্বাদ নতুন হয়েছে, 'তিলে তিলে নতুন হোয়' নয়, একেবারে সার্বিক দৃষ্টিতে অখণ্ড সমগ্রতায় নতুন হওয়াব ব্যাপার ঘটেছে।

কি রকম অপূর্ব ব্যাপাব ঘটেছে—তা এই গ্রন্থেব প্রথম কবিতাটিই লক্ষ্য করা যাক না কেন।

প্রথম কবিতাটি হলো 'পুষ্প', ঐ নামের একটি ছবি দেখে লেখা,—অবশ্য সে ছবিটি কবিবই আঁকা। একটি নারী তন্ময় হয়ে হাতেব একটি গোলাপ ফুল দেখছে, ফুল এবং নারী যেন একে অন্যের পবিপূরক, একই রূপানুভূতিব ভিন্ন অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। কবি পুষ্প এবং নারীর মধ্যে সাদৃশ্য আবোপ করেছেন, গাছেব শাখায় পল্লবের ছায়াতে পুষ্প নাবীর জন্যে অপেক্ষমাণ ছিল, নাবীহৃদয়েব লাবণ্যের ছোঁয়া পেয়েই ফুল আপনার সুষমাকে ফুটিয়ে তুলতে পারলো। স্নিগ্ধতার, কোমলতাব, তথা হৃদয়ের সুন্দর অভিব্যক্তিব প্রতীক—নারীর ক্ষেত্রে প্রেম, ফুলের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য। তাই সৃষ্টিব আদিম কাল থেকেই পুষ্প আর নারী একই রাখীর ডোরে বাঁধা পড়ে আছে। সৃষ্টিলোকের এক কেন্দ্র থেকে উভয়ের আবির্ভাব, তবু বিকশিত হওয়ার, সার্থকতা লাভ করার পথ ভিন্ন। বহুদিন পরে ফেব উভয়ের দেখা, পুষ্প দেখতে পায়—

'তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।...'

কিন্তু ফুলের তবু বুঝতে দেরি হয় না যে নারীর ক্ষেত্রে সুন্দরের রূপবদল ঘটে গেছে।

'...আজ সখি, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি—
তোমাতে সে হোলো ভালবাসা।

রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সৌন্দর্যরসের কবি, তা এই একটি কবিতা পড়লেই বোঝা যাবে।

'বধূ' ছবিটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা। নববধূর বেশে সাজানো হয়েছে এক তরুণীকে, অন্যান্য বধূ—যারা নারীত্বে উন্নীত হয়েছে—অভয় মন্ত্রে সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। তরুণীর মধ্যে চিরকালের একটি নববধূ আছে—তারই ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে ছবিখানিতে।

কবিও লিখছেন তরুণীর প্রাণে যে চির-বধূর বাস, সেই ভীরু চির-বধূই ভবিষ্যতের অনাগত অনিশ্চিত ভাগ্য সম্পর্কে সংশয়াম্বিত হয়ে তাকিয়ে আছে। যাকে সে দেখে নি, তাকে স্মরণ করেই সে নিজেকে সজ্জিত করে তুলেছে, বল্লভের মনের মতো হবার সাধনার ব্রতই হলো তার।

আগন্তুক অজানার পথ-পানে থেমে
উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে।

'অচেনা' ছবি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আঁকা; ভিনদেশী পোশাক পরিহিত, গৃহসংলগ্ন উদ্যানে আগত এক নারীর ছবি, চোখে তার অচেনা ঔদাসীন্য।

কবি এই অচেনাকে চিনে উঠতে পারছেন না। কিছুটা যেন জানা, কিছুটা আবার অজানা. লুকানো। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় না ঘটলে সম্পূর্ণ কাউকে জানা যায় না, অচেনাই থেকে যায়। কবিও তাই অচেনার পূর্ণ পরিচয় পেলেন না।

অনেক দিন দিয়েছ তুমি দেখা,
বসেছ পাশে, তবুও আমি একা।
আমার কাছে রহিলে বিদেশিনা,
লইলে শুধু নয়ন মন জিনি।'

প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মেলামেশা না হলে অপরিচয়ের বেদনা বড় হয়েই বাজে।

নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি হলো 'পসারিণী'। নিরালা মাঠে দুটি গাছ—তারই একটির তলে পসারিণী শুভ্রবসন পরিহিত, কর্মান্তে

বিশ্রাম করতে বসেছে। পাশে এবং সামনে তার হাঁড়ি, কলসী কেঁড়ে —সব নামানো। মুখ দেখা যাচ্ছে না, পিছন ফিরে বসে আছে।

কবি এই পসারিণীকে সম্বোধন করে বলছেন—হাটে হাটে বিকিকিনির পর ঘরে ফেরবার সময় মাঠের পাশে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে যখন বসেছে, তখন প্রকৃতি কি তার কানে কানে কোনো মন্ত্রবাণী শোনালে। বিশ্বপ্রাণচেতনায় কি পসারিণীর প্রাণ মিশে যায়? সাম্প্রতের আবরণ মন থেকে খসে গেলে প্রকৃতির জগৎকে জানা সহজ হয়, বিশ্ব-প্রাণপ্রবাহেব সঙ্গে ব্যক্তিক প্রাণের মেলবন্ধন ঘটে। তখন বাস্তব সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্মের কথা ভুলতে হয়, অনন্তের বাণী অন্তবে ঝংকৃত হতে থাকে।

'গোয়ালিনী' ছবি গৌরী দেবীর আকা, বিষয়বস্তু সাধাবণ। মাথায় দুধের হাঁড়ি, কোলে ছেলে, পায়ে মল—গোয়ালিনী চলেছে হাটের দিকে মাঠেব পথ ধরে।

রবীন্দ্রনাথও কবিতায় সহজ ভাষায় এই বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে গোয়ালিনী হাটেব সঙ্গে ঘবেব বন্ধন সূত্র গেঁথেছে। বাস্তব জীবন আব প্রকৃতিব মুক্ত জীবন যেন একই ডোরে বাঁধা পড়ে গেছে। ফুলের সঙ্গে তাই গোয়ালিনীর মিল খুজে পাওয়া যায়, শালিখ পাখি আব গোয়ালিনীর মধ্যেও কোনো ভেদ নেই, আকাশ থেকে সূর্য উভয়কে দেখে হাসে। ভাঁড়ের দুধ গোয়ালিনীব মাতৃমমতার ছোঁয়া পেয়ে মাধুর্যে ভরে ওঠে।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা হলো 'কুমার' শীর্ষক ছবিটি, কুমারকে বরণ করছে নারীরা—মাঙ্গলিক ছাঁচ প্রভৃতি নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'কুমার' কবিতায় নারী পুরুষের সম্বন্ধ-সম্পর্কিত তাঁর প্রিয়ভাবের বর্ণনা করেছেন, এবং পুরুষের কাছে নারীর প্রত্যাশা কি এবং নারীব প্রতি তার কর্তব্যই বা কি—সে বিষয়েও কবির মনোভাব এই 'কুমার' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

কুমারকে জয়মাল্য দিয়ে বরণ করার জন্যে নারীবৃন্দ সমবেত হয়েছে,

তীর্থবারি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে এসেছে। স্বর্গের দেবতা দৈত্যের হাতে লাঞ্ছিত হলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের আবির্ভাব ঘটেছে, আজও ভয়ার্ত মর্ত্যলোকে কুমারের আবির্ভাব-অভিলাষে নারী আহ্বান জানাচ্ছে, কোনো রমণীর সে ভাই, কারুর বা সে প্রিয়জন। আজ নারী কুমারের প্রতীক্ষায় রাত্রির প্রহর গুণছে। কুমার নিয়ে আসুক তার মুক্তির বাণী—

তুমি এসে যদি পাশে নাহি দাও স্থান
হে কিশোর, তাহে নারীর অসম্মান।
তব কল্যাণে কুঙ্কুম তার ভালে,
তব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালে,
তব বন্দনে সাজায় পূজার থালে
প্রাণের শ্রেষ্ঠ দান।

কুমার যেন নারীর এই আকুল আহ্বানে সাড়া দেয়, বীরের বরণডালা যেন বিফলতার বেদনা বহন না করে। তারা কল্পনা করে শক্তিমান কুমারের দৃপ্তভঙ্গী ও তেজস্বিতা, স্বপ্ন দেখে তার সৌন্দর্যের। কুমারকে তারা ভাবে অজেয়, অপরাজেয়। নারী চায় এই কুমারের সঙ্গী হতে।

চাহে নারী তব রথ-সঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর গুণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে,
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে,
জাগ্রত করি' রাখিয়ো শঙ্খরবে।

'আরশি' ছবিখানি সুরেন্দ্রনাথ করের দ্বারা অঙ্কিত। প্রসাধনরতা, শ্লথবসনা মুক্তকেশী এক নারী আয়নায় প্রতিফলিত নিজ মুখ দেখছে, মেঝেতে ভূষণাদি পড়ে রয়েছে।

ছবি হিসেবে এটির মূল্য এক, কিন্তু এই ছবিকে উপলক্ষ করে কবি যে কবিতা রচনা করেছেন—তার মূল্য আর এক। আরশিতে প্রতিফলিত

ছবিকে কেন্দ্র করে কবির অতীতচারী মন স্মৃতি রোমন্থনের আবেশে আতুর হয়েছে, নিজের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত এমন কোনো এক নারীর প্রেমাকুল মুখের কথা তাঁর মনে পড়ছে।

নারী দর্পণে মুখ মেলে ধরে, আরশিও অবিকল সেই মুখ ফেরত দেয়। আকাশে যেমন চন্দ্র সূর্যের ছবি জাগে, আবার সে ছবি মিলিয়েও যায়, তেমনি দর্পণেও মুখের ছায়া পড়ে, দর্পণ আবার তা ফিরিয়েও দেয়। এর পরই কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অতীত ঘটনার স্মৃতি ব্যাখানে চলে গেলেন। একদিন তাঁকেও ছায়া দিয়ে খেলা শেষ করে গেছে তাঁর দয়িতা।

সে-ছায়া খেলারি ছলে
নিয়েছিনু হিয়াতলে
হেলাভরে হেসে,
ভেবেছিনু চুপে চুপে
ফিরে দিব ছায়ারূপে
তোমারি উদ্দেশে।

কিন্তু তা আর হলো না, সে ছায়া ফেরত দেওয়া গেল না, কবি-প্রাণে তা প্রাণবান হয়ে উঠলো, দেখা গেল কবির গানের উৎসমূলে তা প্রেরণার কাজ করছে।

কেমনে জানিবে তুমি তারে স্বর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃতস্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে
হারায়েছে সীমা।
তোমার খেয়াল ত্যেজে
পূজার গৌরব সে যে
পেয়েছে গৌরব।

'দান' ছবিটি সুনয়নী দেবীর আঁকা, আবেশময়ী এক নারী প্রস্ফুটিত পুষ্পসহ একটি পল্লবের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কবির চোখে ধরা পড়েছে এই নারী যেন রাত্রি শেষের তরুণী-ঊষা, চোখে তার নব জাগরণের বিস্ময়।
রাত্রি শেষে ঊষা জেগে উঠে দেখে যে তার শয্যায় তারই উদ্দেশে ফুলের ডালি কোন্ প্রেমিক রেখে গেছে। ঊষার অজ্ঞাতে সুপ্তি ঢাকা রাতে শুভ্র আলোর স্মরণে ফুলকে বাণীময় করেই অর্ঘ্য রেখে গেছে। এই প্রেম নিবেদনের প্রত্যুত্তরে স্তব্ধ মৌনী ঊষা কিছু বলুক—কবি তা চান।

তোমার পাখির গানে,
পাঠাও সে-অলক্ষ্যের পানে
প্রতিভাষণের বাণী,
বলো তারে—হে অজানা, জানি আমি জানি,
তুমি ধন্য, তুমি প্রিয়তম—
নিমেষে নিমেষে তুমি চিরন্তন মম।

'হার' শীর্ষক চিত্রটি সুরেন্দ্রনাথ কর মশায়ের আঁকা অলিন্দে প্রতীক্ষারত একটি নারীর; উদাস দৃষ্টিতে সে দূরের দিকেই তাকিয়ে আছে।
কবিও এই নারীর জবানিতে—জীবনে প্রতীক্ষারত থাকার বেদনা ব্যক্ত করেছেন। নিভৃত নির্জন প্রকৃতি যেমন কুণ্ঠাহীন হয়ে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে, নারীও তেমনি তার মনে বন্দী-হয়ে থাকা বাণীকে রূপদান করার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করে। তার দয়িত যখন এল, সে নিজেকে নিবেদন করে জানালো—আমাদের মালাবদল হয় নি এখনো,—অভিষেকের তীর্থজলের ঘড়া পূর্ণ করা হয় নি আজো, আজ আমাকে জেনে নাও, সত্যের মাধ্যমে বুঝে নাও। কিন্তু দয়িত গম্ভীর মুখ। গড়ের মাঠের খেলায় তাদের দলের হার হয়েছে, অন্যায় ভাবেই হারানো হয়েছে, খেলা হারের গ্লানিতে ভরে গেছে মন। অতএব এসব কথা থাক।
ফলশ্রুতিতে কবিতাটি তাই কতকটা য়্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স বলে মনে হয়। চিত্রে যে নারীকে দেখি, তার দয়িত এসে গড়ের মাঠের খেলার হার

হবার জন্যে তার প্রেমের অবমাননা করবে—এমন ব্যঞ্জনা নেই, কবি কেন যে 'হার' অর্থে গড়ের মাঠের খেলার হারের কথা বললেন—তা বোঝা গেল না। অবশ্য একদা গড়ের মাঠের খেলার—বিশেষ করে ফুটবল খেলার (এবং মোহনবাগান ক্লাবের খেলার) হারজিতের ওপর মানুষেব মনের মেজাজের ওঠানামা বা রদবদল দেখা যেতো। এখানে সেরকম কোনো ইঙ্গিত থাকতেও বা পাবে।

'মরীচিকা' নামের চিত্রটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অঙ্কিত। এক চিন্তাবিষ্ট নারীমূর্তি, তাঁর মনের পুষ্পিত আবেশময়তার রূপ আকা হয়েছে; ছবিতে একটি প্রজাপতিকেও দেখা যাচ্ছে, মনে হয়—এও বুঝি তার মনেরই অভিব্যক্তিতে রূপলাভ করেছে—এমনই আবিষ্ট হয়ে আছে প্রজাপতিটি।

কবি নারীমনেব বিচিত্র ভাবনাকে রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তার মনকে মনে হয়েছে কখনো প্রজাপতি, আবার কখনো বা পুষ্পিত সৌন্দর্যের মায়া। এইভাবে কবি নারী মনের প্রেম ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে চলেছেন।

নারীর মনটি প্রজাপতিরই মতো, তার সব ভাবনাচিন্তা ঘর ছাড়া,—মাঝে মাঝে তাই সাজসজ্জায় বুঝি এই প্রজাপতিপনার উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। আবার ঐ নারীরই মনে দেখা যায় ফুল ফোটানোর মায়া, পুষ্প-বিকাশের মধ্যে সুন্দবেব ইঙ্গিত যেমন থাকে, তেমনই পুষ্পিত মায়াব ব্যঞ্জনা জাগিয়ে দেয় বুঝি এই নারী। তার যৌবনলীলার মাধ্যমে তাই তার মনের মরীচিকা-প্রজাপতি মনের মরীচিকা-ফুলের সঙ্গেই মিলন-খেলায় মাতে। একই মনকে কবি দুভাগে বিভক্ত বলে ভেবে নিয়েছেন, এক ভাগকে ভেবেছেন মরীচিকা-প্রজাপতি, অন্যভাগ হলো মরীচিকা-পুষ্প। ছবিতে যে আভাস, কবি সেই অস্পষ্ট আমেজকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন।

'শ্যামলা' শীর্ষক কবিতাটি কবির নিজেরই আঁকা 'শ্যামলা' ছবির কাব্য-মূর্তি। 'শ্যামলা' ছবিতে দেখি—নীল শ্যামল রঙে আঁকা তন্ময় দৃষ্টিতে

তাকিয়ে-থাকা একটি নারীর মুখ। এই নারীর মধ্যে কবি বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণচেতনার ক্ষণিক আভাস দেখতে পান। বিশ্বপ্রাণলীলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি যখন বাইরের দিকে তাকান—তখন সেখানকার বৈচিত্র্য কবিপ্রাণকে ভাবাবিষ্ট করে তোলে, অস্তিত্বের এক ঘনিষ্ঠ অনুভূতি তার মনপ্রাণকে প্রশান্তিতে পূর্ণ করে তোলে, তেমনি নারী প্রেমের মধ্যেও প্রকৃতির এই মুগ্ধতার ছবি তিনি লক্ষ্য করেন। মাটির অন্তরে রবিরশ্মি যে রসের সঞ্চার ঘটায়, তরুলতায় হরিতের যে মোহজাল বিস্তার করে, তেমনি নারীর প্রচ্ছন্ন তেজ, বিচিত্র চেষ্টা নারীর যৌবনকে অক্ষয় করে তোলে। তাই কবি সহজেই বলতে পারেন—

যে-ধরণী ভালোবাসিয়াছি

তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।

ঋতুচক্র আবর্তনে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ, বিশ্বপ্রাণের নবীন উচ্ছ্বাস—আকাশ, অরণ্য, জলস্থল, মেঘপাখি, গাছপালা—সর্বত্রই সৌন্দর্যের বিপুল অভিব্যক্তি—কবি এই বিশ্বপ্রাণের পূর্ণতা ও প্রশান্তি লাভ করেন—যখন নারীপ্রেমের মধ্যে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারেন।

প্রাণের প্রশান্ত পূর্ণতা, লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই,—
যখন তোমারে হেরি
রহিয়াছ আপনারে ঘেরি
গম্ভীর শান্তিতে,
স্নিগ্ধ সুনিস্তব্ধ চিতে,
চক্ষে তব অন্তর্যামী দেবতার উদার প্রসাদ
সৌম্য আশীর্বাদ।

'একাকিনী' ছবিটিও কবির আঁকা উপবিষ্ট এক নারীমূর্তি, কার উদ্দেশে যেন নিজেকে নিবেদন করার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছে।

বসনে ভূষণে নিজেকে সাজিয়ে একাকিনী নারী নিজের যৌবনকে

উপযুক্ত মূল্যবান করে তুলেছে,—এ যেন অজানা তার দয়িতের উদ্দেশে নিজেকে নিবেদনের বিনীত উচ্চারণ।

নয়নের এ-কজ্জললেখা,
উজ্জ্বল বসন্তীরঙা অঞ্চলের এ-বঙ্কিম রেখা
মণ্ডিত করেছে দেহ প্রিয় সম্ভাষণে।

দক্ষিণে বসন্তবাতাস বুঝি এর অস্পষ্ট উত্তব আনে, কিন্তু ফাল্গুনের দিনও দিগন্তে বিলীন হয়, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে অভাবিত মিলনের আভাস-টুকুও যেন ধরা পড়ে।

'সাজ' ছবিটি সুরেন্দ্রনাথ করের আঁকা; একটি তরুণীকে অন্য দুটি তরুণী সাজাচ্ছে, একজন চোখে কাজল টেনে দিচ্ছে, অন্যজন কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত। অন্য আর একটি মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে।

নারীর জীবনে রূপান্তর ঘটে—যখন সে তারুণ্যের ও যৌবনের আবির্ভাবে বধূরূপে চলে যায় তার প্রিয়ের সঙ্গে। বিশ্ব প্রকৃতিতেও প্রাণলীলার এই মিলনের ভূমিকা রয়েছে। শিশু বয়সে পুতুলকে সাজিয়ে সংসার রহস্যের নকল খেলা খেলে সময় কেটেছে, আজ হয়তো এখনো বুঝতে পারছে না যে কি খেলার জন্যে নিজেকে সাজতে হচ্ছে!

অখ্যাত এই প্রাণের কোণে সন্ধ্যাবেলাতে
বিশ্বখেলোয়াড়ের খেয়াল নামল খেলাতে।
দুঃখসুখের তুফান লেগে
পুতুলভাসান চলল বেগে
ভাগ্য ভেলাতে।

তারপর জীবনের উৎসবের হবে শেষ! অসীম কালের পটে ধুলোছাড়া এই ছবির আর কোনো চিহ্নই থাকবে না। রাঙা রঙের চেলি দিয়ে কন্যা সাজানোর পরের দৃশ্যেই বাজে বেহাগ রাগে সানাই-এর সুর!

'প্রকাশিতা' ছবির শিল্পী হলেন নিশিকান্ত রায়চৌধুরী। ছবিতে দেখি নব পরিণীত বরবধূ; রাঙা চেলি পরা বধূ অবগুণ্ঠিতা, বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে তার বসনের একাংশে গাঁঠছড়া বাঁধা।

নববধূ নিতান্তই ছোট, যার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা—তার কাছে বধূকে আয়তনে আধখানা দেখাচ্ছে। আজ বধূ ছায়াব মতোই অনুগমন করে বরেব ঘরে গেল।

তমাল সে, তার শাখালগ্ন তুমি মাধবীর লতা।
আজ তুমি রাঙাচেলি দিয়ে মোড়া
আগাগোড়া,
জড়োসড়ো ঘোমটায় ঢাকা
ছবি যেন পটে আঁকা।

কিছুদিন পরে এই নববধূ নারীর পূর্ণ মহিমা নিয়ে স্বাধীন অন্তরকে বিকশিত কবে দেবে। আজকের এই শঙ্খধ্বনি যেন সেই অনাগত দিনের জয়রব। সেদিন সেবার গৌরবে নিজ সংসারে অধিকার বুঝে নেবে।

সংকোচের এই আববণ দুব ক'রে
সেদিন কহিবে—দেখো মোরে।
সে দেখিবে উর্ধ্বে মুখ তুলি,
সুপ্ত হয়ে পড়ে গেছে ধূসর সে কুণ্ঠিত গোধূলি—
দিগন্তের 'পবে স্মিতহাসে
পূর্ণচন্দ্র একা জাগে বসন্তের বিস্মিত আকাশে।
বুঝিবে সে দেহে মনে
প্রচ্ছন্ন হয়েছে তরু পুষ্পিত লতাব আলিঙ্গনে॥

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের আঁকা ছবি হলো 'বরবধূ'। নদী থেকে বের হওয়া একটি খালের দুই পারে দুখানি পাল্কিতে করে বরবধূ ভিন্নভাবে যাচ্ছে। খালের ওপরে কাঠের সেতু, সেতুর ওপাবে বধূর পাল্কি, এপারে বরেব। দূরে নদীর ঘাটে সারি সারি (তিনটি) নৌকা বাঁধা, দিগন্তে সূর্য অস্তগামী।

প্রিয়জনের মধ্যে ব্যবধান না থাকলে মাধুর্যও নষ্ট হয়, মিলনের ব্যাকুলতা জাগে না, বিরহই দূবকে নিবিড় করে বোঝার সুযোগ দেয়, প্রেমকে প্রগাঢ়তা দান করে। মিলনের জন্যে ব্যগ্রতার মাধ্যমে মানুষ

নিজের প্রেমের গৌরব বোধ করে, মনের ঐশ্বর্যের স্বরূপ বুঝতে পারে। তাই ব্যবধানের প্রয়োজন। 'বরবধূ' কবিতায় কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

এপারে পাল্কি করে চলেছে বর, আর পারে অন্য পাল্কিতে বধূ— মাঝখানে নদীর ব্যবধান, তার ওপর সেতু। এই সেতু কিন্তু মিলন লাভের জন্য আমাদের মানস ব্যাকুলতার স্বরূপ—যার মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারি। সেতুর জন্যে মিলন সম্ভব, তীব্র ব্যাকুলতার জন্যেই মনের মানুষকে কাছে পাই। তাই কবি বলেছেন সেতুর পরেই ভারে ভারে দান আসে, সেতুর পরেই বাঁশি বাজে। একই লক্ষ্যে বরবধূর যাত্রা, তবু তাদের মধ্যে এই ব্যবধান, তাই বিরহেরও আনন্দ। এই ব্যবধানের বিরহ ঘুচে গেলে মিলনের আনন্দও কমে যাবে।

সে-ফাঁক গেলে ঘুচে থেমে যে যাবে গান,
দৃষ্টি হবে বাধাময়,
যেথায় দূর নাহি সেথায় যত দান
কাছেতে ছোটো হয়ে রয়।

কবিতাটি চিত্র-অনুসারী, তাই শেষেও আবার কবিকে বলতে হয়েছে— এ পারে বর পুরানো বটগাছের পাশ দিয়ে চলেছে, মাঝে নদী, ওপারে মাঠের কিনারায় বধূর পাল্কি দেখা যাচ্ছে, আর 'সেতুর 'পরে বাঁশি বাজে।'

'ছায়াসঙ্গিনী' চিত্রের শিল্পী হলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালো বসন পরিহিতা রহস্যময়ী এক নারী যেন বক্রদৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের মনের আয়নায় বুঝি তার ছায়াটুকুও প্রতিভাত হচ্ছে। যৌবন চলে গেলে যৌবনের আনন্দও স্মৃতিতে আশ্রয় নেয়, যৌবনের প্রেম এবং সৌন্দর্য আস্বাদের ক্ষমতাও চলে যায়, তবে একেবারে হারিয়ে যায় না, যৌবন চলে গেলেও প্রেমের আস্বাদ ও উপলব্ধি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। তাই অনুভূতিলোকে

প্রেমের ছায়াটুকু স্বপ্নের মতো জেগে থাকে। আমরা হয়তো তা জানতেও পারি না। প্রেমের এই ছায়া-স্মৃতি নিয়ে ফিরছে যে-নারী—কবি তাকেই ছায়াসঙ্গিনী বলে সম্বোধন করছেন।

কোন্ ছায়াখানি
সঙ্গে তব ফেরে লয়ে স্বপ্নরুদ্ধ বাণী
তুমি কি আপনি তাহা জান।

যৌবনের আবির্ভাবে জীবনের প্রথম ফাল্গুনী রচিত হয়েছিল, হৃদয়ের স্পন্দনে বনের মর্মর মিলিত হলো, অশোক পলাশের নবীন রক্তিমা মনে ধরালো রঙেব ছোপ, পাখির কাকলিতে প্রাণের ছন্দটুকুও ধ্বনিত হলো।

তব বনচ্ছায়ে
আসিল অতিথি পান্থ, তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে
উত্তরী-অংশুকে তার সুবর্ণ পূর্ণিমা,
চম্পক বর্ণিমা।
তারি সঙ্গে মিশে
প্রভাতের মৃদু রৌদ্র দিশে দিশে
তোমার বিধুর হিয়া
দিল উচ্ছ্বসিয়া।

তারপর চৈত্রশেষে যেমন বসন্তের অবসান হয়, তেমনই তরুণ প্রেমে বসন্তের পথ ধরেই একদিন স্খলিত কিংশুকের মতোই নিঃশেষ হলো। কিন্তু সব কিছুই কি গেল তার? না, গোপনে কিছু তার থেকে গেল?

অদৃশ্য মঞ্জরী তার আপনার রেণুর রেখায়
মেশে তব সীমান্তের সিন্দূরলেখায়।
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর।

যৌবন চলে গেলেও যৌবনের আবেশচঞ্চল স্মৃতির কারুণ্য মনের গোপন কোণে আর্তি ও আতুরতার আলো জ্বেলে রাখে।

'প্রভেদ' শীর্ষক চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের আঁকা : এর বিষয়বস্তু হলো—দুটি প্রস্ফুটিত ফুল, প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় এক তবু মৌলিকতায় আছে তফাত।

ফুলে ফুলে তফাত আছে—তবু প্রকৃতির কোলে বিশ্বপ্রাণের স্নেহসিঞ্চনে উভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলও আছে। একটি আলোর জন্যে উন্মুখ, অন্যটির মুখ বুঝিবা পশ্চাতে ফেরানো। কিন্তু দুয়েরই অন্তরে আছে গোপন মিলন সুখ,—এ দিক থেকে দুটি ফুলের মধ্যে একই চাঞ্চল্য, একই দোলায়িত ভাব। তাই একে অন্যের পাশে বসার অধিকার পায়, প্রভেদ যায় ঘুচে।

এই কবিতাটিকে রূপক ধরে নিয়ে অন্যরকম একটা ব্যাখ্যাও করা চলে।

বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে কবির ব্যক্তিক প্রাণের যে পার্থক্যটুকু তিনি বুঝে এসেছেন—তিনি উপলব্ধি করছেন যে যিনি বিশ্বপ্রাণের মালিক—তিনি বুঝি কবিকে তাঁর সৌন্দর্যলীলায় কাছে ডেকে একাসনে বসার সুযোগ দিলেন, এইভাবে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে কবিপ্রাণের প্রভেদ বুঝি দূরীভূত হলো।

মালতী ফুল তুলছে আগ্রহভরে—এমন এক নারীর ছবি হলো 'পুষ্প-চয়নী', শিল্পী হলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

ছবিকে উপলক্ষ্য করেই কবিতাটির শুরু, কিন্তু কবি কল্পনা এখানে এমনই সুন্দর হয়ে উঠেছে যে ছবির এই পুষ্পলাবী রমণীকে কেন্দ্র করে তাঁর মন অতীতের সৌন্দর্যলোকের ধ্যানে তন্ময় হয়ে উঠেছে। পুষ্প-চয়নী এই নারী কি উজ্জয়িনীর পুষ্পবিতান ছেড়ে মালিনী ছন্দের বন্ধ টুটে আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে! কবির তাই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—কোন্ ফুলে সে তার অতীত জন্মের বিরহের দিন গুণতো। হয়তো সে স্মৃতি আজো উজ্জ্বল নেই। পুষ্পচয়নী নারীর অঙ্গসাজেও দূরের আভাস ফুটে উঠেছে। মানুষের বাইরের পরিচয় নিয়েই

আমাদের কবি তৃপ্ত থাকেন নি, তিনি ধ্যানের দ্বারা মানুষের অন্তর্লোকের সংবাদ জেনেছেন।

'মনে হয় যে-প্রিয়ের লাগি'
অবন্তী নগর-সৌধে ছিলে জাগি'
তাহারি উদ্দেশে,
না জেনে সেজেছ বুঝি সে-যুগের বেশে।

যেভাবে যে ভঙ্গীতে এই নারী আজ ফুল তুলছে—মনে হচ্ছে যুগের ওপার থেকে তার বিস্মৃত বল্লভ অশরীরী মুগ্ধ চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে ওই সুন্দর সুকোমল কর-পল্লবের ছন্দটুকু দেখছে, লতিকালতার সঙ্গে তার দেহভঙ্গিমার মিলটুকুও আবিষ্কৃত হচ্ছে। বাতাসে ব্যাপ্ত করে ভালবাসা যেন পুষ্পচয়ণী নারীর যৌবনে নৃত্যময়ী ভাষা জাগিয়ে দিলে।

'ভীরু' ছবিটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা। প্রেমে কম্পিত ও ভীরু এক বধূর মুখ অবগুণ্ঠিত, ঈষৎ কুণ্ঠিতও।

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর হায় ভীরু প্রেম হায় রে'—বলে একটি অতি বিখ্যাত গান লিখে কবি জানিয়ে দিয়েছেন—যে-প্রেম জয়ী, কঠোর দুঃসহ দুঃখময় পথ বেয়ে দীক্ষালাভ করেছে—সে-প্রেমের পক্ষে ভয় করা শোভা পায় না। বাইরের বাধা পেলে প্রেম সঙ্কুচিত হয় না, দুর্গমকে অবজ্ঞা করে ভয়কে বিসর্জন দিয়ে দুঃখের উৎসাহে নিষ্ঠুরকে মেনে নেওয়াই প্রেমের পক্ষে গৌরবের বিষয়। শীর্ণ ফুলই রোদে পোড়ে, দীন দীপই নিভে যায়; যা ভীরু, যা দুর্বল—তাই মরে, কিন্তু সত্যকার প্রেম তো আঘাতে মরে না, বরং তার শক্তি বাড়ে; দরকার হলে আত্মদানের মাধ্যমেই আত্মরক্ষা করে।

'যুগল' ছবিটিও রবীন্দ্রনাথের আঁকা; এক বৃন্তে স্ফুটনোন্মুখ দুটি কুঁড়ি, ঠিক তার নিচের পারে ওই পল্লবেই আছে দুটি ফোটা ফুল।

একা কবি বাতায়ন পথে বসে এক বৃন্তে ফোটা দুটি ফুল দেখেন; দুটির মিলন-লীলাই প্রকৃতির এক মুখ্য ব্যাপার। বিশ্বচিত্তে মানবের সুখ-দুঃখের প্রতিফলন ঘটে, নরনারীর হৃদয়ের যে প্রেমমধুর সৌন্দর্য,

যত বাণী, সুর, যা-কিছু মধুর—সব কিছুরই প্রতিচ্ছবি বিশ্বপ্রকৃতিতে, আকাশের শূন্যে অনুপরমাণুদের মিলনের মধ্যে ফুটে ওঠে। বিশ্বপ্রাণের মিলনাকাঙ্ক্ষাই যেন মানুষকে বিরহমিলনের দ্বন্দ্বে চঞ্চল করে তুলেছে।

গ্রহ তারা রবি
যে আগুন জ্বেলেছে তা বাসনারি দাহ,
সেই তাপে জগৎপ্রবাহ
চঞ্চলিয়া চলিয়াছে বিবহমিলন-দ্বন্দ্বঘাতে।

বিশ্বসৃষ্টির মর্মমূলে মিলন বাসনা ধ্বনিত হচ্ছে, সেই ধ্বনি শুনেই ফাল্গুনে পত্রে পুষ্পে সাড়া জাগে, মানুষও মিলনের জন্যে চঞ্চল হয়। বিশ্বপ্রাণেব এই মিলনাকাঙ্ক্ষাই যেন বনচ্ছায়ে যুগলেব সাজে মূর্তি নিয়ে আবর্ভূত হয়।

'বেসুর' চিত্রটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা। দীর্ঘদেহী সুশ্রী নাবী—চোখে মুখে তার এমন অভিব্যক্তি যে সে যেন নিজের সঙ্গে মানাতে পারছে না, দূরের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

মানুষের যথার্থ বেদনা যে কি এবং কোথায়—তার হদিস শুধু ভুক্ত-ভোগী ছাড়া আব কেই বা জানতে পাবে। বাইরের সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য বা সম্পন্নতা মানুষের মনের পূর্ণতা আনতে পারে না, কোথায় যেন অভাব থাকতে পারে, প্রাণের তানপুরায় গানের গৎ বাজে না, বেসুরো ঝংকার ওঠে। বাস্তব জীবনে কোনো কিছুব অভাব-না-থাকা এমন এক নাবীর জীবন-বীণায় বেসুর বাজছে, কবি তার কথাই বলেছেন। নিজেব কাছেই যেন সে অচেনা, নিজের বসনই তাব কাছে যেন ছদ্মবেশ মনে হয়, এমনই বেসুর তার জীবন-বীণার ধ্বনি। তাই সে নিজেকে খুঁজে বেড়ায়, আত্মহারা, তাই সুদূরের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

শিল্পী নন্দলাল বসু 'স্যাকরা' নামের চিত্রটি এঁকেছেন: প্রৌঢ় স্যাকরা গহনা গড়ার সরঞ্জাম নিয়ে বসা, এক পাশে তার ছোট্ট মেয়ে কি নাতনি, অন্যপাশে খরিদ্দার (বোধহয় যে প্রশ্ন করছে); দূরে গৃহাভ্যন্তরের একাংশ দৃশ্যমান—সেখানে স্যাকরা-গিন্নীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

শিল্পী তার মনের মণিকোঠায় সৃষ্টিবাসনাকে প্রথমে লালন করে, প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টিকে সর্বাগ্রে নিবেদন করে মনে মনে। স্যাকরাও তার গড়ানো গহনা সম্পর্কে এই রকম শিল্পী-মনের বাসনা প্রকাশ করছে। তার কাছে জিজ্ঞাসা : কার জন্যে সে এত যত্ন নিয়ে গহনা গড়াচ্ছে। স্যাকরা বলে—'একা আমার প্রিয়ার তরে', সে আরো বলে—প্রিয়া আছে তার মনের ভেতর, বুকের কাছে। রাজা মহারাজারা এই গয়না কেনার আগেই সে আগে প্রেয়সীকে মনে মনে তা পরিয়ে সাজিয়ে নেয়—অলখ ছোঁয়ার মাধ্যমে।

আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাক্‌রা বলে, অলখ ছোঁয়ায়
রূপ লভে সে।
শুধাই, এ কি একলা তারি
চরণতলে।
স্যাক্‌রা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।

'নীহারিকা' ছবিটি প্রতিমা দেবীর আঁকা। গালে হাত রাখা চিন্তারত এক পুরুষের সামনে আব্‌ছা কুয়াশার মধ্যে এক নারীমূর্তি সামনে ভেসে উঠেছে।

কবির মনেও এক নারীমূর্তি ভেসে উঠেছে। তাই কবিতাটি স্মৃতিমূলক। বরানগরে স্বর্গত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে থাকা-কালীন ১৮ই চৈত্র (১৩৩৭ সাল) এই কবিতাটি লেখেন। বিগত জীবনের ধূসর সংবেদনকেই কবি বাণীমূর্তি দান করেছেন।

কবি বলছেন—তাঁর শূন্য মনে হঠাৎ কে যেন জেগে উঠেছে। সে কে—কবি জানতে চেয়েছেন, সেই প্রশ্নের উত্তরেই সে বলেছে—একদা তোমার কাছে আমার পরিচয় অজানা ছিল না।

প্রদীপ তোমার জ্বেলে দিলেম ঘরে,

চোখে দিলেম চুমো,
সেদিন আমায় দেখলে আলসভরে
আধজাগা আধঘুমো।

কবির প্রথম জীবনের খেয়াল খুশীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল এই সঙ্গিনী, তারপর একদিন লুপ্ত হলো সঙ্গিনীর নাম, আশ্বিনের এক পশলা অকাল বর্ষণের মতোই হারিয়ে গেল কোথায় সেই নাম! কিন্তু কবির ছন্দে, সুরে যে সে বাসা বেঁধে আছে! কবি তাকে চিনুন বা নাই চিনুন—তবু সে যে তাঁরই। সে আর হারিয়ে যাবে না।

সেদিন আমি এসেছিলেম একা
তোমাব আঙিনাতে।
তুয়াব ছিল পাথর দিয়ে ঠেকা
নিদ্রাঘেরা রাতে।
যাবাব বেলা সে-দ্বার গেছি খুলে
গন্ধবিভোল পবনবিলোল ফুলে,
রংছড়ানো বনে,—
চঞ্চলিত কত শিথিল চুলে
কত চোখের কোণে।

'নীহারিকা' কবিতায় বিশেষ এক মানসী মূর্তিকে উদ্দেশ্য করেই কবি এই কবিতাটি রচনা করেছেন, এবং তিনি আর কেউ নন, কবির কৈশোর জীবনের সঙ্গিনী কাদম্বরী দেবী। 'বীথিকা' গ্রন্থের 'কৈশোরিকা' সম্পর্কেও এই রকম কথা বলা হয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মশায়ের 'কবি-মানসী' গ্রন্থে। তিনি বলছেন—"শিল্পীর আঁকা এই ছবিখানি দেখে কবির চোখ ফিরেছে নিজের মানসপটে আঁকা তাঁর মানসীর ছবিখানির দিকে।...কবির মানস-আকাশের নীহারিকা-লোক যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল।"[৫]

'কালো ঘোড়া' চিত্রের শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালো ঘোড়ার একটা ছবি,—বলিষ্ঠ গতিমান হতে উদ্যত—এমনই তার ভঙ্গী; পিঠে

কালো এক সওয়ারী, ব্যঞ্জনাধর্মী ছবি।
বহু বাসনাকে ঘিরেই মানুষের মন আবর্তিত হয়; মনের এই রকম এক অন্ধ অভিলাষকেই কবি কালো ঘোড়া হিসেবে বর্ণনা করছেন। অসাধ্যের সাধনায় ছুটে যেতে চায়—এমন অবাধ্য বাসনাকেই কবি কালো ঘোড়া বলেছেন। শুধু তাই নয়, যুগান্তের দুর্যোগ যেন নৈরাশ্যের আঘাতে দুর্দাম গতিতে বার হয়ে এসেছে। ধ্যানের ধন হিসেবে কবির মানসলোকে আসীন তাঁর প্রিয়াকেই বুঝি পিঠে বহন করে এনেছে, প্রিয়া হয়ে পড়েছে মূর্ছিত। কালো চিন্তাই বুঝি বল্গা-হারা কালো ঘোড়ার মতোই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। যাক সে—নিয়ে যাক ব্যর্থ দুরাশাকে, বিরহের অগ্নিস্নানে মন শুভ্র পবিত্র হোক।
'অনাগতা' নামের ছবিতে দেখি এক রাজপুতানী কিংবা উত্তর ভারতের কোনো রমণী—বাতায়ন পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চিত্র-শিল্পী হলেন মনীষী দে।
স্মৃতি-শিহরিত কবির অতীত জীবনকে মনে পড়ছে। কবির জীবনে কত জনের কত আনাগোনা, কত লোক এসেছে, চলেও গেছে, ছায়ার মতো ধূসরতা নিয়ে এখনো তবু স্মরণলোকে জাগে। তবু এখনো কবির জীবনে কেউ কেউ আসে নি, সেই অনাগত বিদেশিনীর ছবি কবি মনে এঁকে রেখেছেন,—

সে-যেন শেঁউলি ভাসে ক্ষীণ মৃদু স্রোতে,
কোথায় তাহার দেশ
নাই সে উদ্দেশ।
চেয়ে আছে দূর-পানে
কার লাগি আপনি সে নাহি জানে।

সে আসতে পারতো, তবু আসে নি, অনাগত থেকে গেছে। ছবিটিতে একটি নারীর মানস চিন্তায় কবির এই উপলব্ধিই ব্যক্ত হয়েছে।
'ঝাঁকড়াচুল' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি। কানের দুপাশে ঝাঁকড়া-চুল বেয়ে পড়ছে—এমন একটি মুখের ছবি, মাথার ওপরের চুল কিন্তু

দেখানো হয় নি।

ছন্দের হিল্লোলই এই কবিতাটিকে শ্রুতিসুখকব মাধুর্য দান করেছে। ঝাঁকড়াচুলো মেয়েটির কথা কবি কাউকে বলেন নি, সেই চঞ্চল মেয়েটি যে নিজেকে অনাদরে ধূলামলিন করে রেখেছিল—কোন্ দেশে যে চলে গেছে—কে জানে! পাগলেব মতো সে বকে যেত কলকণ্ঠে, কখনো মুখ ভ্যাংচাতো, কখনো চোখ দুটি তাব ভবে যেত জলে। পঞ্চাশ বার আড়ি কবতো সে, কথায় কথায় ছাড়াছাড়ি হতো, ঝগড়ার সময় তাব নাম ছিল স্বর্ণনলিনী। কবিব বিবৃতি এখানে সুন্দব একটি কবিতাব জন্ম দিয়েছে।

'দ্বিধা' গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব আঁকা দ্বিধাজড়িত নববধূবেশিনী সসংকোচ নারীর ছবি।

আদবেব ধন হচ্ছে হৃদযেব সামগ্রী, তাব সাজসজ্জাব বড একটা প্রয়োজন হয় না, প্রকৃতিব জগতে সুন্দর যেমন সহজ অনাবিল ভূষণে আবির্ভূত হয়, তেমনই হৃদয়েব বস্তুবও অমলিন সজ্জা হলেই চলে। ফুল যদি বৃক্ষচ্যুত হযে একাকী সজ্জিত হয পাথবে গাঁথা প্রাচীরে—তার কি শোভা, তেমনি মানুষেব প্রেমেব ধন, স্বস্থানচ্যুত হলে তাব সেই সৌন্দর্য অনেকটা কমে।

তবু নববধূবেশে নারীকে সাজতে হয, পবিচিত সাজসজ্জাব অতিবিক্ত আবো কিছু অঙ্গাভরণেব যেমন দবকাব হয়, তেমনি মনেও কিছু যুক্ত হয় নতুন অনুভূতি। স্নেহ আব প্রেমে তাব দ্বিধা জাগে, ভয় এসে হাজিব হয।

বমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মশায়েব আঁকা ছবি হলো 'যাত্রা'। নদীতে মাঝি নৌকা নিযে যাচ্ছে লগি মেরে, নৌকাব ছই-এব তলায় নববধূ গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে।

'যাত্রা' কবিতাটিতে মানব সংসারের একটি চিবকালীন ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিতে যে দৃশ্য ফুটে উঠেছে, কবি সেই দৃশ্যকে কেন্দ্র কবেই একটি গভীব ব্যঞ্জনাব সঞ্চাব ঘটিয়েছেন। বাজ্যে রাজ্যে ভাঙা-

গড়ার ইতিহাস, রাজ্যশাসনের উন্মত্ততায় পৃথিবী কম্পিত কলেবর, দেশবিদেশে বাণিজ্যের জটিল সম্পর্ক, মানুষের কঙ্কালস্তূপের ওপর কত না কীর্তিস্তম্ভের রচনা, শাস্ত্রের বিধি নিয়ে পণ্ডিতদের কূট তর্কবিতর্ক—পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত প্রকাশ—এ সবের স্পর্শ বাঁচিয়ে গ্রামের প্রান্ত বেয়ে নদী বয়ে চলেছে চিরকাল, সেই নদীপথে নৌকা করে পল্লীর নববধূ দুরুদুরু কম্পিত হৃদয়ে বয়ে চলেছে তার নতুন গৃহে, দূর আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দিগন্তের পারে সন্ধ্যা-তারা উঁকি দিচ্ছে।

Thomas Hardy রচিত In times of breaking the nation শীর্ষক কবিতাটির কথা মনে পড়তে পারে এই 'যাত্রা' কবিতাটি পড়ার পর,—উভয় কবিতাতেই মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রার চিরকালের প্রবাহের কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

কুটির দ্বারে রিক্তাভরণা শুভ্রবেশী এক নিঃস্ব মহিলার চিত্রের নাম 'দ্বারে'—শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর।

জীবনের উৎসব থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত যে নারীর ছবি দেখি—তারই বর্ণনা দিয়ে কবিতাটির শুরু। অতীতের দ্বার আজ রুদ্ধ হয়েছে, বসন্তের সমস্ত দানও নিঃশেষ তার কাছে। সামনে শুধু উদাস বর্ণহীন দিনরাত্রি—উচ্ছলতা হারিয়ে মন্দ গতি, আজ শোক-শুভ্র স্মৃতির ক্ষীণ অবশেষটুকুই তার চোখে ধরা পড়ে। তবু অদৃষ্টের পরিহাস চলে, যার কাছ থেকে ছুটি হলো, তার বুঝি পাওনা মেটাতে এখনো বাকী,—তার জন্যে শোক প্রকাশ বুঝি বাকী। ব্যাকুল বেদনা যদিও তাকে নিতে চায় টেনে, তবু সংসারের টানে এখনো তাকে বাঁচতে হয়; অতীত রুদ্ধ হলেও তার মায়া তাকে মুক্তি দিতে চায় না। এই মায়া কবে ঘুচবে—তারই প্রতীক্ষায় সে অপেক্ষা করে বসে আছে।

রিক্ত, সর্বস্বহীন হয়েও নিতান্ত অপ্রয়োজনের মধ্যেও আমরা অতীতে স্মৃতিলোকের দ্বারে বসে চিরবিদায় নেবার প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করি—কবি সেই বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন।

'কন্যাবিদায়' নামের ছবিখানি নন্দলাল বসুর আঁকা। এক বিধবা

রমণী তাঁর কন্যাকে বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে পাঠাবে—তার আগে মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় বসে চিন্তারত, সামনে নবপরিণীতা কন্যা।
কন্যাকে তাব শ্বশুবালয়ে পাঠাবার সময় জননীর আজ নিজের অতীতের কথা মনে পড়ছে; একদা সে-ও ছিল বালিকা,—সে-ও মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংসার-স্রোতে ভাগ্যতরী ভাসিয়েছিল। তারপর কত সুখদুঃখেব ইতিহাস, বাল্যের শুভ্র মাঙ্গল্যের টীকা, সি দুরবেখা—সব কালক্রমে মুছে গিয়েছিল—আজ জীবনের সেই ছিন্ন আবেশ যেন আবাব ফিবে এসেছে—তার কন্যাব নবজীবনে প্রবেশের ঘটনার মধ্যে দিয়ে।
কবিতাটি চিত্রনিবপেক্ষ মাতৃ-হৃদয়েব চিরন্তন ব্যাকুলতাব এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।
'বিদায়' ববীন্দ্রনাথেব আঁকা ছবি, বিষয়—নারী পুরুষেব কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। যে মুহূর্তে নারী বিদায় নেয় পুরুষেব কাছ থেকে সে মুহূর্তেই বিবহ, মনে হয় যুগ যুগান্তব সময়েব ব্যবধান বুঝি নেমে এল উভয়ের মাঝখানে। তখনই নাবী অন্তর্হিত হয় সুদূব অতীতে, অসীম বিবহের মধ্যে ছায়াব মতো থাকে। কাছেব মূর্তিব চেয়ে দূরেব মূর্তিতে তখন নাবীকে বড় বলেই মনে হয়। কাছের প্রিয়তমাব সঙ্গে নৈকট্যেব সম্পর্ক, ইন্দ্রিয় চেতনাব আবর্তনে তাকে আমরা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাই, কিন্তু বাস্তব সীমানাব বাইরে যদি সে চলে যায়, তাহলে মনের শূন্য বিরহলোকে তখন সে ধ্যানের আসনে সমাহিত হয়, আব বিদায় তখনই সার্থকতা লাভ করে।
আগেই বলেছি 'বিচিত্রিতা'য় একটি সুরের অনুবণন নেই, একই ভাবের অনুবর্তন নেই, থাকা স্বাভাবিকও নয়। তবু স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবে কয়েকটি কবিতা যে, অপূর্বভাবে রসোত্তীর্ণ—সে কথা বলাই বাহুল্য। পুষ্প, আবশি, বরবধূ, ছায়াসঙ্গিনী, স্যাকৃবা, নীহারিকা, যাত্রা, কন্যা-বিদায়, এবং বিদায় কবিতাগুলি অতুলনীয়।

শেষ সপ্তক

'শেষ সপ্তক' নিঃসন্দেহে গদ্যছন্দে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। 'পুনশ্চে' গদ্যচ্ছন্দের প্রবর্তন করে ভাষায় আলংকারিকতার সৌন্দর্য (যেমন উপমা প্রয়োগে নবত্ব ও দ্যুতি তথা দীপ্তির বিকাশ ঘটানো) প্রকাশে কবি হয়তো ছন্দ ও মিলের অভাবজনিত ক্ষতিপূরণে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু 'শেষ সপ্তকে' গদ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো কুণ্ঠা নেই, এবং এই মাধ্যমটি যে অগৌরবের নয়—সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। তাঁর প্রজ্ঞা-গভীর মানসমূর্তির ভাবনাগুলি এই ছন্দেই বাক্‌প্রতিমার মাহাত্ম্যলাভ করতে পারে—এ প্রত্যয় তাঁর গভীর হয়েছিল, তাই এই সময়ের অনুভব যা তিনি ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেও তাকে গদ্যচ্ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন, এমন কয়েকটি কবিতা 'শেষ সপ্তকে' স্থান পেয়েছে, আমরা কবিতাগুলির আলোচনায় যথাস্থানে সে বিষয়ের উল্লেখ করবো।

শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথকে যে দার্শনিক অভিধায় সংজ্ঞিত করা হয়,—তার মূলে 'শেষ সপ্তকে'র বেশ কিছু কবিতাই দায়ী। এখানে কবি জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর যিনি লীলাময়রূপে জগৎ ও জীবনে প্রতিভাত—তাঁকে বুঝতে চেয়েছেন কবি। কবির মানবিক সত্তার সঙ্গে সেই প্রেমময়ের কোন্ লীলারহস্যের মূলটি গাঁথা, আত্মা কি, বিশ্বাত্মার স্বরূপই বা কি, মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার মেলবন্ধন কোথায় বা কতটুকু—এই জাতীয় বিবিধ প্রশ্নের জটলা 'শেষ সপ্তকে'র উপজীব্য। এখানে কবি আত্মার স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত হয়েছেন। তাই বলা হয় যে কবির মনন এখানে দার্শনিক অভিজ্ঞায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্র-কাব্যে সুন্দরের লীলার বিচিত্ররূপ আমরা দেখেছি, কবি এই লীলার প্রকাশে পুলকিতচিত্ত ছিলেন, 'শেষ সপ্তকে' সেই সুন্দরের লীলা কোনো কবিকে বাড়তি আনন্দ দান করে নি, বরং কবির মনে সেই লীলাময় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে উপলব্ধি জাগছে। কবি এতদিন বলে এসেছেন যে সীমার মাঝেই অসীম প্রকাশিত হয়ে আসছেন, কবিও রূপের পদ্মে অরূপ-মধু পান করে এসেছেন, কিন্তু এখানে কবি তাঁর মানসলোকেই অসীমকে উপলব্ধি করেছেন। তাই বহির্জগতে কবি ঐশ্বরিক লীলায় আর বিস্ময় বোধ করবেন না, এখন ব্যক্তিক জীবনে নিজের অন্তরেই তাঁর স্পষ্ট উপলব্ধি জেগেছে।

'শেষ সপ্তকে'র কয়েকটি কবিতায় কবির এই ঈশ্বরানুভূতির কথা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে কবির নিস্পৃহ এবং নিরাসক্ত জিজ্ঞাসা রয়েছে; আর আছে ব্যক্তি-মানসে অধ্যাত্মচেতনা, বিস্ময় বোধ এবং আনন্দানুভূতি। এছাড়া 'শেষ সপ্তকে' কবির কয়েকটি প্রেমের কবিতা অমল সৌন্দর্যে রূপায়িত হয়েছে, কবির প্রেমানুভূতি এবং অতীত জীবনের স্মৃতিচারণাও আছে দু একটি কবিতায়।

শেষপর্বের রবীন্দ্রনাথকে ঋষি কবি বলা হয়েছে, মনে হয় 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের মূলসুর এবং এর প্রকরণপদ্ধতির কথা মনে রেখেই কবিকে এই অভিধায় বিশেষিত করা হয়েছে। মানুষ যখন প্রজ্ঞার আলোয় নিজের মনকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন তখন পার্থিব কোনো বস্তুর প্রতিই তাঁর আর আসক্তি থাকে না, তখনই তিনি ধ্যানদৃষ্টি লাভ করেন, পৃথিবীর সার ও অসার বস্তুর মধ্যে তাঁর বিচার তখন স্বাভাবিক ও নির্ভুল হয়। এই ধ্যানদৃষ্টি সম্পন্নতার আর এক নাম দার্শনিক-ঋদ্ধি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা এই ধ্যানদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। কবিও আজ সেই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, জগৎ ও জীবনকে নিস্পৃহ চোখে দেখছেন, আত্মাকে দেহ এবং মনের গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করেই তার স্বরূপ বিচার করতে চেয়েছেন। 'শেষ সপ্তকে' কবি উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি' এই উদাত্ত বাণীর মর্ম উদঘাটন করতে

প্রয়াসী হয়েছেন। তাই কবি মহাবিশ্ব জীবনের পটভূমিতে নিজেকে স্থাপিত করে নিয়ে আত্মসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। ভারতীয় আর্য-দৃষ্টির অনুসরণে কবি সেই সত্য দৃষ্টিলাভের জন্যে উন্মুখ, এই গ্রন্থে তাঁর সেই উন্মুখতা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'শেষ সপ্তকে'র অধ্যাত্মচিন্তা কিন্তু কবির মধ্য বয়সের আধ্যাত্মিক বোধের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অনুভূতি। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি-গীতালির যুগেও কবি ঐশ্বরিক চিন্তায় বিভোর ছিলেন। কবি তখন জগৎ সংসারের মধ্যে, প্রকৃতির রাজ্যে অসীম অরূপ ঈশ্বরের লীলারূপ প্রত্যক্ষ করতে ব্যগ্র ছিলেন, ঐ সময়ই তিনি রূপের পদ্মে অরূপমধু পান করেছেন। পরিণত বয়সে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে তাঁর আধ্যাত্মজিজ্ঞাসার রূপবদল ঘটেছে। তিনি এখন মানবাত্মার স্বরূপ সন্ধানে ব্যগ্র, আত্মার সত্য মূল্য নিরূপণে আগ্রহী। মানবজীবন তথা বিশ্বসংসারের প্রতি তাঁর আর কোনো আসক্তি নেই, নিস্পৃহ ধ্যানদৃষ্টি নিয়েই তিনি নিজের মনোলোকের গভীরে তাকিয়ে দেখছেন, প্রকৃতির দিকে দেখেছেন,—বিশ্বের সর্বত্রই আজ তিনি বিশ্বস্রষ্টার সহজ স্পর্শটি উপলব্ধি করতে পারছেন ; যা-কিছু তুচ্ছ ও সামান্য,—সে-সবের মধ্যেও অসামান্যের স্পর্শ পাচ্ছেন। 'সোনারতরী' পর্বে কবি প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যরস সম্ভোগের জন্যে অধীরভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এখন আর সেই সৌন্দর্যরসের আবেগ ও রূপতৃষ্ণার সেই তীব্রতা নেই।

শুধু যে প্রকৃতি লোকের অমল সৌন্দর্যের ধ্যানেই তিনি মগ্ন থাকতে চান—তা নয়, বিশ্বজীবনস্রোতে তাঁর জীবনধারাকে মিলিয়ে দিতে চান ; তিনি আজ নিরাসক্ত, কোনো মোহ নেই, মায়া নেই। চলমান জগতে কিছুই থাকে না, এমন কি কীর্তিও নশ্বর, ধ্বংসের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। তাই আজ কবিকেও তাঁর সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে মহাকালের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হলো, যাদের সৌরভ, খ্যাতির গর্ব—সব কিছুকেই তিনি ছেড়ে দিলেন, খ্যাতি বা প্রশংসার প্রতি মোহও একটা আকর্ষণ, আর আকর্ষণ মানেই বন্ধন।

আজ তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, ভোগেব বন্ধন তাঁকে পিছনের দিকে আর টানতে বা বাঁধতে পারবে না। আজ তাই কবি নিজেকে পূর্ণ মনে কবতে পারছেন, কারণ কোনো কিছুবই মোহ তাঁকে খণ্ডিত করতে পারবে না।

কযেকটি কবিতায কবি মৃত্যু সম্পর্কে তাঁব দার্শনিক মন কি ভেবেছে তাও প্রকাশ কবেছেন, জীবন অন্তহীন, মৃত্যুতে তাব শেষ হয না, জীর্ণ দেহটা যায, নতুন দেহে প্রাণেব নব অভ্যুত্থান ঘটে। মৃত্যু জীবনের একটি পবেব সমাপ্তি ঘটায, অন্য পর্বেব আবাব শুরু হয। মবণজয়ী সত্তা জীবনেব পথে অগ্রসরমাণ হযে চলেছে, তিনি মৃত্যুকে শেষ ভাবেন নি, ক্ষণিক বিবর্তি মাত্র মনে কবেছেন।

'শেষ সপ্তকে'ব কযেকটি কবিতায আবাব মর্ত্যব্যাকুলতাব সুব শোনা যায। তিনি নিন্দা বা খ্যাতিব ঊর্ধ্বে উঠেছেন,—এ সব তাঁব কাছে তুচ্ছ, অনিত্য—তবু এই পৃথিবীব মাযা তাকে টানে, তিনি এই পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন, মাটিব সংসাবে অমৃতভবা মুহূর্তগুলি কি করে ভুলবেন? এই জাতীয কবিতায দেখি কবি তাঁব এই প্রেমময সত্তাকেই 'নিত্য আমি' বলে জানিযেছেন। কবিব মধ্যে যে সত্তা পৃথিবীকে ভালবেসে চলেছে—সেই কবি-সত্তাই হচ্ছে কবিব 'নিত্য-আমি'। এই 'নিত্য-আমি'কেই তিনি অবিনশ্বব এবং অমৃতস্বরূপ বলে বর্ণনা কবেছেন। এই 'নিত্য আমি' বিদেশী, মানুষকে সে ভালবাসে, প্রকৃতিতে সে অনুবক্ত—এই ভালবাসাতেই তাব আনন্দ।

এই গ্রন্থেব কবিতাগুলি তত্ত্বভাবাক্রান্ত, এবং উদাত্তকণ্ঠে গদ্যচ্ছন্দে সেই তত্ত্বকে ঔপনিষদিক সুবেব ছোঁযায স্পন্দিত করে তোলা হযেছে। তাব ওপব কবিব বার্ধক্যজনিত ক্লান্তি নেমেছে মনে, একদা-তেজস্বী মন এখন মৃত্যুব দ্বাব প্রান্তে বিধুবতা বোধ কবছে, কর্মহীনতাব আলস্যে কেমন যেন অবসন্ন। এই গ্রন্থ রচনাব সময়ে কবিব মনোভাবেব পবিচয় আমবা তাঁবই লেখা একটি চিঠিতে দেখতে পাই। তিনি ৭. ৪. ৩৫. তাবিখে লিখছেন—'জীবন-আকাশেব আলো ম্লান হয়ে এসেছে—

এখন মনের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে—বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই—নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ—এই প্রান্তটি সংকীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করছি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে—সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তর অয়ন।'[১]

গম্ভীর নির্ঘোষে কবি জীবনের মননের শ্রেষ্ঠ অনুভবগুলিকে যেন মালার মতো গেঁথে চলেছেন একের পর এক, তাই কবিতাগুলির নামকরণ সম্ভব হয় নি, সংখ্যা দিয়েই এদের চিহ্নিত করতে হয়েছে। এমন কি 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থটির নামকরণেও বেশী কিছু মন্তব্য করার নেই। এই সার্থকনামা গ্রন্থে যে সব বিচিত্র সুর ধ্বনিত হয়েছে—তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি করেছি, কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি। নিরাসক্ত ধ্যান মৌন কবির নিস্পৃহ দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকানো, সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের প্রয়াস, ঈশ্বরের তথা বিশ্বাত্মার স্বরূপ সন্ধান, মানবাত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার কি সম্পর্ক—তা নির্ণয়ের ব্যাকুলতাবোধ, বিশ্বজীবনের স্রোতোধারায় কবির ব্যক্তিক জীবনের ক্ষীণধারাকে মেলানোর প্রয়াস, সুখ-দুঃখ, হারানো-প্রাপ্তির সকল দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আত্মার নিবিরোধ আনন্দলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা—প্রভৃতি সুর সমূহই কবি জীবনের শেষ পর্বের সুর সপ্তক বলে আখ্যাত হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রেমানুভূতি ও অতীত চারণার কিছু মধুর কথাও যুক্ত হয়েছে। এই সুরবাজিই শেষপর্বে বেজে উঠেছে কবির মনোবীণায়। সাতটি সুরের সমন্বয়কেই সংগীতশাস্ত্রে সপ্তক নামে অভিহিত করা হয়েছে, এখানে কবির মানস উপলব্ধির জগতে বিভিন্ন সুরের সম্মেলন ঘটেছে,—কবি সেই সুর সম্মেলনকেই মর্যাদা দান করার জন্যেই এই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'শেষ সপ্তক'।

'শেষ সপ্তক' গদ্যচ্ছন্দে লেখা, এর কবিতাগুলির বিষয়-গৌরব এবং ভাব-সমৃদ্ধির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করেই সমালোচক-মহলে একটি আনন্দ ধ্বনিত হয়েছে—যে এগুলি যদি ছন্দে রচিত হতো তা হলে এদের সৌন্দর্য আরও বেশী করে আমাদের মুগ্ধ করতো। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বলেছেন—"বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিগুলি স্ব-স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চল গাম্ভীর্যে দাঁড়াইয়া থাকে, ধ্বনি-তরঙ্গের অনিবার্য স্রোত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া, তাহাদের ছোট ছোট সুবগুলিকে সংহত করিয়া বিরাট ঐকতানের মহাসমুদ্রে লুপ্ত করিয়া দেয় না। কাব্য-জগতে ছন্দের প্রধান অবদান—স্মরণীয়তা। 'শেষ-সপ্তক'-এর কবিতা-গুলি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে; কিন্তু যে সহজ আনন্দ ছন্দরূপে মূর্ত হইয়া কবির বচনাকে আমাদেব মনে অবিস্মরণীয়-ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয় তাহাব আস্বাদন এখানে মিলে না। ছন্দের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হইলে এই বিচ্ছিন্ন হীরকখণ্ডগুলি মহাকালের বক্ষে মণিহারের ন্যায় চিবদিন ধরিয়া দোদুল্যমান হইত এই আক্ষেপবোধ আমাদের রসোপভোগের আনন্দকে কিঞ্চিৎ ম্লান করিয়া দেয়।"[২]

এটি কবির ৭৪তম জন্মদিনে পঁচিশে বৈশাখ ১৩৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

এবার কবিতাগুলিব আলোচনায় আসা যাক।

জীবনের পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়, কতক সে যায় ফেলে, কতক বা তার জীবনের সঙ্গে যায় জড়িয়ে। জীবন অস্থিব, তাকে এগোতেই হয়, এ কথা কবি তাঁর প্রৌঢ় জীবনে 'বলাকা'য় আমাদের ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জীবনের পথে যা পড়ে থাকে বা হারিয়ে যায়—তা কি জীবন থেকে একেবারেই যায় মুছে? সমুদ্রের জলে নদীর জল এসে মিশলে তার লয় ঘটে না, স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে মিশে থাকে, তেমনি জীবনের ঘটনাবলী তাদের বর্ণাঢ্যতা হারিয়ে স্মৃতিসত্তায় মিশে যায়। স্মৃতির ধূসর লোকে অনুভূতির তীব্রতা জ্বলে উঠলে অনেক হারানো সম্পদ আবার চৈতন্যলোকে জেগে ওঠে, দ্যুতি ছড়ায়, হয়তো

বা মন বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তোলে। যাকে হারানো যায়, তাকে প্রেমের মধ্যেই আবার ফিরে পাওয়া যায়। যথার্থ প্রেম কাছে টানে না, দূরেও সরায়। বিরহ প্রেমকে পূর্ণ করে। তাই বেদনায় প্রেমের মূল্য দিলে তবেই প্রেম সার্থক হয়। কবিতাটির শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি সে কথাই ঘোষণা করছে—

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

এই এক নম্বর কবিতাটি হয়তো তিরিশ বছর আগে যাঁকে হারিয়েছেন—তাঁকে স্মরণ করেই কবি লিখেছেন, অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। কবির স্ত্রীর প্রতি এই নিবেদন বলেই পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। তদুপরি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশাইও এ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন তুলেছেন এই বলে যে এই কবিতাটি তার স্ত্রীরই স্মরণ সম্পর্কিত, না এ কেবল কবি-মানসের নিরর্থক বেদনা মাত্র ?[৩]

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মশাইও এই কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন যে "বিচ্ছেদ-ব্যবহিত পূর্ব প্রণয়ের স্মৃতির উপর ক্ষণিকের রচনা। দাম্পত্য-প্রীতি সুলভ বলে এবং নিত্যপ্রাপ্যতা এবং অধিকার বোধের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাপ্য গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। প্রিয়ার বিয়োগই কবির অনুপলব্ধ প্রেমকে যথার্থ মহিমায় স্থাপিত করেছে—এই বিষয়টির রমণীয়তা কবিতাটিতে বাহুল্যহীন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।"[৪]

দু'নম্বর কবিতাটিও, প্রেম সংক্রান্ত।

কবি আজ জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত, অস্তসিন্ধু-পরপারে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, তবু মাঝে মাঝে অতীতদিনের ফেলে আসা স্মৃতিকণাগুলি উদ্বেল হতে চাইছে, আত্মবিহ্বল যৌবন-কালে কোন্ নারীস্পর্শ তাঁর চিত্তে দোলা দিয়েছিল—মনে পড়েছে ; আর কোনো দিন তার দেখা মেলে নি, শুধু অনুভূতি-স্মৃতির সাগরে একটি অমৃতরেখার মতো জেগে থাকে।

জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল

চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা

শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

তুচ্ছ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ ক্ষণকালীন একটু প্রেমের ছোঁয়া যেন পেয়েছিলেন কবি, অপরিচিত মুহূর্তের সেই চকিত বেদনা আজ তাঁকে বিহ্বল করেছে—শস্যরিক্ত মাঠে বা সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে তাঁর মন বিধুর হয়ে উঠছে। প্রেমের স্মৃতি যে জীবনের ধন হিসেবে অনেকখানি—তা বোঝা যাচ্ছে। ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে 'স্মৃতি-পাথেয়' নামে এই কবিতাটির ছন্দোময় প্রাকৃরূপ আমরা দেখতে পারো। এখানে শুধু প্রথম স্তবকটি তুলে দিচ্ছি—কৌতূহলী পাঠক মিলিয়ে দেখতে পারেন :

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিত হাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতরেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

তিন নম্বর কবিতায় কবির বিরহ স্নিগ্ধ বেদনায় সমাহিত রূপ নিয়ে বেজে উঠেছে। অল্প কথায় কবি তাঁর হৃদয়াবেগকে কেমন সংহতভাবে প্রকাশ করেছেন। পৌষের পরে শিশিরভেজা বাতাবির গাছে দেখা গেল কচি কচি পাতা ধরেছে। তমসানদীর তীরের বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের মতোই উচ্চকিত হয়ে কি যেন বলতে চায় ঐ কিশলয়; সে যা বলতে চায়, তা যে কবির কৈশোরের সেই ক্ষণসঙ্গিনী—যার স্মৃতি নিয়ে এই কবিতা—শুধু বলতে পারতো, কিন্তু না বলে সে চলে গেছে। একটু আড়াল, আধ-চেনার ক্ষীণ অন্তরাল ছিল উভয়ের মধ্যে, বসন্ত বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠেছিল সে যবনিকা, বসন্ত বাতাসে দুরন্ত

হয়ে উঠলেও, এক আধটা কোণ খসে গেলেও একেবারে সরানো যায় নি সেই পর্দা। অবকাশ ঘটলো না,—

ঘণ্টা গেল বেজে,

সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।

এই কবিতাটিরও ছন্দিতরূপ বিচিত্রায় (১৩৪০, ফাল্গুন) প্রকাশিত হয়েছিল 'বাতাবির চারা' নামে। সেখানে কবিতাটির মধ্যে বেদনার তীব্রতা আরো বেশী করে বাজে, কারণ ছন্দের ঐ কবিতায় কবি জানাচ্ছেন যে এই বাতাবির চারা শ্রাবণ-প্রভাতে কবির সঙ্গিনী নিজ হাতে কবির বাগানে রোপণ করেছিল। সেই গাছের ফসল সম্ভাবনায় সঙ্গিনীর প্রয়াণের ইঙ্গিতে ব্যথা আরো নিবিড়তর হবে—খুবই স্বাভাবিক।

আয়ুর অপরাহ্ণ মানুষের মনের আকাশকে অস্পষ্ট এবং আবিল করে তোলে, কল্পনার ঔজ্জ্বল্য থাকে না, মননও নিষ্প্রভ হয়; কবি বহির্জগতে নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যে এসে মানসিক এই আবিলতা এবং অলস স্থবিরতা থেকে মুক্তিলাভ করতে চেয়েছেন।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের একটা পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে কবির যোগ এবং একাত্মতা অত্যন্ত নিবিড়, আজ কবি প্রকৃতির কাছে আশ্রয় চাইছেন—আত্মোপলব্ধির জন্যে। এতাবৎকাল কবির জীবন সুখ-দুঃখের বিচিত্র পথে আবর্তিত হয়েছে; আশা-নৈরাশ্য, স্মৃতি-বিস্মৃতি—বিবিধ চেতনার একটা মোহজাল তার মনকে পরিব্যাপ্ত করেছিল, আজ সেই জালের আবরণ সরাবার জন্যেই প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিতে চাইছেন; বার্ধক্যজনিত মোহজড়িমার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশে দাঁড়ালে তাঁর মন আবার সতেজ হবে, আলোকিত হবে।

এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে

বেরিয়ে আসুক মন

শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।

কবির জীবনে বসন্ত আজ অতীত কথা, বসন্তের বিলাস আজ তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো—অতীত দিনের ব্যাপার। তিনি তাই নির্লিপ্ত মন নিয়ে বর্তমানকে দেখতে চান, তিনি নিজেকে তাই ন্যস্ত করতে ইচ্ছুক 'শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে'।

বহির্জগতে, নিসর্গরাজ্যে সর্বদা প্রাণপ্রবাহের ধারা বইছে নানা শাখায়; মানব-ইতিহাসের নতুন নতুন ভাঙাগড়ার ওপর দিয়ে তার নিত্য যাওয়া-আসা। কবি এই বিশ্বধারায় নিসর্গপ্রবাহে নিজের প্রাণ-প্রবাহকে মিশিয়ে দিয়ে সেই অস্তিত্বধারার গভীরতায় ডুব দেবেন, তখন তাঁর চেতনা ভাসতে ভাসতে 'চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন মৃত্যু-মহাসাগর-সঙ্গমে' চলে যাবে।

'শেষপর্ব' নামে ১৩৪১ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে—তার সঙ্গে শেষসপ্তকের এই চার নম্বর কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পাঁচ নম্বর কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে অনিমন্ত্রণে বর্ষাঋতুর আগমনের কথা জানিয়ে। বর্ষা যেমন বনস্পতিকে সতেজ করে, তেমনি কবির মনকেও সবুজ করে। বর্ষার অস্তিত্ব কবি বার বার নিজের মনে অনুভব করে এসেছেন, এই কবিতাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি; (এই কারণেই অনেকে রবীন্দ্রনাথকে বর্ষাঋতুর কবি বলে থাকেন)। অকালে যেমন অনিমন্ত্রিত বর্ষা নামে, তেমনি কবিও হৃদয়ের দিগন্তে যখন বর্ষাকে আহ্বান করেন, তখন সেখানেও বর্ষা নামে। বর্ষা বছরে বছরে বনস্পতির অঙ্গের আয়তি বাড়িয়ে দেয়।—

তেমনি করে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে।

এইভাবে কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে অনুভব করেন। এর ঠিক আগের কবিতাতেও দেখেছি কবি বিশ্বজগতে নিজেকে নির্লিপ্ত-ভাবে বিকীর্ণ করে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, তাঁর আশা এই নির্লিপ্ত ব্যাপ্তির মধ্যেই দিব্যদৃষ্টি জাগবে। সেই দিব্যদৃষ্টির কাছে কবি নিজের সত্তার স্বরূপ উন্মুক্ত করতে চাইছেন, এবং কবি উপলব্ধিও করছেন যে তাঁর সত্তা বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত। তাঁর সমস্ত সঞ্চয়, সমস্ত পরিচয় নিয়ে দিব্যদৃষ্টির সামনে একদিন সম্পূর্ণ অবারিত হবে। সত্তার সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা সহজ নয়, কবি কিন্তু তাঁর গোচরতাকে তথা স্পষ্টতাকে চেয়েছেন, প্রকাশ পূর্ণরূপেই আবির্ভূত দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাঁর আকুতি—

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে—

জীবন-গোধূলির ঘাটে পৌঁছে কবি হিসাব নিচ্ছেন নিজের সারাদিনের পথ চলার দেনাপাওনার, মানুষের কথার হাট থেকে সঞ্চয় হয়েছে কিছু, প্রেমের থলিতেও জমা পড়েছে কিঞ্চিৎ; অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোতেও সময় গেছে অনেকটা। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে কারো দেখা হয়ে থাকবে, জলভরা ঘট নিয়ে সে চলে গেছে, কবি সেই বিরহবেদনা বহন করে পথে চলে এসেছেন।

আজ আর সামনে পথ নেই, সুতরাং পাথেয়েরও আর কোনো দরকার নেই। মিলনের যে আলো তিনি জ্বেলেছিলেন, সেই প্রদীপ হাতে করেই এবার বিদায় নেবার পালা, যে বাঁশি ভোরের আলোয় বেজেছিল, রাতের শেষ প্রহরে তার শেষ সুরটি যাবে থেমে।

কবি বিষণ্ণ বোধ করছেন—যে এতদিন সত্য ছিল, বিদায়ে একেবারে সে মুছে যাবে? তিনি জানাচ্ছেন—

সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো,
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

কবিকে যেন স্মরণে রাখা হয়—এই বাসনারই প্রকাশ ঘটেছে বটে,

কিন্তু কবি মনে করিয়ে দিতে চান—তিনি শুধু কবিই নন, আলোর প্রেমিকও ছিলেন, প্রাণরঙ্গভূমিতে বাঁশি বাজানোও তাঁর কাজ ছিল। তাই কবি রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের সঙ্গে যেন মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপূজা করা না হয়। ধুলোর উদাসীন বেদীর সামনে ধুলোর হাতেই তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তার দাবিকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন। সেখানে আর পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে আসতে হবে না।

সাত নম্বর কবিতায় মহাবিশ্ব সম্পর্কে কবির ভাবনা রূপায়িত হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং বিলয় সম্পর্কে কবির ধারণা বিজ্ঞান-চেতনার পরিপন্থী নয়। অনেক হাজার বছরের পুরানো সৃষ্টি আজ অবলুপ্ত, তার জায়গায় নতুনের আবির্ভাব, আবার আগামী দিনে এরও ঘটবে বিলয়। কালচক্রে এই আবর্তন ঘটে চলেছে। এক যুগের বাণী কোন্ অতলে গেছে হারিয়ে। কোনো বাণী হয়তো উজ্জ্বল হয়ে ক্ষণিক প্রভা দিয়ে গেছে, কোনো বাণী 'অপ্রজ্জ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে' গেছে নিভে।

যা বিকোলো, আর যা বিকোলো না,
দুই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।

আবার নির্মল নিঃশব্দ আকাশে কল্প কল্পান্তরের আবর্তন হয়েছে। নতুন বিশ্ব জন্ম নিয়েছে। অনন্ত কাল ধরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছোট বড় কত সৃষ্টিই না হচ্ছে, আবার সেই সৃষ্টির অবলুপ্তি ঘটতেও দেরি হচ্ছে না। কিন্তু মহাকাল শান্ত এবং অক্ষুব্ধ অবস্থায় ধ্যানমৌন হয়ে রয়েছে। কবি মহাকালকে নিরাসক্ত দেখছেন, তাঁর ধ্যানেই প্রকাশ রূপায়িত হচ্ছে, তাঁর ধ্যানেই আবার লয় পাচ্ছে; অথচ মহাকাল নিজে আসক্তিশূন্য হয়ে রয়েছেন। সে অবিচলিত আনন্দে, জন্মমৃত্যুর স্রোতো-বেগের মধ্যে নিরাসক্ত হয়ে বিরাজিত রয়েছেন। কবি এই সন্ন্যাসীরূপী মহাকালকে নির্মম বলেছেন, তাঁর কাছ থেকে আসক্তি-শূন্যতার দীক্ষা চাইছেন; জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে—

যেখানে অক্ষুব্ধ শান্ত রয়েছে, সেখানে আশ্রয়ের জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি। সন্ন্যাসী মহাকালেব অন্তরে যে বৈরাগ্যের সুর, কবির অন্তর-বীণায় তা বেজে উঠুক—কবি সেই প্রার্থনা করছেন।

এই আট নম্বর কবিতাটিতে দুটি ভাবেব দেখা মিলবে। একদিকে দেখা যাবে কবি দূব অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, যেন তিনি কল্পনার চোখে প্রাগৈতিহাসিক কালেব গুহাচিত্রকরদের পর্বতগাত্রে বা গুহা-গহ্বরে চারু চিত্রাঙ্কন অবলোকন কবছেন, আবার অন্যদিকে কবির প্রকৃতি-প্রীতি, সেখানে দেখি তিনি নিসর্গলোকে অবগাহন করে অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। তাই একদিক থেকে কবিতাটিকে আত্মভাবনার ইঙ্গিতবহ বলা যায়।

কবি মনশ্চক্ষে দেখছেন সুদূর অতীতকে, কত যে নামহীন রূপকার শিল্পী দুর্গম পবতগাত্রে, গিরিগুহায় রূপচিত্র এঁকেছেন—তাঁদেব ঐ শিল্পকর্মে জড়িত হয়ে আছে তাদেব আনন্দ কিন্তু ভাবীকালের কাছে খ্যাতি-লাভেব আশায় নামের মোহকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায় নি বাইরেব দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে।

কবিও নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন—অতীতের সেইসব শিল্পীদের যুগান্তকারী কীর্তিতে।

নামের মোহকে তারা অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এই নামক্ষালন যে অন্ধকারে নিজেকে হারিয়েছে—নিশ্চয়ই সে অন্ধকার পবিত্র। নাম-ক্ষালন নিজে অন্ধকারে ডুব দিয়ে সেই গুহাচিত্রশিল্পীদের সাধনাকে নির্মল করেছে, কবি সেই পবিত্র অন্ধকারকে স্বাগত জানাচ্ছেন। নামের খ্যাতি হলো প্রেতেব অন্নের মতো—ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ করা দ্রব্যেরই সামিল।

এর পর বসন্তকালের প্রৌঢ়দশার একটি দৃশ্য; সজনে গাছের পাতা ঝরে

যাওয়ার দৃশ্য, মধ্যাহ্নে তপ্ত হাওয়ার স্পর্শে গাছে গাছে দোলাদুলি, উড়তি ধুলোয় নীল আকাশে ধূসরতার আভাস, নানা পাখির কাকলি বাতাসে আঁকা শব্দের অস্ফুট আলপনা। এই নিসর্গ-অবগাহনের শেষে কবির মননে জেগেছে অধ্যাত্ম উপলব্ধি—

এই নিত্য বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মল্‌ করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়,
কোনো বিবোধ।

নিজের নামের বা খ্যাতির কোনো মোহ আর তাঁর নেই। তাই বর্তমানের পারে অনাগত ভবিষ্যতে নামপ্রচারের চেয়ে নিজের সৃষ্টির আনন্দে তিনি মত্ত হতে চেয়েছেন। কবি লক্ষ লক্ষ নামের মিছিলে নিজের নামকে চলার জন্যে ঠেলে দিতে চান না, তিনি নামের অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, তাই তিনি উপসংহারে বললেন—

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

এই দুটি কবিতায় কবির বিশ্বভাবনা সম্পর্কিত একটি দার্শনিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকাল দুরন্ত গতিতে ধাবমান, সেই গতির প্রবাহে পার্থিব সৃষ্টি, জাগতিক কীর্তি—সবই বিলীন হয়ে যাচ্ছে ; বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতাটির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, সৃষ্টি গতিশীল, তার নিরন্তর অকারণ অবারণ চলার উদ্দামতা—কবি তখন নিজেকে, সেই গতির মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলেন, তার মধ্যেও গতিচাঞ্চল্য

অনুভব করেছিলেন, আর আজও তিনি গতির প্রবাহ উপলব্ধি করছেন ঠিকই, কিন্তু তার মহাকালের ধ্যানগম্ভীর একটি শান্তরূপও তিনি দেখছেন। সৃষ্টির জগতে সব কিছুই আসছে, সবই ভেসে যাচ্ছে আবার, আকাশের ওই কোটি কোটি নক্ষত্র—আজ আছে কাল তারা শূন্য। মানবলোকেও ঠিক সে জিনিস ঘটছে, কত শিল্প, সভ্যতা গড়ে উঠলো, —তখন তারা কোথায়? পর্বতগাত্রের সৌন্দর্যসাধক চিত্রশিল্পীর দল আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে, তাঁরা তো নিজেদের নাম বা পরিচয়কে অক্ষয় করে যেতে চান নি, রূপসৃষ্টির আনন্দেই তন্ময় হয়েছিলেন; কবিও আজ নামের বন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন।

ন নম্বর কবিতাতেও তত্ত্বভাবনা রয়েছে। মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও কি তার আপন সত্তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারে? মূঢ়তার আশ্রয়ে থেকে মন বলতে পারে ভালবেসে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি,—নিজের কোনো পরিচয় গোপন করি নি। সত্তার সকল অভিজ্ঞান হাজার ইচ্ছে থাকলেও উন্মুক্ত করা যায় না।

সবটার নাগাল পাব কেমন করে?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।

মানবসত্তা দুরধিগম্য, তাকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, তাকে ঘিরে কত না রহস্য। এই সত্তার অতি সামান্যই আমরা জানতে পারি, বেশীটা—প্রায় সবটাই থাকে অজানা। শুধু অল্পস্বল্প—ফাঁকফুকুর দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, কিংবা নামটার পরিচয়ে যেটুকু আবিষ্কৃত হয়—অতি ক্ষুদ্র সেই অংশটুকুই মাত্র জানতে পারি।

তবু বিবিধ কামনা-বাসনায় মানুষের চিত্ত পূর্ণ থাকে, এদের মধ্যে কোনোটা বা একেবারেই অচরিতার্থ থেকে যায়; বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রায়েই তা হয়। কিন্তু সেই 'অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা' কারুর কাছে স্পষ্ট হয় না, কেউ তাকে ভাষায় রূপ দিতেও পারে না। মানবসত্তাকে নিয়ে এই যে রহস্য—কেন, তারই বা উত্তর দেবে কে? জন্ম-মৃত্যুর সংকীর্ণ সঙ্গম-

স্থলে মানবলোকে এই ব্যক্তিজগতের আবির্ভাব, সে জগতে অসফল এবং আত্মবিস্মৃত শক্তি—কে তার হিসেব রাখে?

সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

কবির তাই প্রশ্ন এই অপ্রকাশিত মানবসত্তা কার জন্যে? কিসের জন্যে? মনের কত সংবেদন কত ভাবেই না রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু অকস্মাৎ তার ধ্বংস হবে নিরর্থকতার অতলে। তবু একথা ঠিক যে যিনি শিল্পী—তিনি তাঁর প্রয়াসকে কিছু আড়ালে রাখেন, সমস্তটা না দেখেই গুণী সাধনা করে যান, কিছুটা অবোধ্য থেকে যায়।

এই কবিতায় কবিও বলছেন—মানবসত্তা মানুষের কাছে অবোধ্য, অন্ততঃ সম্পূর্ণরূপে তাকে বুঝতে পারা যায় না। শেষ স্তবকে এই অসম্পূর্ণতাজনিত বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা,
অজানার ঘোরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরই হাতে,
কারও চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি,
সবাই রইল দূরে—
যারা বললে 'জানি' তারা জানল না।

তবু যেটুকু জানা যায়—তা নিতান্তই সামান্য, তা তার চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে বাইরে যে রূপটুকু অভিব্যক্ত হয় শুধু সেটুকুই জানা যায়। এই অভিব্যক্তি হচ্ছে তার শিল্পীসত্তার বাহ্য প্রকাশ, এই হলো তার

শিল্পীসত্তার সৃষ্টি-রূপ। মানুষের কর্ম ও চিন্তার যোগফলেই তার সৃষ্টি-রূপ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার যে সমীকরণ—তা কতকটা বাইরের জিনিস, শিল্পীর যে আধ্যাত্মিক সত্তা তা কিন্তু ধরা পড়ে না তাঁর সৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—শুধু কবি, শিল্পী বা যে কোন ব্যক্তিমানসের মাধ্যমে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর ইচ্ছাকে রূপ দিয়ে যাচ্ছেন, ব্যক্তিমানুষ সেই রূপ কিন্তু পূর্ণভাবে ধরতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথও নিজের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজের অধ্যাত্মসত্তার পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছেন না, সামান্য একটু আভাস যেন পাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে বিশ্বস্রষ্টার ধ্যান তাঁর মধ্যেও সম্পূর্ণ হয় নি, তাই তাঁকে বেষ্টন করেও নিবিড় নিস্তব্ধতা। তাই কবি নিজের কাছেও নিজে অচেনা, আত্মসত্তার পূর্ণরূপ তাই অপ্রাপ্য।

কবি বাস্তব জীবনের দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছেন, তাঁর মনে হচ্ছে বুঝি অন্তহীন এই দুঃখ, নৈরাশ্যের অন্ধকারময় পথের শেষ নেই, শুধু হাতড়ে বেড়ানোই সার। এমন সময় কবির দৃষ্টি গেল অতীতের দুঃসহ দুঃখের তন্তু দিয়ে গাঁথা কিছু করুণ কাহিনীব দিকে। 'যুগান্তরের ভস্মশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায় ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে পুরাণকালের' যে সব নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা—সেগুলিব দিকে কবির দৃষ্টি পড়লো। সেসব কাহিনী যেমন করুণ, তেমনি ভয়ঙ্কর।

কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্র ঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

কত কালের দুঃখবেদনার এই শোকাবহ কাহিনীগুলি অতীতের সৃষ্টি-শালায় সংহত বীণামূর্তি লাভ করে বন্ধ হয়ে আছে মহাকালের জাদুঘরে অবহেলা এবং ঔদাসীন্যের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যটি 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থেও মূল সুরের সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু এর সংহত গাঢবন্ধ প্রকাশ-ব্যঞ্জনা এই কবিতাটিকে এমনই একটা ক্লাসিক্যাল মহিমায় উন্নীত করেছে যে বিন্যাসের দিক থেকে এটি 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের পক্ষে আদৌ বেমানান হয় নি।

এগারো নম্বরের কবিতাটি নিছক প্রকৃতিমূলক। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-প্রেমিক কবি, প্রকৃতিকে তিনি নানাভাবে এবং নানা উপলব্ধির মাধ্যমে দেখেছেন। কখনো প্রকৃতিকে তিনি স্বরূপে অবস্থিত দেখেছেন, কখনো তার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ দেখেছেন। আমাদের আলোচ্য কবিতাটিতে বাইরের রূপে প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের নয়নমনোহর শোভা-সম্পদ নিয়ে হাজির হয়েছে, এখানে প্রকৃতিকে নিয়ে কবির কোনো দার্শনিকতা নেই। ভোরের আলোয় গ্রাম্যপ্রকৃতি নয়নমোহন রূপেরই সাদামাটা বর্ণনা।

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক,
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতসবাজি।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিনে গাঁয়ের মেয়েরা যাচ্ছে হাটের পথে কচুশাক, কাঁচা আম, সজনের ডাটা নিয়ে। গরুর গাড়িতে করে যাচ্ছে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা। কবি চৌকি নিয়ে করবী গাছতলায় বসে এই সোনার সকালটুকু উপভোগ করছেন। দুটি নারকোলগাছে অস্থির বাতাসের দোলা লাগছে, মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো।

শেষ বসন্তের ঈষৎ ঠাণ্ডা আমেজ আছে এখনো বাতাসে। নেবু ঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে খেলা-পাহাড়ের গায়ে। তার মধ্যে গেরুয়া পাথরের চতুর্মুখ মূর্তির গায়ে কোনো ঋতুর ছোঁয়া লাগে না।

ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে

সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ঐ মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।
মানুষ আপন গূঢ় বাক্য অনেক কাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ করে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

ছটা থেকে এবার বাজলো সাতটা; সূর্য পাঁচিলের ওপরে উঠলো গাছের লম্বা ছায়া হয়ে এল অপেক্ষাকৃত ছোট। খিড়কির দরজা দিয়ে ছোট মেয়ে একজোড়া রাজহাঁস আর তাদের ছোট ছোট ছানাগুলি নিয়ে গেল পুকুরে চরাতে! কবির ভারি ভালো লাগছে এই সকালটুকু উপভোগ করতে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই সে যাবে চলে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ করে
আপন আনন্দভাণ্ডার থেকে।

বারো নম্বরের কবিতায় দেখি কবি মানবজীবনের সামগ্রিক পরিচয়-লাভের জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে মানুষের যে-বাস্তব সত্তা প্রত্যহের কাজেকর্মে, নিত্যকার বিবিধ পরিচয়ের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়—তা তার আসল সত্তা নয়, সেই পরিচয়ের কড়ি দিয়ে মানবের অগম সত্তার গভীরে পাড়ি জমানো যায় না। সংসারে কেউই চেনা নয়, সবাই অচেনা, অজানা। এই দিক থেকে দেখতে গেলে সবাই একা, কেউ কারো দোসর নয়। তবু বাইরের একটা পরিচয় থাকে—যার মাধ্যমে মানুষকে আমরা দৈনিক জীবন-ব্যবহারের মধ্যে, কাজে-কর্মের জগতে চিনে নিই।

সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়

মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।

সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বস্তির মধ্যে

বাঁধা মাইনেয় কাজ করে সে।

থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

মানুষ আপন সত্তাকে জানে না, অন্যের কাছেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। ইন্দ্রিয় দিয়ে মানবাত্মার স্বরূপ বোঝা যায় না।

চোখ বলে,

যা দেখলুম তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।

মন বলে,

চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য

তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,

রাত্রি যেমন আসে

পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।

এমনকি নিজেকে জানার জন্যে যখন ব্যগ্রতা জাগে, তখন নিজের অচেনা সত্তা সম্পর্কে অনুভবের বিচিত্র রহস্যের কুহক সৃষ্টি হয়, আর অতল অনুভব "তিলে তিলে নূতন হোয়।"

তেরো নম্বর কবিতায় প্রথমে কবি একটি রমণীর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তারপর সেই নারীর রূপ নিয়ে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন।

এক বাউল এসে অচিন পাখির উড়ে আসার বিষয় নিয়ে গান শুনিয়ে এই রমণীর কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে গেল, কবির মনে হলো বাউল যে অচিন পাখির কথা গানে উল্লেখ করে গেল—তা এই রমণীর মনকে উদ্দেশ্য করেই বলা। কবি এই রমণীর অন্তর-বাহির মিলিয়ে তার রূপ-ভাবুকতায় তন্ময় হয়েছেন। রূপ বা সৌন্দর্যের মধ্যে সীমা এবং অসীমের মেলবন্ধন ঘটে, নারীরূপেই বা তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? নারীর রূপ তার দেহকে কেন্দ্র করে—কিন্তু সেই রূপের যে দ্রষ্টা, সে যে তার মনে বিচিত্র ভাবের মাল-মসলায় সৌন্দর্যলোক গড়ে তোলে। কবিও ধ্যানে

মননে এই রমণীকে অতুলনীয় মহিমময়ী রূপবতী করে তুলেছেন—

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারাব তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে ;
ওতে রঙ লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।

মানুষের জীবনে প্রেম যতই আকস্মিকভাবে আসুক না তা যদি নিবিড় হয়, আত্মসমর্পণ যদি ঐকান্তিক হয় তবে তা শাশ্বত হয়ে থাকে। চোদ্দ নম্বর কবিতায় কাব এই বকম একটি ভাব ব্যক্ত করেছেন।

প্রেম যদি গভীব এবং যথার্থ হয়, তবে সেই প্রেম তখন শুধু মানবিক থাকে না মানবীয় এই ব্যক্তিপ্রেম মবজগতের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যে ভালবাসে আর যে ভালবাসা পায়—নিবিড় অনুভূতির অলখ স্পর্শে মুগ্ধ হয়। ভালবাসে যে—সে তখন অনায়াসেই বলতে পারে—'তোমাকে ভুলব না কোনদিনই।' কবি এমনই আবেগমাখা শাশ্বত প্রেমের ছোঁয়া পেয়ে গর্বিত বোধ কবেন, এ প্রেম যে তীব্র, চিরন্তন মুহূর্তেই তা অনন্তলোকেব সম্পদ হয়ে যায়।

সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তেব আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসাবিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমাব নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।

মৃদু, সহজ, প্রশান্ত প্রেমের আচম্বিত অথচ অবিনশ্বর পরিচয়ই এই কবিতায় বিচিত্র রেখায় চিরন্তন রহস্যের স্তিমিত ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিলাভ করেছে।

১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ নম্বরের কবিতা চতুষ্টয় পত্রের ঢঙে এক একজনকে উদ্দেশ করে লেখা। বস্তুত: এগুলি সরল গদ্যেই আগে পত্রাকারে কবি লিখে প্রাপকের কাছে পাঠিয়েছিলেন, পরে গদ্য কবিতায় সেই বক্তব্যকে রূপদান করেন, কারণ এগুলির পেছনে কবির একটি দার্শনিক মন প্রকাশিত হয়েছে।

পনেরো নম্বরের পত্রটি শ্রীমতী রানীদেবীকে লেখা। বাসাবদল করার খবর দিয়ে এটির শুরু, কবি দুটি ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন, ছোট ঘরই তাঁর মনের মতো। বড় ঘর শুধু বড়োর ভান করে, আসল বড়কে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলে দেয়, তিনি আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চান না, দূর আকাশকে স্বস্থানে পেতে চান। জানলার পাশে বসে কবি ভাবেন সুন্দরের মধ্যেই দূরের অবস্থান, পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও সুন্দর সব সীমাকে এড়িয়ে যায়। নিজের মনের অহংকারকে নষ্ট করতে পারলে, সুন্দর আপনিই ধরা দেয়, চিরদিনের সুন্দর তখন প্রতিদিনের মধ্যে প্রতিভাত হয়, নইলে সুন্দর 'প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আল্‌গা।' কবি কবিতা লেখেন, দূরকে নিয়ে তাঁর খেলা। বিষয়ীর সংসারে আসক্তি হলো পাঁচিল, আসক্তি যেমন প্রেমকে নষ্ট করে তেমনি ভাবে, এই পাঁচিল আড়াল রচনা করে দূরের থেকে।

কিন্তু কবি যখন নিরাসক্ত হন, তখনই তাঁর কাছে দূরের আকাশ প্রতিভাত হয়, অনির্বচনীয়ের স্পর্শ পান। প্রকৃতির রূপাভিব্যক্তিতে, মানুষের অপরূপ দেহ-সৌন্দর্যে তিনি সেই অনির্বচনীয়ের প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারেন। তখন যাবতীয় দৃশ্যের মধ্যেই রূপাতীতের সৌন্দর্য ধরা পড়ে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও অলৌকিক রূপের অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হয়। তিনি তখন পালকি বাহকের পাথরে খোদাই করার মতো কালো-রঙের চেহারার মধ্যে দেবতার মূর্তি দেখতে পান।

মনে পড়ে একদিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পাল্কিতে অপরাহ্ণে ;
কাহার ছিল আটজন।
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি ;

এই পনেরো নম্বর কবিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে কবি তাঁর চিত্র-রচনার প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেছেন। জগতে যে রূপাভিব্যক্তি—তারই এক একটি কণা কবি তুলির আঁচড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। বিশ্বকে কবি যতই নিবিড় করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন, ততই বিশ্ব-সত্তার বিবিধ রূপ প্রকাশে তিনি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।

এর আগে কবি বিশ্বকে ভাব এবং ধ্বনির মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন, ব্যক্তও করেছেন আজ বিশ্বজগতের দিকে তাকিয়ে মনশ্চক্ষে তিনি দেখছেন সংসারটা আকৃতিরই মহাপ্রকাশ। কবি উপলব্ধি করলেন রেখা দিয়েই বিশ্বের পরিচয়। কবিও তাই রেখায় ধরতে চেয়েছেন রূপকে। বিশ্বস্রষ্টা যিনি তিনিও তাঁর গড়া এই জগতের রূপৈশ্বর্য দেখেছেন, কবিও নিজে যা আঁকছেন, তাই নিজে দেখছেন। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন, কবিও তাঁর পাদপীঠে বসে নিজের রচনা দেখছেন।

কবিতাটির প্রকাশে কবির প্রাজ্ঞমনের দুরূহতার স্পর্শ লেগেছে। ভাবকে বস্তুর উপমানে এনে তিনি সাদৃশ্যমূল অলংকারের সাহায্যে এই দার্শনিক তত্ত্বকে কাব্যে উন্নীত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল

আকারের নৃত্য ;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।

অমিতাব আনন্দসম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা—
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয় ;
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া।

অংশটি অপেক্ষাকৃত দুরূহ মনে হতে পারে। বিশেষ করে উদ্ধৃতির শেষ চার পঙ্‌ক্তি। অসীম শূন্যতার বুকে বিবিধ বেখার অভ্যুদয়, যেমন অন্ধকাব আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের আবির্ভাব চিবকাল ধরেই ঘটছে। অসীমের বাণী এমনি কবেই অভিব্যক্তি লাভ কবে। অসীমেব আনন্দকে (অমিতাব আনন্দসম্পদ) সীমিতজগৎ (সুমিতা) রূপেব পসবায় সাজিয়ে গুজিয়ে আলোব অভিব্যঞ্জনায় প্রকাশ কবে চলেছে।
সৃষ্টিকালেব আদিলগ্ন থেকেই ঘোষিত হচ্ছে যে আদিম ধ্বনি—'দেখো' কবি তা দেখেছেন। তাই তাঁব রূপেব প্রতি এই আসক্তি।
'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থেব ২৬ এবং ২৭ নম্ববেব দুটি পত্রে কবি পনেবো নম্ববেব কবিতাটির কথা প্রাঞ্জল কাব্যময় গদ্যে প্রকাশ কবেছেন। তিনি লিখেছেন—"আজকাল বেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তাব হাত ছাড়াতে পাবছি নে। কেবলই তাব পবিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গিব মধ্যে দিয়ে। তার বহস্যেব অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পবে তাঁব মনেব কথা জানতে পারছি। অসীম অবাক্ত, রেখায় বেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করেছেন—আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আব কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপবিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি—মন বলে ওঠে, নিশ্চিত

দেখতে পেলুম—তা সে যাকেই দেখি না কেন।”

ষোলো নম্বর কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ করে লেখা। এখানে কবি তাঁর ছবি আঁকার কথাই প্রকাশ করেছেন, ভালো হোক মন্দ হোক রঙে রেখায় তাঁর মন বাঁধা পড়ে আছে। কবিতা লেখার দায়িত্ব অনেক, খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ধ্বনিকে সম্মান দিতে হবে। ছন্দ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবির স্বাধীনতা নেই, কিন্তু রঙ আর রেখার রাজ্যে কবির মুক্তি। তিনি তাই বলেন—

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়
কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে ক'রে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।

কথার কঠিন শাসন, কবিকে একটুও প্রশ্রয় দেয় না, রেখা কিন্তু যথেচ্ছচারে হাসে, তর্জনী তোলে না। তাই কবির মনের মধ্যে যে লক্ষ্মীছাড়া অনেকদিন ধবে লুকিয়ে ছিল, আজ সে সাহস ভরে বেরিয়ে পড়েছে, নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য না করে, ভালোমন্দ বিচার না করে আঁকতে বসে গেছে।

কবি এজন্য খ্যাতির প্রত্যাশী নন, কীর্তি বা সুযশের জন্যে, নাম রক্ষার জন্যে নয়, আপনাব খেয়ালের বশবর্তী হয়েই তিনি তুলি হাতে নিয়েছেন।

সতেরো নম্বর কবিতাটি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে লেখা। গানের সম্পর্কে কবি তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। মানুষের জ্ঞান ভাষা-রূপ লাভ কবেছে; পাণ্ডিত্যকে ভাষায় ব্যক্ত করা, কিন্তু মানুষের বোধ অবুঝ, তার ভাষা নেই, সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বোবা, সে ইঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করে, ছন্দে নৃত্যে, ভঙ্গীতে। অণুপরমাণুপুঞ্জ যেমন নাচের চক্র রচনা করে

সীমার জগতে অসংখ্যরূপ গড়ে তুলেছে, মানুষের বোধের বেগও তেমনি, প্রকাশের জন্যে সে নৃত্য, সুর, ভঙ্গী খোঁজ করে। এই বোধ যখন নৃত্য, ছন্দ, তাল, লয়, ভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হয়—তখনই সেই বোধের প্রকাশ ঘটে, তখনই সংগীত জন্মলাভ করে। পণ্ডিত জ্ঞানের রাজ্য থেকে সব জানতে পাবেন, কিন্তু রসের সাগরে উপলব্ধির ভেলায় চড়ে বসেছেন যিনি—তিনিই সুরবেত্তা, গান তারই জন্যে।

১৮নং কবিতাটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা। শোক এবং শোকপ্রকাশ করার অহংকার সম্পর্কে কবি তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। মানুষেব নানা বিষয়ে গর্ব থাকে, কিন্তু শোকের যে অহংকার—তা সকলের চেয়ে বড়ই হবে। আমবা কি সত্যই শোকের অবসান চাই? কার শোক কত বড় তা নিয়েই আমাদের গব। আমাদের প্রিয়তমেব মৃত্যু শুধু একটি মাত্র দাবি বাখে আমাদের কাছে, বলে 'মনে রেখো।' আমরা যেন ভুলে না যাই। কালের চলাচলেব পথে কত নূতন, কত বিচিত্র এসে ভিড় করে, অবিরামধাবিত চাকাব তলায় গুরুতব বেদনা, শোকানুভূতি গুঁড়িয়ে যায়, ঝাপসা হয়ে অস্পষ্টতা লাভ করে, জীর্ণ হয়। কিন্তু তা আমবা কি স্বীকার করি, শোকাবেগ লঘু হয়েছে, বেদনাব তীব্রতা কমেছে—একথা কি বলি? তবু মনে রাখাব অতীতকালেব সেই আবেদন বর্তমান যুগের ভিড়ের মধ্যে কখন অগোচবে হাবিয়ে যায়! যদি বা ফিকে হয়ে তার কথা থাকে, ব্যথাটা যায় চলে। তবু শোকের অভিমান জীবনকে বঞ্চনা করে, প্রাণের ক্ষেত্রে শোকচিহ্নের ফলক আঁকা একখণ্ড জমি নির্দিষ্ট করে রাখতে চায়।

> প্রাণের ফসলখেত বিচিত্র শস্যে উর্বর
> অভিমানী শোক তারি মাঝখানে
> ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি—
> সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
> তার খাজনা দেয় না জীবনকে।

অথচ শোকের সঞ্চয়গুলি মনে ম্লানিমার ছায়ায় ধূসর হয়, কিন্তু তবু

মানুষ শোকের ব্যাপারে হার মানতে চায় না। শোকের অহংকারের কঠিন বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।

১৯নং কবিতায় কবি এক গভীর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। আমরা মানুষকে বাইরের আচার আচরণে, ধর্মে কর্মে যেভাবে জানি, সে জানা ঠিক জানা নয়, এ তার ছদ্মবেশ, এর আড়ালে আছে আসল মানুষটা, যথার্থ প্রেম এই ছদ্মবেশকে ঘোচাতে পাবে।

কল্পনায় রোমান্টিক কবি তাঁর স্বপ্নের জগতে চলে গেছেন। কাঁচা-বয়সে রূপকথাব রাজপুত্রের মতোই বুঝি কোন্ এক অপ্রাপণীয় রাজ-কন্যার সন্ধানে ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে ভর সন্ধ্যেবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন! তখন তাঁর কাঁচা বয়স, তাই স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন তিনি। তখন

তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে ;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।

এখন পরিণত বয়সে বাস্তব সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে কবির, সংসারে কল্পনার স্থান সামান্যই, অজানার স্বাদও। আর মনকে সতেজ করে না। ভালবাসার দ্বারা সম্ভবের মধ্যেই অসম্ভব, জানার মধ্যেই অজানাকে পাওয়া যায়, সংসারের প্রিয়াই ভালবাসার মধ্যে সেই সাতসাগরের পারের কল্পলোকের প্রেমপ্রতিমা হয়ে ধরা দেয়, ভাল-বাসার সোনার কাঠি ছুঁইয়েই তার মায়ার ঘুম দূর করাতে হয়।

নিজের অভ্যস্ত রীতিতে লেখা আগেকার কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির ঈষৎ অপছন্দের ভাব ফুটে উঠেছে এখানে, এবং আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁর বাণীকে পৌছে দেবার জন্যে রীতি-কাঠিন্যের দুরূহ জাল থেকে মুক্ত সহজ নিরলংকৃত গদ্যকবিতার মাধ্যমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। 'পুনশ্চে'র 'নতুনকাল' কবিতাতেও আমরা দেখেছি যে তিনি জনগণের সাবিক চেতনাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন—তাই গৃহস্থ-

পাড়ার সাধারণ ভাষাও তাঁর কাছে অনাদৃত নয়। শেষসপ্তকের কুড়ি নম্বর কবিতাতেও সে কথার প্রতিধ্বনি পাই।

আকাশের নিচে রাঙামাটির পথের ধারের সভায় শ্রোতার অনুরোধে কবি এতদিনকার রচিত কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে দেখলেন অভ্যস্ত-রীতির কবিতাগুলি বড় কোমল।

এরা সব অন্তঃপুরিকা
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে,
তার উপর ফুলকাটা পাড়
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।

এই পথের ধারের সভায় এদের মানায় না, এখানে আসার ছাড়পত্র পাবে তারাই যাদের সংসারের বাঁধন খসেছে, যাদের গতি অক্লান্ত এবং অসংকোচ, গায়ের বসন ধূলিধূসর। এতদিন স্বল্পসংখ্যক ভক্ত ছিল, কবির সেই ভক্তের দল সুশৃঙ্খল কাব্যকে সমাদর করে এসেছে, আজ জনসাধারণের সকলেই কবির ভক্ত, তাঁর কাছে রসের প্রত্যাশী, তাই কবিকে কুসুমকোমল রোমান্টিক ভাবালুতার বদলে কঠিনকঠোর বাস্তবকে সুন্দরের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

তাই আর কবির সভা করা হলো না, উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে।

ওরা বললে, "কোথা যাও কবি?"
আমি বললেম
"যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।"

কবি যে গদ্যরীতির কাব্যভাষার মধ্যে দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে হাজির

হতে চাইছেন—সে অভিলাষ এখানে স্পষ্টই ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি কেন গদ্যকবিতার পক্ষপাতী তার কারণ নির্ণয়ে বলছেন—"কবির গণতান্ত্রিক বিবেক অতিমাত্রায় জাগ্রত হইয়া তাঁহার মনে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে তাঁহার কাব্যচর্চায় সুলভ কল্পনা—বিলাসমাত্র, পৃথিবীর বেদনার সহিত ইহার নাড়ীর কোন যোগ নাই। সুতরাং কবিতার সমস্ত কারুকার্যখচিত বৈচিত্র্য পরিহার করিয়া তিনি কথ্যভাষার অলংকারবর্জিত রিক্ততাকে বরণ করেন ও এই উপায়ে জনসাধারণের চিত্তের সহিত নিজের নিবিড় সংযোগসাধনে প্রয়াসী হন।"[৬] অবশ্য এটি সমালোচকের নিছক সংশয়—একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, তবে আলোচ্য কবিতার পটভূমিকায় এই ব্যাখ্যাটি একেবারে তাৎপর্যহীন নয়।

২১নং কবিতায় কবি মহাকালের চত্বরে ধ্বংসের করালরূপের পরিচয় দিচ্ছেন। মৃত্যু সবকিছু মুছে দেয়। বিপুল মহাবিশ্বে সবকিছুরই অস্তিত্ব ক্ষণকালীন। বিরাট যেসব গ্রহনক্ষত্র নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, যেমন তাদের আবির্ভাব ঘটছে, তেমনি তারা অচিরাৎ বিলীনও হয়ে যাচ্ছে। মানবসভ্যতারও একই হাল, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কত বিরাট বিরাট সভ্যতার উদয় হয়, আবার তারা কোথায় মিলিয়েও যায়। প্রাগৈতিহাসিক কালের অতীত সভ্যতা যেমন—হরপ্পা কি মহেঞ্জদারো আজ কোথায় সেসব? কিন্তু মহাকাল নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উদয়-বিলয়ে কিংবা মানবসভ্যতার উত্থান-পতনে—তাঁর কিছু যায় আসে না; তিনি অক্ষুব্ধ শান্তিতে বিরাজমান। কবি মহাকালের সেই অক্ষুব্ধ শান্তির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

এই কবিতায় কবি মহাকালের কল্পনা করেছেন, সেই সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র জ্যোতিষ্কের উত্থান-পতনের কথা বলেছেন, ফলে কবিতাটিতে সাব্লাইমের মহিমা সঞ্চারিত হয়েছে। কত কোটি কল্পান্ত ধরে মহত্তম বৃহত্তম সৃষ্টি জন্মাচ্ছে, লয়প্রাপ্তও হচ্ছে। মানবসংসারে

অঙ্গনেও বুদ্‌বুদের মতো সভ্যতার উদয় হচ্ছে, বিলীন হতেও সময় লাগছে না।

বুদ্‌বুদের মতো উঠল মহেন্দজারো,
মরুবালুব সমুদ্রে নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে ;
কাঁচা কালিব লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

মানুষেব মধ্যে যারা বীব—তারা দম্ভ কবে বলেছিল আকাঙ্ক্ষার অক্ষয় কীর্তিপ্রতিমা গড়ে অমর জয়স্তম্ভ রচনা কববে। কবিবা বলেছিল সেই আকাঙ্ক্ষাব বেদনাকে অমব কবে রাখবে মহাকবিতা রচনা কবে। কিন্তু সময়েব স্রোতে যুগের জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়লো, কবির মহাকাব্য নীবব হলো। এই ভাঙাগড়া'র মধ্যে মহাকাল অক্ষুব্ধ শান্তিতে বসে আছেন, কবি আজ তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে জানাচ্ছে যে মানুষের যে অমরতাব আয়োজন—তা শিশুব হাতের শিথিল মুঠোয় ধরে থাকা খেলনার মতোই। তবু মানুষেব জীবনে অমৃতময় ক্ষণমুহূর্তগুলি তাদের মধ্যে একটা অক্ষয় আশীর্বাদ আছে, যুগের জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়ে, কিন্তু তাবা বেঁচে থাকে। তাই কবি মানবজীবনেব ক্ষুদ্র স্বল্পস্থায়ী অমৃতময মুহূর্তগুলিব প্রতি বেশী আকর্ষণ অনুভব করছেন।

২২নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের দেহ এবং প্রাণকে ভিন্ন করে দেখেছেন। দেহে আসে জরা, কালধর্মে প্রৌঢ়ত্বের পর দেহ বার্ধক্য-কবলিত হয়। কবি তাই তাঁর প্রাণ এবং জরাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। দেহ জরাজীর্ণ হয়, মৃত্যু তাকে শাসন করে, শেষে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রাণের তো মৃত্যু নেই। প্রাণ যেহেতু দেহকেন্দ্রিক,

দেহেই তার অধিবাস, তাই কখনো কখনো দেহের কামনা বাসনা প্রাণেও কি সঞ্চারিত হয় ? দেহে এবং প্রাণে এমন মেশামেশির জন্যেই বুঝি এমনটা সম্ভব হয়েছে।

'শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে' বলে কবিতাটির আরম্ভ। এখানে 'আমি' প্রাণের বদলে এবং 'ও' দেহের বদলে বসেছে। আদিম কাল থেকেই দেহ প্রাণের আশ্রয়। বার্ধক্যের কবলে দেহ জীর্ণ, বাসনার আগুনে দেহ পুড়ে মলিন হয়, তাই মাঝে মাঝে দেহের এ-হেন দুর্গতিতে প্রাণের মমতা জাগে।

মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

প্রাণের কোনো আসক্তি নেই, তাই যাচ্ঞাও নেই কোথাও, কারুর কাছে। কিন্তু দেহের চাই আরাম, তাই আসক্তিতে ভরা, তাই ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েই দেহকে জন্মমরণের মাঝখানে যে আল-বাঁধা ক্ষেত— সেখানে থেকে তাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু প্রাণ মুক্ত, স্বচ্ছ, নিত্য, অকিঞ্চন, অপরিবর্তনীয়—অহংকারের পাঁচিল দিয়ে তাকে ঘেরা যায় না।

এই কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস মশাই লিখেছেন— 'এ হ'ল কবি-সংস্পর্শে আমাদের বহুপরিচিত বাইরের স্বরূপ এবং অন্তরাত্মার মর্মবস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। একদিকে সুখদুঃখে ও আশা-নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ কৌমার-যৌবন-জরায় পীড়িত বাইরের আমি, আর অন্যদিকে অনন্ত জীবনের অভিলাষী জরামরণহীন অন্তরসত্তা। এই বহিঃস্বরূপের বর্ণনায় তাকে ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত ক'রে বিশিষ্ট রূপ দান করার মধ্যে চমৎকার ফুটেছে।'[৭]

তেইশ নম্বর কবিতাটিতেও কবির আধ্যাত্মিক চেতনা রূপলাভ করেছে। নিত্যদিন অভ্যস্ত চোখে যে জগৎ আমরা দেখি—তার মধ্যে বৈচিত্র্য

সহজে ধরা পড়ে না। সহসা যদি নতুন চোখে চিরাভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মোহ বাতিল করে প্রকৃতিকে দেখা যায়, তবে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করা যাবে। কবি শরৎকালের আলোয় সহসা আবিষ্কার করলেন চিরনবীনকে, অভ্যস্ত প্রাত্যহিক ধূলিমলিন জগতে যাকে সহসা পাওয়া যায় না। কবির দৃষ্টি খুলে গেছে, তিনি আপনাকে দেখেছেন আপনার বাইরে, আজ সব কিছুই তাঁর চোখে মহীয়ান্ ঠেকছে। অনাদৃত আজ অসামান্য রূপ নিয়েছে। কবির নগ্ন চিত্ত আজ সমস্তের মধ্যেই মগ্ন হয়েছে।

জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর,
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে
দেখা দিল অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায়নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,

প্রকৃতির শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায় কবির প্রাণপ্রবাহ মিশে গেছে যেন প্রাত্যহিক তুচ্ছতাব মধ্যেও কবির চোখে প্রকৃতির নবীনতা, অনাদৃতের মধ্যেও সমাদরের বস্তু—ধরা পড়েছে, উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, যেমন করে সহমরণে হিন্দুর বধূ মৃত্যুর আকস্মিকতার ভেতর দিয়ে 'চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ'কে দেখে।

চব্বিশ ও পঁচিশ নম্বরের কবিতা দুটিতে কবি গদ্যকাব্য সম্পর্কে আর একবার গদ্যকাব্যের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। গদ্যকাব্য নিয়ে কবি গদ্যে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন, গদ্যকাব্যের চরিত্রধর্ম কি এবং কেন তা সমর্থনযোগ্য—সে কথাও বলেছেন। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের প্রসঙ্গে গদ্যকাব্য সম্পর্কে আমরাও সে সব কথার কিছু আলোচনা করেছি।

সুতরাং এখানে গদ্যকাব্য নিয়ে সাধারণভাবে কিছু বলার নেই। এই কবিতাগুলিকে কেন্দ্র করে কবি কেমন করে গদ্যকবিতার স্বরূপ ও স্বভাবধর্মকে ব্যক্ত করেছেন—আমরা এখানে শুধু সে কথারই উল্লেখ করবো।

সাধারণ কথায় কবি গদ্যকাব্য কাকে বলে—তা বর্ণনা করেন নি। রূপকের আড়ালেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। ফুল, ফুলবাগান, ফুলের টব প্রভৃতি উপমানেই তিনি তাঁর কাব্যকে উপমেয় করে উপস্থিত করলেন।

চব্বিশ নম্বর কবিতাতে তিনি বলছেন—তিনি আজ তাঁর বাগানের ফুলগুলিকে তোড়ায় বাঁধবেন না, রঙবেরঙের সুতো আর জরির ঝালর পড়ে থাক। ফুলদানীতে তবে ফুলের স্থান হবে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তরে কবির জবাব হলো :

"আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্ণে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি—
তাই নিয়ে খুশি থাকো।"

বন্ধু এসে কবির কাছে ছন্দোবদ্ধ কবিতাপাঠের তৃষ্ণা জানায়। ছন্দের পুরানো পেয়ালায় তৃষ্ণা মেটানোর আয়োজন আজ নয়, ঝরনা-ধারার আপন খেয়ালে সরু মোটা রেখায় ছুটে চলা জলের শিক্ষাতেই আজ কবি দীক্ষিত। সভার লোকে প্রশ্ন তোলে—এ যে কবির আবাঁধা বেণীর বাণী, সে বন্দিনী আজ কোথায়? কবি উত্তর দেন—তাকে আজ চিনতে পারা মুস্কিল, তার গলায় নেই সাতনলী হার, নেই চুনিবসানো কঙ্কণ। ও আজ গাছে ফোটা ফুলের মতো—পাতার ভেতর থেকে ওর

রঙ দেখা যাবে, হাওয়ায় ভাসবে গন্ধ।

"চার দিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।"

স্বাভাবিক পরিবেশে এতটুকু কৃত্রিমতার আরোপ না ঘটিয়ে শব্দশক্তির ব্যঞ্জনা ধর্মের ইঙ্গিত দেওয়াতেই গদ্যকাব্যের সার্থকতা। শব্দশক্তি বহু ব্যবহারে তার ইঙ্গিত দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কবির ব্যবহার-কুশলতায় যদি নতুন করে শব্দ তার সজীবতা এবং ইঙ্গিত-দ্যোতনার আমেজ নিয়ে আবেগ সঞ্চারে সমর্থ হয়—তবে তাকে অভ্যর্থনা না জানাবার কিছু নেই। ছন্দের দোলা মিলের চমক অলংকরণের সৌকর্য কাব্যকে আলাদা একটা সৌন্দর্যে ভূষিত করে সন্দেহ নেই, যেমন গাছ থেকে তোলা ফুল নিয়ে জরির ঝালরে রঙীন সুতোয় তোড়া গাঁথলে তা সুষমামণ্ডিত হয়। কিন্তু ফুল যদি গাছে থাকে, হাওয়ার ঝাপটে গন্ধকে বিকীর্ণ করে, প্রকৃতির আসর তখন কি শ্রীহীন ঠেকে? জীবনের উপভোগের ক্ষেত্রে ফুলকে মালায় গেঁথে বা তোড়ায় আটকে রাখার দরকার ঠিকই, কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশেও ফুলগুলি কখনো-সখনো আনন্দভাজন হয়। তেমনই কবিতার বক্তব্যের ক্ষেত্রেও ছন্দমিল অলংকার অনেকখানি, তবে কখনো কখনো এগুলি ছাড়াই জীবনের কথাগুলি স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপনার মধ্যে অকৃত্রিম একটা ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, কাব্য তখন আপনি হাজির হয়। নটী সব সময়েই চড়া রঙে সাজসজ্জা করে নাচ দেখায়,—কিন্তু স্বাভাবিক চলনের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে সজ্জা থেকে চড়া রঙের উজ্জ্বলতা ঘুচিয়ে যখন নটী হাঁটাচলা করে—তখন তার গতিতেও একটা সহজ শ্রী থাকে। সে-ও তো কম পাওনা নয়। কবির সৃষ্টিতে কবি আজ স্বাভাবিক রঙের

ছোপ লাগিয়ে দিতে চেয়েছেন। সৃষ্টিকে মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করতে হয়, তাই স্বাভাবিক পবিবেশে রেখেও তা করা যায়, আবার তাকে স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে তুলে এনে নতুন পটভূমিতে নবরূপেও গড়া যায়। গদ্য-কবিতাকে কবি স্বাভাবিকতারই বিকাশ বলে জানাতে চাইছেন।

পঁচিশ নম্বরের কবিতার বক্তব্যও এই। টবের গাছেও ফুল ধরে, বাহার ফোটে, অরণ্যের অবিন্যস্ত গাছের পুষ্পিত সৌন্দর্যও মন লুটে নেয়। ফুলকাটা চীনের টবে সাজানো গাছের ফুলকে কবি তাঁর ছন্দে মিলে গাঁথা কবিতার সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে তুলনা করেছেন। তিনি এতদিন যেসব মিলবদ্ধ কবিতা লিখেছেন, অলংকৃত সৌন্দর্যে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন—সেগুলি আভিজাত্যের অহংকারে উচ্চকিত, সে যেন সযত্নে-সাজানো বাগানের নিয়মমাফিক ক্ষোদাই করা সৌন্দর্য। সেই বাগানকে দেখে মনে হয় সে যেন 'মোগল বাদশার জেনেনা—রাজ-আদরে অলংকৃত।' কিন্তু সেই বাগানের অনতিদূরে অবিন্যস্ত চারায় নাম-না-জানা অনাদৃত যেসব ফুল ফুটে আছে—তাদের মাথার ওপরেও থাকে অবারিত নীল আকাশের দিগন্ত-বিস্তৃত মহিমা, তারা সহজ এবং নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা নয়, ওরা ব্রাত্য, আবার মুক্ত, অথচ ওদের মজ্জার মধ্যে আছে সংযম। কবির মনে লাগলো ওদের ইঙ্গিত।

বললেম, "টবের কবিতাটিকে
রোপণ করব মাটিতে
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।"

এর আগে আমরা বিশ নম্বর কবিতাতেও এই সুরের পূর্বাভাস পেয়েছি।

কবি ভালোবাসেন জীবনকে, বিশ্বজগৎকে। বিশ্বস্রষ্টার এই সৃষ্টির প্রতিও কবির মমতা এবং ভালোবাসা; এই ভালোবাসার কথা ধ্বনিত হয় আকাশে বাতাসে, প্রকৃতির জগতে সৃষ্টির সর্বত্র,—বিশ্বের সর্বত্রই

ঘোষিত হচ্ছে সৃষ্টির শাশ্বত বাণী—ভালোবাসি। সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্ন থেকেই অন্তহীন ভালোবাসার এই মন্ত্রবাণী ধ্বনিত হয়ে আসছে। কবি এই মন্ত্রেরই সাধক সমস্ত জীবন ধরে ভালোবাসার এই মন্ত্রকে মূর্ত করে তোলার সাধনাই তিনি করে এসেছেন। আজো তিনি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে, দিনান্তের অন্ধকারের সামনে এসে এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা—সব কিছুকে ভালোবাসার মন্ত্রে উদ্ভাসিত করে তুলতে চান—এই তাঁর বাসনা। বিশ্বলোকের এই ভালোবাসার বাণীটি তিনি যেমন নিজে শুনেছেন—তেমনি তিনি তাঁর জীবনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

কবি প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে তাবৎ মানবসংসারকে প্রাণভরে ভালবেসেছেন, এই ভালবাসার মন্ত্র তিনি লাভ করেছেন বিশ্বহৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে। এই কবিতার একটি ছন্দোবদ্ধরূপ 'মর্মবাণী' নামে ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসেব 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্ররচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে 'সংযোজন' অংশে এই কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।

মানুষের পক্ষে ভালবাসার মন্ত্রকে প্রকাশ করা খুব সহজ নয়, অথচ অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যাবে অপ্রয়োজনের সেখানে অখণ্ড অবসর, তাবই মধ্যে তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ চলে, এক বস্তু অন্য বস্তুকে ভালবাসার আকর্ষণে কাছে টানে। অথচ মানুষের চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালপনায় প্রীতির মন্ত্র হারিয়ে যায়। কবির মনও প্রয়োজনের নানাডোরে বাঁধা, ছেলেবেলার কুয়াশা জড়ানো অস্পষ্টতার মতোই তাঁর ভাষা আর সুর। সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো মাথা তুলে বলতে পারে না—"ভালোবাসি।"

> তাই ওগো বনস্পতি
>
> তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
>
> শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
>
> আমার বাণী।

কবি বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে অখণ্ড অবসরের মধ্যে নিজেকে ন্যস্ত করে অন্তরে বিশ্বপ্রীতিমন্ত্র উপলব্ধি করতে চান, জীবনের শেষ বাণী যেন 'ভালোবাসি' বলেই উদ্ভাসিত হতে পারে। সাতাশ নম্বরের কবিতায় কবি প্রয়োজনহীন প্রকৃতি প্রীতির আনন্দকে ব্যক্ত করেছেন, কবি অপ্রয়োজনের আনন্দ উপলব্ধি করতে গিয়ে নিজের ওপর গ্রাম্যবধূর মনটিকে আরোপিত করেছেন। প্রয়োজনের যে কাজ—তা সমাধা করতে একটি নির্দিষ্ট সময় লাগে, কিন্তু অপ্রয়োজনের কাজের আর শেষ নেই। এই কবিতাটিরও একটি ছন্দোবদ্ধ রূপ ১৩৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে 'ঘটভরা' নামে আমরা প্রকাশিত হতে দেখেছি। গ্রাম্যবধূ ছোট কলসী পেতে রেখে পাহাড়ী ঝরনা থেকে জল ভরে নিতে চায়, সেজন্যে সে সারা সকালবেলা শেওলাঢাকা পিছল পাথরটাতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। ঘট ভরে যায় নিমেষেই, প্রয়োজনের কাজ ফুরোয় বটে, কিন্তু অপ্রয়োজনের কাজের তো শেষ নেই, কলসীর কানা ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বিনা কাজে, সূর্যের আলোয় উপচে পড়া জল ছুটির খেলায় মাতে, খেলা ছল্‌কে ওঠে মনের মধ্যে, সবুজ বনের মিনে করা উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা---পাহাড়-ঘেরা তার কানা ছাপিয়ে ঝরঝরানির শব্দ। জলের ধ্বনি বেগনী রঙের বনের সীমানা পেরিয়ে যায়, গ্রামের চড়াই উৎরাই রাস্তা ছেড়ে দূরে। এমনি করে প্রথম প্রহর কেটে গেল, রাঙা সকাল গড়িয়ে গেল সাদা দুপুরে, বক উড়ে গেল জলার দিকে, শঙ্খ চিল ঊর্ধ্বমুখ নীল পর্বতের উধাও চিত্তে নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো উড়তে লাগলো।

বেলা হল,
ডাক পড়ল ঘরে।
ওরা রাগ ক'রে বললে,
"দেরি করলি কেন ?"
চুপ করে থাকি নিরুত্তরে।

ঘট ভরতে দেরি হয় না—সেকথা সকলে জানে, কিন্তু বিনাকাজে উপ্‌চে পড়া সময় খোয়ানোয় যে অপ্রয়োজনের অনাবিল আনন্দ—সেই খাপছাড়া কথা বোঝানো যাবে কি করে?

এই জাতীয় প্রয়োজনহীন নিসর্গভাবুকতার পরিচয় আমরা 'খেয়া' গ্রন্থে এর আগেই পেয়েছি।

শুকতারা সম্পর্কে কবির লৌকিক এবং বৈজ্ঞানিক ধারণার কাব্যায়ন, সাধারণ মানুষ শুকতারাকে কি ভাবে এবং কেমন করে দেখে, আর এই শুকতারা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাই বা কি—কবি সে কথাই ব্যক্ত করেছেন, তাঁর এই অভিব্যক্তিকে তিনি কাব্যরসে সিক্ত করে নিজের অনুভবলোকের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছেন, তাই ২৮নং কবিতায় শুকতারা সম্পর্কে তিনি বলছেন—

শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।
সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।

কবি এমনি করেই শুকতারাকে আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী বলেই ভেবেছেন।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শুকতারাকে শুক্রগ্রহ বলে জেনেছেন, সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণ পথে সে পৃথিবীর সহযাত্রী, রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা তার কণ্ঠে। এই গ্রহ স্বতন্ত্র, সুদূর, নিজের রহস্যেই অবগুণ্ঠিত, বিজ্ঞানের জগতে শুক্রগ্রহ একান্ত সত্য বটে, কিন্তু তার চেয়েও সত্য মানুষের কল্পনালোকে, সেখানে সে মানুষের আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা—সেখানে সে ছোট, সুন্দর, পৃথিবীর হেমন্তকালের শিশিরবিন্দুর মতো,

শরৎকালের শিউলি ফুলের মতো, এই শুকতারা সকালে জীবনযাত্রায় মানবপথিককে নিঃশব্দে সংকেত করেছে, আর সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছে চরম বিশ্রামে।

শুকতারা সম্পর্কে লৌকিক এই বিশ্বাসের সঙ্গে কবির অনুভূতি যুক্ত হওয়ায় কবিতাটি তত্ত্বহীন হয়েও 'শেষ সপ্তকে' গ্রথিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে শুধু বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যেব জন্যে। কবি বলতে চেয়েছেন যে একই জিনিস বৈজ্ঞানিকের কাছে যে সত্যমূল্যে বিচার্য হয়েছে, লৌকিক উপলব্ধিতে সে ভিন্ন সত্যমূর্তি হয়ে ধরা পড়েছে। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে কবিতাটির এই রকম সারমর্ম ধরে নিতে পারি যে মানুষের অনুভব লোকেই বস্তুর রূপ-প্রতিমা, মানুষ যদি সুন্দরকে উপলব্ধি না করে, তবে তার রূপের অহংকার মিথ্যা হয়ে যাবে। ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেছেন বটে, কিন্তু মানবীয় অনুভূতির মধ্যেই সে জগতের আসল রূপ ধরা পড়ে।

২৯নং কবিতাতে কবি একটি ক্ষণিক আবেগ, হঠাৎ খুশি কিংবা বলতে পারি খেয়াল, একটি ভাববিলসিত লঘু শিথিল মুহূর্তকে রূপের ও রহস্যময়তার আলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন! এখানে কবির আবেগ কেমন যেন স্তিমিত, গভীব প্রেরণার কোনো ইঙ্গিত নেই, কেমন যেন শিথিল ঔদাসীন্য কবিতাটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। অতীতের স্মৃতিচারিতা আছে, কবির মনে পড়ছে, কবে যেন কোন্ একটা দিন তাঁর মনে গাঁথা হয়ে আছে, স্রোতে ভাসতে ভাসতে শেওলা যেমন বাঁকের মুখে ঠেকে যায় সবার অলক্ষ্যে তখন তার গতি রুদ্ধ হয়, তেমনি কবির ঐ দিনটা যুগের ভাসান-খেলায় ঠেকে গিয়েছিল, কেউ তা জানতে পারে নি। দিন মাস বর্ষ গেল, গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের ঋতুচক্রও ঘুবলো। কিন্তু দিনটির গায়ে কোনো ধাক্কা লাগে নি, কোনো ঋতুর কোনো তুলির চিহ্নও না।

সেদিন কবি ভালোবেসেছেন কাউকে, কিন্তু বুঝতেও পারেন নি কত গভীর সেই ভালবাসা। সেদিন প্রেমাস্পদের যে পরিচয় ছিল, আজ

দেখি তার অন্যরূপ, বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পটভূমিতে যেমন করে মানুষকে পাওয়া যায়—তেমন করে কি স্মৃতির মাধ্যমে তাকে পাওয়া সম্ভব? স্বপ্নে, কল্পনায় অনুমানের হাওয়ায় বাস্তবের অনেক ভাব যায় হারিয়ে : সেদিনের নববধূ তার রঙ রস মুছে ফেলে দিয়ে এসে দাঁড়ায়—স্তব্ধ হয়ে, মনে হচ্ছে কি একটা কথা বলবে, কিন্তু বলা হয় না; ইচ্ছে করে পাশে ফিরে যেতে, কিন্তু ফেরার পথ নেই। কবির বিরহী মনে বেদনাতুর একটি উপলব্ধি শুধু জেগে থাকে।

প্রেমের সার্থকতা সম্পর্কে কবির চিন্তা এই তিরিশ নম্বর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। বিরহভাবুকতার মধ্যে প্রেমের গাঢ়ত্ব, মিলন তার লক্ষ্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দস্যুতায় প্রেমের সর্বস্বকে কখনই লুণ্ঠিত হতে দেওয়া উচিত নয়। একথা ঠিক যে মিলনের এক কোটিতে আছে পুরুষ, আর অন্যদিকে নারী। ছড়া বা কাব্যের মিলের জন্যে একটি পদ খুঁজে বেড়াচ্ছে পুরুষ,—বলা বাহুল্য, সেই অনুসন্ধানযোগ্য পদ হচ্ছে তার মানসী—নারী। সৃষ্টিলোকে দুটিকে মেলানো নিয়েই স্রষ্টার খেলা। নারী যখন তার দয়িত-কবিকে জিজ্ঞাসা করে—কাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, তখন কবির উত্তর :

"বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে—
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে,··

উত্তর শুনে প্রেমিকা নীরব হলো। কবি জিজ্ঞাসা করলেন কি ভাবছো তুমি? সে বললে—

"কেমন করে জানবে তাকে পেলে কিনা

তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে ?”

কবি জানান যে যাকে খোঁজা যায়, সে যখন এই গোপন অনুসন্ধানের আর্তি উপলব্ধি করে—তখনই বোঝা যায় যে সেই হলো সন্ধানের প্রার্থিত পাত্র।

খোঁজাই হলো প্রেমের সাধনা, মিলন তার লক্ষ্য—কিন্তু মিলন যে ঘটবেই, এমন কথা নেই, বিরহ-ই প্রেমকে খাঁটি করে তোলে,—রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার এ এক অতি প্রিয় কথা। প্রেমের শেষ লক্ষ্য হিসেবে মিলন তাই কবির কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি সেকথা এই কবিতাটির উপসংহারে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

দেখা হল।

সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ঐটুকু নিয়ে।
তারপরে সে চলে গেছে।

বিরহভাবুকতার বেদনার রোমন্থনই এই কবিতাটিকে যা কিছু সজীব করেছে ; এটি এবং এর আগেরটি—কবিতা হিসেবে কেমন শিথিল গঠনের, বিরহ-বেদনার গাঢ়তাও তীব্র ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রকাশিত হয় নি।

৩১ নম্বরের কবিতায় মৃতপত্নীকের বিরহবেদনায় ভারাতুর হৃদয়ের স্মৃতিচারিতাব এক করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। এটি আখ্যানমূলক কবিতা, প্রেমের গাঢ়তা এবং গভীরতায় এটি অপূর্ব এবং অনবদ্যরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে বিরহবেদনার প্রকাশও সুন্দর। প্রিয়ার মৃত্যুর পর শোকাতুর কবির বৈঠকখানাটি পাড়ার ছেলেরা দখল করে ক্লাব বানিয়েছে, সেখানে তর্ক, তাসখেলা, তামাকসেবন—সবই চলে। এই ঘোলা আলাপের কলরবের মাধ্যমে কবি নিজের মনের শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে চান। একদিন বিদেশাগত কোনো ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে ক্লাবের সভ্যেরা হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল,

ক্লাব ঘরটি সে সন্ধ্যায় ছিল নির্জন। আট বছর আগে এই ঘরে প্রিয়ার চুলের গন্ধের আভ্বটুকু, বিস্মৃত সুবাস যেন আজো মনকে বিহ্বল করে। মৃত পত্নীর সহজ সান্নিধ্যের কত কথাই না আজ মনে পড়ছে কবির।

হঠাৎ এই নির্জনতার মধ্যে কবিব মৃত প্রিয়ার অশরীরী আত্মা এসে হাজির।

হঠাৎ ঝর্‌ঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে
জানলাটা উঠল শব্দ করে
দবজাব কাছেব পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থিব হয়ে।

কবি তাঁব আকুলতাব কথা জানালেন বিস্তু তিনি অশ্রুত বাণী শুনলেন যে কবিকে এই ঘবে পূর্বেকার আদর্শে আব পাওযা যায় না, এই ঘরের সেই চিবকিশোব বঁধু যে কোথাও গেছে হাবিয়ে।

সুধালেন, "সে কি নেই কোথাও ?"
মৃদু শান্তসুবে বললে,
"সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আব কোথাও না।"

আদর্শভ্রষ্ট প্রেমিক কবিব মনে এই বাণী কতকটা নীরব ভর্ৎসনার মতোই শোনালো কবির মন ম্লানিমা এবং বিষণ্ণতায ভবে উঠলো।

সমগ্র কবিতাটিতে একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাসেব আর্তি এবং কারুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাই এই কবিতাটিব স্নিগ্ধ মন্ময়তা পাঠককে নিবিড়ভাবে খুশী কবে।

এই কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ ক্ষুদিবাম দাস বলেছেন—"কবি যে-হারানো প্রণয়ের ছবি তুলে ধরেছেন তাব সঙ্গে কল্পনা বা আদর্শ যোগ না কবায় রমণীয় বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সহজ চারুতা ঘটেছে। লোকান্তরিত

প্রিয়তমা পরিচিত পরিবেশের মধ্যে অনুভূত হওয়ার ফলে যে একটা রহস্যময় নিবিড় মুগ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়, তার বর্ণন কবিতাটিকে অতি-প্রাকৃতেরও মূল্য দিয়েছে।"[৮]

বত্রিশ নম্বরেরর কবিতাটি কাহিনীমূলক, ছোট গল্পের আমেজ আছে। এখানে রঘুডাকাতের পরোপকার করার একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সন্ধ্যার প্রদীপজ্বালা মিটমিটে অন্ধকারে বসে কবির বাল্যকালে ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে বসে বুড়ো মোহন সর্দারের মুখ থেকে রঘু-ডাকাতের গল্প শুনতেন, সেই স্মৃতি-কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে খেদের সঙ্গে ; খেদ এই জন্যে যে একালে বৈদ্যুতিক আলোয় রূপকথা জমে না, প্রদীপের শিখা নেভার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথাও বুঝি বা উঠে গেল। সে কথা তিনি বর্ণনা করেছেন কবিতাটির উপসংহারে। রঘু-ডাকাতের গল্প শুধু ডাকাতি করার কথায় পূর্ণ নয়, পরোপকার করার জন্যেই তার ডাকাতি। তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে-র খরচ যোগাড় হচ্ছে, না, রঘুডাকাত মোড়লের কাছে পত্র দেয় পাঁচহাজার টাকা দাবি করে। খাজনা বাকির দায়ে কোন্ বিধবার বাড়ি বিকিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে রঘু দেনা শোধ করে দেয়, দেওয়ানজি অনেক গরীবকে ফাঁকি দিয়েছে, ওর বোঝা কিছু হাল্কা হোক্। বিয়ে না করে কনের বাড়িতে বচসা করে বর ফিরে চলেছে, বিয়েবাড়ির কান্না শুনে রঘুডাকাতের দল বরসুদ্ধ পাল্কি পাকড়াও করে নিয়ে যায় কনের বাড়িতে, পাল্কি থেকে বরকে টেনে বের করলো, বরকর্তার গালে মারলো এটা চড়। বিয়ের পর্ব চুকলো ; যাবার সময় রঘু কনেকে বলে গেল—

"তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ ক'রো রঘুকে।"

রূপকথার সন্ধ্যা এখন আর নেই, বিদ্যুতের প্রখর আলোয় ছেলেরা সংবাদপত্রে ডাকাতির খবর পড়ে।

রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

তেত্রিশ নম্বরের কবিতাটিও কাহিনীমূলক ; শিখ বালক নেহাল সিং-এর আত্মোৎসর্গ নিয়ে লেখা। মোগল সৈন্য শিখদের অবরুদ্ধ করে রাখে। শিখদলের আহার্য যায় ফুরিয়ে, গাছের ডাল গুঁড়ো করে রুটি বানিয়ে খায় কেউ, কেউবা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে। তারপর গড়ের পতন হলো, বন্দী শিখদের নিয়ে হত্যা করা হলো। নেহাল সিং আঠারো উনিশ বছরের তরুণ যুবক, সৌম্যদর্শন, শালের চারার মতো উন্নত ঋজু তার দেহ, প্রাণের অজস্রতায় ভরা। তাকেও বেঁধে আনা হলো, ওর মুখের দিকে তাকালে বিস্ময়ে কারুণ্যে মন ভরে যায়। ঘাতকের খড়্গ যখন তার জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় রাজধানী থেকে দূত তার মুক্তিপত্র নিয়ে এল, সে জিজ্ঞাসা করলে—তার প্রতি কেন এই বিচার। তাকে বলা হলো যে তার বিধবা মা জানিয়েছে যে তার শিখধর্ম নয়, শিখেরা তাকে জোর করে আটকে রেখেছিল।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল
বালকের মুখ।
বলে উঠল, "চাইনে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি
আমি শিখ।"

আত্মোৎসর্গের মহিমা এখানে উন্নত হয়েই ধরা পড়েছে, কিন্তু গদ্যচ্ছন্দের জন্যে এই মহিমা মাঝে মাঝে অসংহত রূপ গ্রহণ করতে পারে নি ; রঘুডাকাতের গল্পে তবু ভাষাশৈথিল্যের ত্রুটি ধরা পড়ে না, কিন্তু নেহাল সিং-এর আত্মদানের মধ্যে সত্যরক্ষার একটা সুমহান ভাব ব্যক্ত হয়েছে। একে ছন্দলালিত্যে এবং অভাবিতপূর্ব মিলের বিন্যাসে

উপস্থাপিত করলে এই আত্মোৎসর্গের মহিমান্বিত রূপ আরও মহত্তর হয়ে বাজতো বলে মনে হয়। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি এ প্রসঙ্গে মনে করতে পারি।

চৌত্রিশ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন যে চিরচলিষ্ণু জীবনের স্রোতে অনিত্যবস্তু ভেসে চলে যায়; মানুষের কীর্তি, অহংকার, প্রতাপ—তাৎক্ষণিক মূল্যেই এদের বিচার শেষ হয়। কবির ভাষায় এরা হল—সদ্য মুহূর্তের দান। প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে রাখলে আমরা আমাদের ভেতরকার সত্তাকে অনুভব করতে পারি না।

এই অনিত্যেব মধ্যেই কবি নতুন করে আবার অসীমকে উপলব্ধি করতে পারেন। প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতার মধ্যে আমরা যখন নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখি, তখন আমরা আমাদের ভেতরকার সত্তাকে অনুভব করতে পারি না।

কবি জীবনের পথপরিক্রমায় দেখেছেন ইতিহাস—পুরাণের কীর্তিত কত দেশ আজ নিঃস্ব, বিস্মৃত, ক্ষমতার প্রতাপ স্তব্ধ হয়েছে, বিজয়-নিশান ভেঙে চুরমার হয়েছে, অহংকারীব গর্ববস্তু চূর্ণ হয়ে ধূলিলুণ্ঠিত,—সেই ধুলায় ভিক্ষুক ছেঁড়া কাঁথা মেলে বসে, পথিক শ্রান্তপদপাতে সেই ধুলা মাড়িয়ে যায়। কালের স্রোতে অনিত্য সব বস্তুই ভেসে যায়—

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।

তবু এই অনিত্যের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতেই কবি অসীমের স্তব্ধতাকে উপলব্ধি করতে পারেন।

পঁয়ত্রিশ নম্বরের কবিতাটি কবির দার্শনিক মননের ফসল বহন করছে।

তাঁর জীবনদর্শনের এক নতুন রহস্য এখানে দেখা গেল। তিনি জানালেন যে বাইরের প্রকাশই মানুষের অন্তরতমের পরিচয় নয়। দেহের বাঁধনে বাঁধাপড়া যে প্রাণ তার পূর্ণ পরিচয় কি আমরা পাই? মাঝে মাঝে দেহাতীত প্রাণ ইঙ্গিতে আভাসে অভিব্যক্ত হবার জন্য আকুলতা বোধ করে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির কণ্ঠোচ্চারিত বাণীতে শুধু খাঁচার কথা ধ্বনিত হয় না, তার মধ্যে দূর অরণ্যের গোপন মর্মরধ্বনির বেদনাভাসও জাগে! প্রকৃতির দিকে তাকালেও দেখা যায়—বসুন্ধরাও সীমাতীত কোন্ অজানা দেশকে না পাওয়ার জন্যে বেদনাহত, নিজের সেই বেদনাকে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করার চেষ্টা করে আসছে।

জীবনের পথ বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে গড়া,—রুটিনমাফিক সেই পথ ধরে চলাই কি জীবনের লক্ষ্য? তবু প্রাত্যহিকতার ওপার থেকে ভিড়ের কলরব পেরিয়ে গানের সুর ভেসে আসে।

এই অপরিস্ফুট প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্ব-শিল্পী কি কবির কাছে তাঁর চরম রূপটিকে আভাসিত করার চেষ্টা করছেন? অন্ধকারের মধ্যে থেকে কি আলোর স্বপ্নিল রশ্মিরেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে? মাটির তলার বীজ সব ঋতুর পুষ্টি ও লালন গ্রহণ করে এবং তারপরই উষার আলোয় নিজেকে প্রকাশের সাধনায় মাতে। তার অস্ফুট প্রকাশ ব্যাকুলতার স্থূলরূপ আমরা দেখতে পাই না—তাই বলে তা মিথ্যে নয়। মানুষের অন্তরতম সত্তা বাইরের কাজে-কর্মে অভিব্যক্ত নয়, লৌকিক রূপের মাধ্যমে সেই সত্তার পরিচয় লাভ ঘটে না, সে কতকটা অলৌকিক, কতকটা অনির্বচনীয়, তাই বলে তো শূন্য বা মিথ্যা নয়।

৩৬নং কবিতাটির সঙ্গে এর আগের কবিতার কিছু মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে। এখানেও কবি মানুষের অন্তর্নিহিত গূঢ় গোপন সত্তার অলৌকিকতার কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। আমাদের যে জীবনসত্তা আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, তা বাইরের কর্মময় জগতে বিচিত্র কলকোলাহলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে অসামান্যতার স্পর্শে আমাদের অন্তরতম সত্তা উপলব্ধ হয়।

প্রকৃতির রাজ্যেও এমনটি ঘটে ; রুটিন মতো কাজ চলেছে সে জগতে, তারই মধ্যে হঠাৎ যেন অনির্বচনীয় সুরধ্বনি বেজে ওঠে, ঘোষণা করে, জানায় তার অস্তিত্ব। কাজভোলা দিন নীলাকাশে উধাও বলাকার মতো লীন হয়ে থাকে, হঠাৎ ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে প্রকাশ করে দেয় তার অস্তিত্ব, বলে—"আমি আছি।" এই রকম কুয়োতলার আমগাছটিরও ঘোষণা ; সারাবছর সে থাকে আত্মবিস্মৃত, সেও হঠাৎ মাঘের শেষে শাখায় শাখায় মুকুলিত বাণীর মাধ্যমে ঘোষণা করে—"আমি আছি।"

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে অন্তর্যামী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে বিস্মৃত জীবনসত্তাকে সচকিত করে দেন, সে তখন বলে ওঠে—"আমি আছি।" প্রকৃতির জগতে যেমন অনির্বচনীয় স্পর্শের পুলকে বিশ্বপ্রাণ প্রকাশিত হয়, তেমনি আমাদের অন্তরতম সত্তা কাজে কর্মের আড়ালে কল-কোলাহলের শেষে কোন্ এক অলৌকিক মুহূর্তে প্রেমের মাধ্যমে সহসা অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। আমরা যদি মনোযোগী থাকি, তবে ক্ষণিকের জন্যেও সেই অন্তরতম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সৌন্দর্যের অধিলক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে এসেছেন। 'সোনার তরী' যুগে দেখি কবি সৌন্দর্যের দেবীর আলয়ের খোঁজে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছেন ; এখনো তাঁর বিশ্বাস অটুট আছে যে বিশ্বলক্ষ্মীই প্রকৃতির শক্তি, শ্যামলতা এবং সৌন্দর্যের জন্য দায়ী। বৈশাখের দারুণ তাপে প্রকৃতির রুক্ষ শুষ্ক রূপ জেগে ওঠে, মনে হয় বিশ্বলক্ষ্মী বুঝি রুদ্রের চরণতলে তপস্যায় বসেছে, তাই তার দেহ উপবাসে শীর্ণ, কেশপাশ পিঙ্গল। কিন্তু বিশ্বলক্ষ্মীই দুঃখকে দগ্ধ করলে দুঃখেরই দহনে, শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে পূজার পুণ্য ধূপে, কালোকে করলে আলো, নিস্তেজকে দিলে তেজ, ত্যাগের হোমাগ্নিতে ভোগ গেল পুড়ে, রুদ্রের প্রসন্নতা জাগলো মেঘগর্জনে, মরুবক্ষে তৃণের শ্যামাভ আস্তরণ দিলে পেতে—সুন্দরের আবির্ভাব ঘটলো। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ শ্যামল নয়নাভিরাম রূপ—বিশ্বলক্ষ্মীরই দাক্ষিণ্যে তা সম্ভব,

তারই সাধনার ফসলে তা ঘটেছে।

আটত্রিশ নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয়তম ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। মেঘদূতের বিষয় নিয়ে গদ্যে বা কবিতায় তিনি ষোলো সতেরোটি রচনা লিখেছেন। আমাদের আলোচ্য কবিতাটি তারই একটি। এটি 'যক্ষ' নামে লিখিত কবিতার গদ্যকবিতার রূপ বলেও অভিহিত করা চলে।[১]

রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমই মহত্তর বলে গণ্য; তিনি মিলন অপেক্ষা বিরহের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন। দেহগত প্রেম আসক্তির কালিমায় কুৎসিত রূপ ধারণ করে, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পূজারী, তিনি বিশ্বাস করেন যে দেহগত সান্নিধ্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দাবি প্রাধান্য লাভ করে, ফলে সুন্দর প্রেম ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তাঁর কাছে মিলনের চেয়ে বিরহই বেশী প্রিয়।

যক্ষ একদিন তার প্রিয়ার সান্নিধ্যে নিজের প্রেমের সার্থকতা খুঁজেছিল, পদ্মকুঁড়ির মধ্যে যেমন পুষ্পিত সৌন্দর্য সংগুপ্ত থাকে, তেমনি ছিল যক্ষের প্রেম, সে তার প্রেয়সীকে নিয়ে সংকীর্ণ সংসারে যুগল-মিলনের আয়োজনে ছিল ব্যস্ত। শ্রাবণ আকাশে মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো যক্ষপ্রিয়াও যক্ষের আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে মগ্ন। এমন সময় প্রভুর শাপ এল, কাছে থাকার বেড়াজাল হলো ছিন্ন,

> খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
> পাঁপড়িগুলি,
> সে-প্রেম নিজের পূর্ণরূপের দেখা পেল
> বিশ্বের মাঝখানে।

ইন্দ্রিয়ের দস্যুতা থেকে যথার্থ প্রেমের ঘটলো মুক্তি। বিরহবেদনার অমল স্রোতে পবিত্র হলো তার মন, ভোগাসক্তির পাপবাসনা ধুয়ে গেল

> সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
> দীক্ষা পেলে তুমি;

নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরে সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

যে প্রিয়া ছিল একা যক্ষের মনের অলিন্দে, আজ সেই নির্জন আসন থেকে উন্নীত হলো বিশ্বলোকের ধ্যানের আসনে, ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের স্বর্গমন্দিরে।

গোড়াতেই আমরা বলেছি যে পরিণত বয়স্ক কবির মৃত্যুভাবনা ও 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট সুর। উনচল্লিশ নম্বরের কবিতাতে তাঁর মৃত্যুচিন্তার পরিচয় আমরা পাবো। মৃত্যুকে আপাতদৃষ্টিতে জীবনের শেষ বলেই মনে হয়, কিন্তু কবির মতে মৃত্যুই জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি নয়, জীবন থেকে জীবনান্তরে যাবার মাঝে মৃত্যু ক্ষণিক বিরতিমাত্র। মৃত্যুর ভেতর দিয়েই জীবন নবীনতা লাভ করে, জগতের মধ্যে প্রাণের অবিচ্ছিন্নতা কিন্তু মৃত্যুর জন্যেই সম্ভব হয়, যা জীর্ণ এবং পুরাতন, তাকে কেড়ে নেয় মৃত্যু, জীর্ণদেহের বদলে প্রাণ আবার নবীন আশ্রয় লাভ করে।

কবি নিজের অন্তরে মৃত্যুর এই বাণী শুনতে পেয়েছেন, জীর্ণ পুরাতন বোঝা ফেলে দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে চলতে হবে, চুপ করে যদি বসে থাকা যায় মৃত্যুকে এড়িয়ে—দেখা যাবে জগতে ফুল বাসি হয়ে যাবে, নদী শুকিয়ে গিয়ে তাতে পাঁক দেখা যাবে, নিভে যাবে তারার আলো। মৃত্যু বলছে—

'থেমো না, থেমো না;
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না;
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে, ক্লান্তকে, অচলকে।

জীর্ণকে ধ্বংস করে মৃত্যু রাখালের মতোই সৃষ্টিকে জীবনের নব নব চারণক্ষেত্রে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, নতুন ক্ষেত্রে সৃষ্টি যাতে আপন পথ পায়—মৃত্যু তাই চায়।

নতুন জীবনস্রোতে মানবপ্রাণের নব জন্ম, মৃত্যুর মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে সে প্রাণ নতুন হয়ে উঠেছে, বর্তমান তাকে গ্রাস করে লুকিয়ে রাখতে চায়, হারাতে চায় না, গিলে ফেলতে চায় আপন জঠরে। দানবের মতো এই যে গ্রাস করার চেষ্টা—এরই আর এক নাম প্রলয়, অন্তত: নতুন সৃষ্টির দিক থেকে, বর্তমানের এই গ্রাসের মধ্যে সৃষ্টিসম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়। মৃত্যু তাই এই বর্তমানের হাত থেকে অন্তহীন নব নব অনাগতের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঘটিয়ে সৃষ্টিকে বাঁচাতে চায়।

চল্লিশ নম্বর কবিতাতেও কবির মৃত্যুচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবসত্তার চিরনবীনতা এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবন থেকে জীবনান্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা এখানে থাকলেও মানবসত্তা যে প্রথমজাত অমৃত, সে যে নবীন এবং নিত্যকালের—কবির ধ্যানদৃষ্টিতে সে সত্য উপলব্ধ হয়েছে।

কবিতাটি শুরু হয়েছে অথর্ববেদের একটি মন্ত্রের উল্লেখে—'পরিদ্যাবা পৃথিবী সত্ত আয়ম্ উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য'। ঋষি কবি ঘোষণা করলেন—

এই প্রথমজাত অমৃত কে? কবির মনে ধরা পড়লো যে সে আর কেউ নয়, মানবসত্তা, যে চিরকালের, চিরনবীন, কত মৃত্যু কত অনিত্যতার মধ্যে দিয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

> প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
> ধ্বনিত হল তার বাণী
> "এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।"

সংসারের ধূলিমলিনতার মধ্যে থেকেও মানবসত্তা নিজের আনন্দলোক থেকে বিচ্যুত হয় না; কবির আনন্দময় সত্তা ও রূঢ় কর্কশ মালিন্যময় পার্থিবলোক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যা শান্ত, যা আনন্দের পরিচয় বহন

করে—তাকেই গ্রহণ করে। পার্থিব ধূলি আত্মা থেকে ঝরে যাবে, কিন্তু রসঘন আনন্দস্বরূপ সত্তা চিরকালের, চিরনবীন। সে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের তপস্যায় নিজেকে ঘোষণা করে। মানুষের এই তপস্যার পার্থিব দিকটি বিনষ্ট হবে, জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন যুগকে ঢেকে ফেলতে পাবে—কিন্তু মানবাত্মার ক্ষয় নেই, সে যে চিরকালের, নিত্যনবীন।

রবীন্দ্রনাথ আজ নিজেব কবিসত্তাকে সেরকম নিত্যনবীন এবং আনন্দময় বলেই উপলব্ধি করতে পেবেছেন। যখন তিনি বালক ছিলেন, তিনি আকাশের নীলে গাছপালাব সবুজে আনন্দকে দেখেছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রাব বথ নানাপথ ঘুরে চললো, নানা দুর্যোগ নানা বিপর্যয়ে সে আনন্দের পরিচয় হাবিয়ে গেল,

ক্ষুব্ধ অন্তবেব তাপতপ্ত নিঃশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়াল দিগন্তে।
চাকাব বেগে
বাতাস ধূলায় হল নিবিড়।
আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুব কামনা
মধ্যাহ্নেব বৌদ্রে
ঘুবে বেড়ালো ধবাতলে
ফলেব বাগানে, ফসলের খেতে
আহূত অনাহূত।

আজ জীবনের পথপরিক্রমার শেষে কবি আবার তাঁর নিত্যস্বরূপ আনন্দময় কবিসত্তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে উপলব্ধি করতে পারছেন। ৪১নং কবিতায় দেখি কবির মনে তারুণ্যের ছোপ লেগেছে, মনে হাল্কাভাব জাগছে; চাপল্যের একটি হিল্লোল জীবনের প্রৌঢ় মুহূর্তগুলিকে চঞ্চল করে অনুভব করতে তাঁর মনে বাধলো না। মৃত্যুকে

সামনে রেখে বার্ধক্যে পৌঁছে তিনি অনায়াসেই বলতে পারলেন—

হাল্কা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হক
গিরিনদীর মতো।

তিনি কবি। কিন্তু নাচের গান বাঁধতেও কুণ্ঠিত হন না, নবীনের মতো শিল্পসাধনায় তাঁর লজ্জা নেই, এইখানে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তিনি রহস্য-সখা। প্রজাপতি পিতামহ যেমন নবীনদেব কাছে প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে ভুলে গেছেন, নিত্যনতুন তারুণ্যের উচ্ছলতা সৃষ্টি করেই তিনি মত্ত থাকেন, তেমনি তিনি এই বয়সেব ভাবে প্রবীণ কবিকেও টেনে রাখতে চান তাঁব বযস্যদের দলে কবিব মাথা থেকে বার্ধক্যের শিরোপা ফেলে দিয়ে। কবির তাতে লজ্জা হবে না। তাঁব মনে তারুণ্যেব উচ্ছ্বাস যদি জাগে—তাতে দ্বিধা নেই। তিনি বলেন—

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজেব অবাবিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি, যাবাব বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে
কৌতুকে বসোল্লাসে।

৪২ সংখ্যক কবিতাটি পত্রাকাবে শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত মশাইকে লেখা।

জীবনের সহজ সাদামাটা রূপেব অভিব্যক্তিও প্রশংসার যোগ্য; শুধু জ্ঞানের গণ্ডীতে যাঁর মন বাঁধা পড়ে নেই, তিনি সহজভাবে মানুষকে ভালবাসতে পাবেন; তাঁর প্রতি কবিব প্রশংসা অকুণ্ঠিত হয়ে বেজে ওঠে। সহজভাবে মানুষকে দেখতে সকলে পারে না, পণ্ডিতেরা জ্ঞানের গজকাঠি দিয়ে মানুষকে মাপেন, কিন্তু মানুষেব যথার্থ বন্ধু হবেন যিনি, তিনি সহজেই মানুষকে ভালবাসতে পাবেন, জটিল বিশ্লেষণে, কূটবুদ্ধির কৃত্রিম বিচারে মানুষকে দেখবেন না, কবি তাই সহজ মানুষের বন্ধুকে খুঁজতে বেরিয়েছেন—যিনি মানুষেব গল্প জমিয়ে বলতে পারেন—তাতে

থাকবে না কূট তর্ক আর জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার ছোঁয়া।

শ্রীযুক্ত দত্ত এমন একজন মানুষ—যাঁর বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান, যিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন প্রচুর, মানুষ সম্পর্কে যাঁর অভিজ্ঞতা অসীম, তিনি মানুষকে জেনেছেন সহজ করে, জানাতেও পারেন আরো সহজ করে। আজ মানুষকে নিয়ে গল্প করা কমে আসছে, তাকে নিয়ে জ্ঞানের চর্চার আড়ম্বর, পণ্ডিতেরা গর্ব করে বক্তৃতার ঝাঁপি খুলছে। তবু আজ গল্প কালের প্লাবনে ডুবলেও তা আবার ভেসে উঠবে।

কবির ৭৪তম জন্মদিনে এই ৪৩ সংখ্যক কবিতাটি রচিত। কবি পরিণত বয়সে নিজের জীবনকে শান্ত, স্বচ্ছ এবং সমাহিত দৃষ্টিতে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন—ফলে এই কবিতাটির গুরুত্ব কিছুটা ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরে বছরে পঁচিশে বৈশাখ কবির জীবনে হাজির হয়, কবির আয়ু বাড়ে—কবি নিজেকে বিচার করেন, বিশ্লেষণ করেন।

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের ও বার্ধক্যের যে রবীন্দ্রনাথ—সেই বিবিধ কালের রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিমা নির্মাণ করেছেন কবি এই কবিতায়। ধীরে ধীরে শিশু রবীন্দ্রনাথ কেমন করে বালক হলেন, বালকের প্রকৃতিপ্রীতি, এক বোধ থেকে অন্য বোধ, এক জীবন থেকে জীবনান্তরে উত্তরণ, পরে সে-ও আবার যায় বদলে।

বালক রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা জানতেন—আজ তাঁদের কেউ আর বেঁচে নেই। সেই বালক রবীন্দ্রনাথও আজ আর আপন স্বরূপে নেই, এমন কি কারো স্মৃতিতেও নেই।

সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্নাহাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের ফাঁক দিয়েই বাইরের বিশ্ব ধরা পড়েছিল, প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনের সুধা পান করতে শিখেছিলেন তিনি। তারপর পঁচিশে বৈশাখ আর এক কালান্তর নিয়ে এল।

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

প্রকৃতিলোকে কবির অধিবাস ঘটলো, বিশ্বমানব সংসারের সংবেদনে তিনি অংশ নিলেন ; একে একে মানসীর যুগ, সোনার তরীর যুগ, কল্পনার যুগ, বলাকার যুগের উপলব্ধি এল। কবির জীবনে কখনো এসেছে হতাশা, কখনো গ্লানি, নৈরাশ্য ; আবার তখনই প্রেম এসে তাঁকে পুনরায় উৎসাহে, আনন্দে উজ্জীবিত করেছে।

জীবনের পথে চলতে চলতে কখনো সুখদুঃখের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে, কখনো মিলেছে নিন্দা বা প্রশংসা, ঈর্ষা বা মৈত্রী।

পায়ে বিঁধছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।

কবি তাঁর অগণিত ভক্তের কাছে তাঁর মানস-মূর্তির একটি ছবিও তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রকাশে অনেক অসমাপ্ত, অনেক উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে

যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় বলে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।

আর, এর পরই কবি এই পৃথিবী থেকে ছুটি চেয়েছেন, বিশ্ব প্রাণচেতনায় তাঁর প্রাণকে মিশিয়ে দিতে চান!

চুয়াল্লিশ নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এক প্রিয় ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে কবির নিবিড় আত্মীয়তাবোধ কবির একটি প্রিয় উপলব্ধি, এই বোধ তাঁর স্বাভাবিক; এই কবিতায় কবির সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি। শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে কবি মাটির এক-খানি ঘর তৈরি করার বাসনা প্রকাশ করেন এবং শিল্পী নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনায় তা রচিতও হয়—এবং কবি সেই গৃহের নাম রাখেন—'শ্যামলী'। 'শ্যামলী' গ্রন্থের আলোচনায় এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'শেষসপ্তকে'র এই কবিতাটি সেই 'শ্যামলী' নামের মাটির ঘরকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। বাংলাদেশের মাটির রঙ শ্যামল, মাটির ঘর শ্যামলী যখন ভেঙে পড়বে—তখন মাটির সঙ্গেই সে যাবে মিশে। সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, মাটির কোলে মিশবে মাটি।

মাটির প্রতি কবির মমতা আশৈশব কালের। শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে মাটির স্বর্গেই তাঁর চলাফেরা, তাই মাটিতেই তিনি তাঁর শেষ বাড়ির ভিত গাঁথবেন। মাটির মতো স্নিগ্ধতায় শ্যামল বলেই তিনি বাংলা-

দেশের মেয়েকে ভালবেসেছেন, আজ জীবনের শেষ পর্বেও মাটি সমান-ভাবে তাঁকে আকর্ষণ করছে। মাটি তাঁকে ডাক পাঠিয়েছে শীতের ঘুঘু-ডাকা দুপুরবেলায় রাঙা পথের ধারে। 'পূরবী'র যুগেও কবি মাটির ডাক শুনেছেন এমনই তীব্রভাবে—

আজকে খবর পেলাম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নেভরা শোভার নিকেতন;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।[১০]

জীবনের শেষ পর্বেও কবি-মায়ের ডাক উপেক্ষা করতে পারেন নি।

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে।

বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির প্রতি নিগূঢ় ভালবাসার এমন স্পষ্ট স্বাক্ষর বড় একটা দেখা যায় না। এই কবিতাটিতে কবির পরিণত মনের দুঃসাহসিকতা লক্ষ্য করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বলেছেন—"বার্ধক্যের শেষ সীমায় কবি তাঁহার কল্পনার দুঃসাহসিক অভিমান সংযত করিয়া তাঁহার এই মৃত্তিকা প্রীতিকে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন; মাটির ঘরের মধ্যে, এক স্নেহ-শীতল, সনাতন বিশ্ববিধানের সহিত সামঞ্জস্যশীল, ক্ষমা ও বিস্মৃতির ব্যঞ্জনায় স্নিগ্ধ বাংলাদেশের প্রকৃত ও নারী-জাতির শ্যামল মাধুর্যের প্রতীক আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছেন।"[১১]

পঁয়তাল্লিশ নম্বরের কবিতাটি পত্রাকারে রচিত, এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর কাছে এটি লিখিত। কবি তাঁর জীবনের হিসাব-নিকাশ করতে বসেছেন, একদিকে ফেলে আসা অতীতের ধূসর স্মৃতি, অন্যদিকে অজানা ভবিষ্যৎ—দ্বিধাবিভক্ত এই জীবনের খতিয়ান নিয়ে তিনি আজ ব্যস্ত।

প্রথম চৌধুরী মশাই যখন 'সবুজ পত্র' কাগজ বের করেন, (বলা বাহুল্য, 'সবুজ পত্র' নামটি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া) তখন কবিকে ঐ পত্রিকায় নিয়মিত লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল; কবিতা গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি প্রচুর রচনায় তিনি কাগজটির সেবা করেন। পঞ্চাশোত্তীর্ণ প্রৌঢ় কবি আবার তারুণ্য ও যৌবনের শক্তিতে হয়েছিলেন, আজ এই কবিতায় তিনি সেই স্মৃতির উল্লেখ করতে চান। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে—

ভরা যৌবনের দিনেও

যৌবনের সংবাদ

এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগে নি আমার লেখনীতে।

কবির দেহগত যে যৌবন—তার অবসান ঘটেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই, সেতো মৃত্যুর অধীন, কিন্তু দেহাতীত যৌবনের ক্ষয় নেই, সে যে মানুষের শাশ্বত কালের মহাশক্তি। তাই পঞ্চাশোর্ধেও 'পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি' তাঁর চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল। আজ পিছনের ডাক এসেছে, যাকে ছেড়ে এলেন কবি—তাকে চেনার চেষ্টা করছেন, আবার সামনে যে জীবন—সেদিকেও মন দিচ্ছেন। একদিকে অতীত, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ—'দুইদিকে প্রসারিত দুই বিপুল নিঃশব্দ'। কবি এই দুই বিরাট আধখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে শেষ কথা বলে যাবেন—

"দুঃখ পেয়েছি অনেক,

কিন্তু ভালো লেগেছে,

ভালোবেসেছি।"

জীবনের বিস্ময়, প্রীতি এবং মমতা প্রকাশ করায় কবি মুক্ত কণ্ঠ, পৃথিবীকে তাঁর যেমন ভাল লেগেছে, তেমনি তিনি ভালবাসাও পেয়েছেন।

৪৬নং কবিতায় পাই কবির ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়। নিজের গোটা জীবনের মর্মবাণীই আজ তাঁর আত্মোপলব্ধির সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ অনায়াসলব্ধ, স্বভাবসিদ্ধ। শৈশবকাল থেকেই তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রীতিবোধ করতেন। ভোরবেলায়

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতেন, অন্ধকারের ওপরকার ঢাকা খুলে নতুন-ফোটা কাঁঠালি চাঁপার মতো কোমল আলো বেরিয়ে আসছে। বিছানা ছেড়ে বাগানে যেতেন শিশুকবি। তখন প্রতি দিনটি ছিল নতুন। তারপর কর্মের জগতে ন্যস্ত হলেন, প্রকৃতিলোক থেকে গেলেন হারিয়ে। এতদিন পবে আবার প্রকৃতির কোলে কবি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে খোঁজ করতে চান। এই কবিতাটির প্রথমাংশের সঙ্গে ভানুসিংহের পত্রাবলীর একটি চিঠির কিয়দংশের মিল লক্ষ্যণীয়। "একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবনপাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্প লোকের অমরাবতীতে আমি দেব-শিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম।

সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে,...আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশে তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়।"[১২]

কবির ব্যাকুল বাসনা—জীবনের শেষ মুহূর্তে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের দুয়ার আরবার খুলে যাক। কিন্তু প্রয়োজনের দাসখৎ লিখে দেওয়ার জন্যে বুঝি তা আর সম্ভব নয়। তবু কবি চান প্রকৃতি-লোকের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য যেন হারিয়ে না যায়, তাঁর চোখে প্রতিদিন নতুন করে ধরা পড়ুক, প্রতিটি দৃশ্য নবীন রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠুক।

কবি আজ প্রয়োজনের শিকল থেকে বন্ধনমুক্তি চান। এ পারের বোঝার সঙ্গে আব পারের কোনো কিছু জড়াতে চান না; অসীম সমুদ্রের এই তীর-প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন; নতুন পারও দেখা যাচ্ছে। তাকে জড়াবেন না এপারের বোঝার সঙ্গে। তাই ঘোষণা করেন—

এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই,
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

দ্বিতীয় পর্ব

বীথিকা

ঠিক হয়েছিল 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। তাহলে 'বিচিত্রিতা' আকারে প্রকাণ্ড বড় হয়ে যাবে—এমন একটা আশঙ্কা ছিল। 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হলো—তখন দেখা গেল এই বইয়ের জন্যে বেশ মোটা রকমের খরচ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় খণ্ডেও যদি অত রঙ দিয়ে অমন সুন্দরভাবে ছাপা হয়—তবে প্রচুর খরচের ধাক্কা, ঠিক এই কারণে কিনা বলা যায় না, 'বিচিত্রিতা'র দ্বিতীয় খণ্ড আর বের হয়নি। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে যে সব কবিতা নির্দিষ্ট ছিল—তা দিয়ে তৈরি হলো 'বীথিকা'র [illegible], এর উপর কিছু নতুন কবিতাও রচিত হয়েছিল, সেগুলোও স্থান পেল এই গ্রন্থে।

'বীথিকা' কবির পরিণত জীবনের রচনা বলেই এখানেও তাঁর দার্শনিক মনন ও গভীর জীবনজিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে, মানব-জীবনের চরম সার্থকতা [illegible] বর্তমানের [illegible] মন নিয়ে কবির [illegible] সত্য [illegible] লাভ করেছেন, [illegible] উপলব্ধি করেছেন, সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ হলো 'বীথিকা'। জীবনের যে রূপ আমরা বাইরে থেকে দেখি, সেই সৌন্দর্য কবিও দেখেছেন এবং সেখান থেকে তিনি সৃষ্টি রহস্যের মূলবিন্দুতে [illegible] চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিন্তা এখানে স্থির সত্য হয়েই দেখা দিয়েছে। দার্শনিক ভাবনার বিষয় লিখতে গিয়েও তিনি, চির[illegible] ছন।

'বীথিকা' গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় কবির অন্তরসত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাইরের যেসব ঘটনা তাঁর

ব্যক্তিসত্তাকে অভিভূত বা বিচলিত করেছে—কবি এখানে সে সম্পর্কেও বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। 'বীথিকা'য় আর আছে প্রেমের কবিতা, পুরাতন প্রেমের ছবি কবির স্মৃতিধূসর মনে যে বিষণ্ণ অথচ রঙীন কুহক জাগিয়েছিল— তার কথাও আছে।

কবি এখানে রোমান্টিক রীতিকে আবার গ্রহণ করেছেন, সমিল ছন্দ ব্যবহার করেছেন। দার্শনিক মননের সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব মেল-বন্ধন ঘটেছে। তার মনের ছোট ছোট অনুভবগুলিকে তিনি এমন-ভাবে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন যে সেগুলি পাঠকের মনে এসে এক একটি ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। 'বীথিকা' গ্রন্থের আগে ও পরে গদ্য-ছন্দের লিখিত কবিতা রয়েছে, কিন্তু, 'বীথিকা'র কবিতাগুলি সমিল। আঙ্গিকের দিক থেকে 'বীথিকা'র কবিতাগুলিকে তাই সহসা পৌর্বাপর্যহীন বলে মনে হবে। কবির আকস্মিক আঙ্গিক বদল কেন—তার সার্থক কারণ নির্ণয় করা মুস্কিল, তবে আমরা এই গ্রন্থের মূলসুর নির্ণয়ের পর যখন এর প্রযুক্তি বা প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করবো—তখন আমরা একটা অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত করে এই প্রশ্নের সমাধানে প্রয়াসী হবো।

আলোচ্য 'বীথিকা'র কবিতাগুলিকে ভাগ করলে দেখা যাবে যে একদিকে তাঁর মন অতীতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে, কিন্তু তিনি বিস্মৃত হন নি যে জগৎ এগিয়ে চলেছে, আর সেই গতিশীলতার মধ্যে অতীত নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে মিশে যাচ্ছে। কবি আজ বর্তমান জীবনের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে অতীতের যথার্থ স্বরূপ কি—তা বুঝতে চেয়েছেন। 'অতীতের 'ছায়া', 'মাটি', 'দুজন', 'নব পরিচয়' 'পত্র'— কবিতাগুলি হলো এই ধারার।

মানব-জীবন নিয়েও কবির চিন্তার ফসল রয়েছে। শুধু নিজের স্বরূপ নয়, সাধারণভাবে মনুষ্যজীবন সম্পর্কেই কবি একটি সত্য আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন, মানবজীবনের যথার্থস্বরূপ কি—সে

উপলব্ধির প্রকাশ আছে যেমন, তেমনি জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কেও তাঁর চিন্তার পরিচয় রয়েছে। 'রাত্রিরূপিণী', 'নাট্যশেষ' 'আসন্নরাত্রি' 'প্রণতি' 'বিরোধ' 'রাতের দান' 'মরণমাতা' 'মাতা' 'মিলন যাত্রা' 'অভ্যাগত' 'ঋতু-অবসান' 'শেষ' এবং 'জাগরণ'—এই কবিতাগুলি হলো এই প্রসংগের।

'বীথিকা'-তে ঈশ্বরোপলব্ধির কথাও আছে। মানুষের বাস্তব জীবন খণ্ডিত এবং সীমাবদ্ধ—কবি এই খণ্ডিত জীবনের মধ্যেও ঈশ্বরের স্পর্শ উপলব্ধি করেছেন, কখনো লক্ষ্যভাবে, কখনো বা অলক্ষ্যভাবে কবি সীমিত জগতের মধ্যেই অসীমের পরম সুন্দর রূপখানি দেখতে পেয়েছেন। 'ধ্যান' 'সংযোগ' 'ছুটির লেখা' 'শ্যামলা' 'দেবদাস' 'ছন্দোমাধুরী' 'কাঠবিড়ালি' 'বনস্পতি' 'হরিণী' 'দুইসখী' 'মাটিতে আলোতে' 'আশ্বিনে' 'দেবতা'—কবিতাগুলি এই সুরের।

'বীথিকা'য় প্রেমের কবিতাও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বেও প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, প্রেম কখনো ব্যক্তিক, কখনো বা সামান্যভিত্তিক, অর্থাৎ সাধারণভাবে যা অবিশেষ। ব্যক্তিক প্রেম কখনো স্মৃতিমূলক কখনো বা জীবনের সীমানা-ছোঁয়া, কখনো আবার প্রেমের সত্য-নিরূপণের চেষ্টায় উজ্জ্বল। কবির অন্তর্লোকে প্রেমের স্বরূপসন্ধানের কাজ চলেছে। প্রেমের মাধ্যমে আমরা সত্যকে কেমন করে উপলব্ধি করি সে ইঙ্গিতও তাঁর প্রেম-কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য। 'মানসী-সোনার তরী'র যুগ থেকেই দেখা যাবে যে কবি নিরুপমা কোনো সৌন্দর্য-দেবীকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে এসেছেন। নিরুপাধিক সৌন্দর্যের সেই নৈর্ব্যক্তিক দেবীর বাস্তবরূপ কল্পনা ও অনুমান করেছেন কাছে-আসা কোনো ব্যক্তি-নারীর ওপর।

'পূরবী' পর্যায়ের কবিতায় এই রকম এক নারীর পরিচয় আমরা পেয়েছি আর্জেন্টিনার বিখ্যাত কবি ও লেখিকা Victor Ocampo-র মধ্যে। এই ভিক্টোরিয়ার মধ্যে কবি অসামান্য জন মহিমান্বিত এক জন

নারীর পরিচয় পেয়েছিলেন। ‘পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি’-তে এই ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে অনেক খবরই পাওয়া যাবে। ‘পূরবী’ গ্রন্থেও এঁকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা লেখেন—এবং এঁকে কবি বিজয়া বলে সম্বোধন করে ‘পূরবী’ গ্রন্থটি উপহার দেন। শেষ জীবনে কবি যে প্রেমের উদ্বোধনে আবার নতুন করে সেই ভুবনে অবতীর্ণ হয়েছেন—তার মূল নিহিত রয়েছে এখানে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্যমশাই কবি-জীবনের এই পর্বকে বলেছেন—তাঁর নব-কৈশোর। “পূরবীর যুগে কবিমানসে “কিশোর প্রেমে”র পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই কবি কিশোরের নবজন্ম হয়েছে। কৈশোরের অনবদ্য স্বপ্নের মতোই এই নবানুরাগ শুভ্র ও সুন্দর।”[১]

‘বীথিকা’য় প্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগও ধরা পড়েছে, তবে এই গ্রন্থভুক্ত প্রেমের কবিতার বেশীর ভাগই স্মৃতিরোমন্থনের আবেগে চঞ্চল, দু’একটি মাত্র বড় কবিতা আছে—সেখানে প্রেমানুভূতির সঙ্গে কাহিনীর রসও সঞ্চারিত হয়েছে। ‘কৈশোরিকা’, ‘প্রত্যর্পণ’, ‘ছায়াতান’, ‘নিমন্ত্রণ’, ‘পোড়োবাড়ি’, ‘ভুল’, ‘বাদলমিলন’, ‘অপরাধিনী’, ‘ছবি’, ‘ক্ষণিক’ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে।

এছাড়া বিবিধ রসের কিছু কবিতা আছে—সেগুলির মধ্যে কোথাও কবির মানসিক বিষণ্ণতার প্রকাশ কোথাও তার স্বভাবনম্র বিরহ, কোথাও অকারণ আতির ঘোর লেগেছে তার উপলব্ধিতে, প্রকৃতির বিচিত্ররূপ সম্পর্কে কবির আবার নবানুরাগ—সাময়িক ঘটনায় কবিমনের বিচিত্র উপলব্ধি—সব কিছুরই প্রকাশ দেখা যাবে—পাঠিকা, মৌন, বিচ্ছেদ, বিদ্রোহী, গীতচ্ছবি, উদাসীন, দানমহিমা, ঈষৎদয়া, রূপকার, মেঘমালা, কাব, সাঁওতাল মেয়ে, অন্তরতম, ভীষণ, সন্ন্যাসী, গোধূলি, পথিক, অপ্রকাশ, দুর্ভাগিনী, গরবিনী, প্রলয়,

অভ্যুদয়, মুটু, বাদল সন্ধ্যা ও রাত্রি, মুক্তি, দুঃখী, মূল্য, নমস্কার, নিঃস্ব প্রভৃতি কবিতায়।

এই মূল সুরের পরিপ্রেক্ষিতেই 'বীথিকা' গ্রন্থের নামকরণ বিচার্য। কবির দার্শনিকতা, গতিশীল জীবনে ও জগতে অতীতের অবলুপ্তি, বর্তমানের আশ্রয়ে থেকে অতীতের স্বরূপসন্ধান, বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কবির সত্যদৃষ্টির আবিষ্কার, আমাদের খণ্ডিত জীবনে অখণ্ড ও অনন্তরূপী ঈশ্বরের প্রকাশ—সব কিছু নিয়েই 'বীথিকা'। তবু 'বীথিকা' নামের একটা বাড়তি তাৎপর্য আছে। সে তাৎপর্য এই গ্রন্থে যে সব প্রেমের কবিতা স্থান পেয়েছে—তাদের আলোকেই আমরা বিবেচনা করে দেখবো।

'বীথিকা' শব্দের মানে সারি বা পঙ্ক্তি। শ্রেণীবদ্ধ গাছের মাঝখানের পথকেও বলে 'বীথিকা'। কবি এখানে স্মৃতি রোমন্থন করেছেন, পিছনের জীবনের দিনগুলির বিবিধ অনুভবগুলি আজ যেন তাঁর কাছে সারিবদ্ধ। তাদের মধ্যে দিয়েই দেখা দিয়েছে—সেই অর্থে কবি তাঁর ব্যক্তিক জীবনানুভূতির বিচিত্র প্রকাশগুলি একটি নিরন্তধারায় রূপায়িত করেছেন—তাই তিনি এর নামকরণ করেছেন—'বীথিকা'। সাধারণভাবে 'বীথিকা'র নামকরণ প্রসঙ্গে এই কথা বলা চলে। তবু এর পরেও একটা কিন্তু থেকে যায়।

'বীথিকা' স্মরণমূলক। কবির প্রথম যৌবনে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে যে উজ্জ্বল দিনগুলি কেটেছিল—তারই স্মৃতি তাঁর দীর্ঘ জীবনের পথ-পরিক্রমায় বিশেষ প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। 'বীথিকা' গ্রন্থপ্রকাশের আগেও কবি কিছুদিন চন্দননগরে সেই বাগান বাড়িতে কাটিয়ে এলেন, কিন্তু চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর আগেকার সেই উজ্জ্বল দিন আজ স্মৃতিধূসরতায় তার বর্ণাঢ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলিতে তিনি জ্যোতিদাদা এবং কাদম্বরী দেবীকে কাছে পেয়েছিলেন, কিন্তু আজ শুধু তাঁদের স্মৃতিই সম্বল,

বিশেষ করে কাদম্বরী দেবীর কথাই তাঁর মনে পড়ছে সব। 'জাগরণ' নামে এই গ্রন্থের শেষ কবিতায় চন্দননগরে থাকাকালীন কবিচিত্তের স্মৃতিসত্তায় যে সব স্বপ্ন সত্যের মতো জেগেছে—তার পরিচয় রয়েছে।

২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি'তে আছে—সেখানে তিনি প্রচ্ছন্ন বীথিকার ব্যাকুল অনুসন্ধানে রয়েছেন, যে বীথিকা সামনে পেলে তিনি বিশেষ কোনো একজনকে তাঁর মনের কথা পত্রাকারে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি লিখছেন—"বিশেষ কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃত ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম।"[২]

এই পত্রটিও স্মৃতিমূলক, এবং এখানকার "কোনো-একজন" যে তাঁর অতি প্রিয়জন—তা সহজেই অনুমেয়। শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য মশাই ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন যে এই "কোনো-একজন" আর কেউ নন, কবির বৌঠান। "গ্রীষ্মাবকাশের পর কবি নদীবাস থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন উনিশে আষাঢ়। কিন্তু চন্দননগরের সেই স্বপ্নাবেশ তাঁকে ঘিরে রইল আরো কিছুদিন। এই প্রেরণায় 'বীথিকা'র শেষ কবিতা 'জাগরণ' লিখিত হয় ২৯শে ভাদ্র। চন্দননগরে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে লেখা কবিতাগুলিই 'বীথিকা'র মূল কবিতা।"[৩]

কবি প্রেমের সেই স্মৃতি প্রকাশের এই বীথিকাই পেয়ে গেলেন, যে বীথিকার খোঁজ তাঁর মন করে আসছিল, যার কথা তিনি পত্রে বলেছেন—সেই প্রচ্ছন্ন বীথিকাই আজ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই বিশেষ আপন কোনো-একজনকে এই বীথিকার নিভৃত ছায়ার ভেতর দিয়ে কবি তাঁর নিরুদ্দেশ বাণীকে সঠিক লক্ষ্যের পথে

অভিসারে পাঠাচ্ছেন।

এদিক থেকেও 'বীথিকা' গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য ও সংগতি বিচার করে আমরা বলতে পারি গ্রন্থটির নামকরণে ইঙ্গিতময়তা থাকলেও এটি সত্যিই সার্থকনামা।

'বীথিকা'র প্রকরণ সম্পর্কে পাঠকের মন কৌতূহলী না হয়ে পারে না। 'পরিশেষে'র কয়েকটি কবিতা থেকেই কবি গদ্যচ্ছন্দের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। বীথিকার অব্যবহিত আগে তিনি 'পুনশ্চ' এবং 'শেষসপ্তক' গ্রন্থদ্বয় গদ্যচ্ছন্দে লিখেছেন এবং এটির পরের গ্রন্থ 'পত্রপুট' গদ্যচ্ছন্দে লেখা। মিলহীনতার এই দুই তীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি সমিল ও নৃত্যচঞ্চল ছন্দপ্রবাহে গা ভাসিয়েছেন। তাই, অন্ত্যানুপ্রাসের সৌকর্য ও চমৎকারিত্বে পাঠক যতটা মুগ্ধ হয়, ততটা আবার বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার কৌতূহল জাগে—'বীথিকা'য় কবি সহসা কেন অন্তঃমিলের এই কাব্যপ্রকরণ গ্রহণ করলেন? আমি আগেই বলেছি এর সঠিক কারণ নির্ণয় দুরূহ, এবং তা কতকটা অনুমাননির্ভরও বটে।

রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং তাঁর মনে যে সব ভাব রূপলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কবি তাদের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি দান না করে পারবেন না, গদ্য কবিতায় যতখানি যুক্তি এবং পরিমিতিবোধ, ততখানি উচ্ছ্বাস এবং আবেগপ্রবণতা থাকে না, তাই উচ্ছ্বসিত উল্লাসে কবির নিগূঢ়ভাবগুলি শব্দরূপের আধারে প্রকাশিত হতে চাইলে তাকে ছন্দপ্রবাহে না বাঁধলে চলে না, ধ্বনি-তরঙ্গের আঘাতে মনের আবেগ উদ্বেল হয়ে নৃত্য-মুখরতা লাভ করে—এই দুর্মদ বাসনা-গুলিকে তাই সাংগীতিক সুরমূর্ছনায় নৃত্যচটুল উন্মাদনায় ব্যক্ত করতে হয়, গদ্যচ্ছন্দের ঢিলে ভাবে, স্বল্পাভরণ অলস গতিমন্থরতায়—এই রকম আবেগমাখা ভাব প্রকাশের ক্ষতি হতে পারে মনে করেই

কবি আবার লীলাচটুল ছন্দোময়তাকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এও হতে পারে যে 'মহুয়া' এবং 'পরিশেষ' গ্রন্থের মনন-কল্পনার অনুধ্যান কবিকে ত্যাগ করে নি; বিশ্বজীবনের স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাপারে, মানবজীবনে প্রেমানুভূতির রহস্য উন্মোচনে, মৃত্যুর সামনে পৌঁছে নিজের জীবন এবং মানসিকতার বিচারে, জগৎ ও জীবনের দার্শনিকতা বিশ্লেষণে কবি 'মহুয়া-পরিশেষে'র ছন্দলীলা বিস্মৃত হন নি। 'বীথিকায়' যদিও তাঁর দার্শনিক মননের প্রকাশ, তবু 'পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুটে'র মতো কবির আবেগ এখানে নিরুচ্ছ্বাস নয়, এমন কি গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে কবি কখনো কখনো অলস, নির্লিপ্ত, আবেগহীন মনোভঙ্গীর পরিচয় পেয়েছেন—বিশেষ করে যখন তিনি জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু 'বীথিকা'য় জগৎ, জীবন, প্রকৃতি—সব কিছু সম্পর্কেই কবির চেতনা ধ্যানমৌন এবং আত্মসমাহিত, ফলে তাঁকে কল্পনার গতিলীলাকে উচ্ছল করতে হয়েছে, তাই সমিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োজন হয়েছে, ছন্দের চটুলতা এবং কল্পনার লীলাকে উজ্জ্বল করেছে।

'বীথিকা' গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করি। এর আগে কবিকে আমরা তাঁর যৌবনে দেখেছি বিষয়ানুসন্ধানে ব্রতী হয়ে বিবিধ ইতিহাস ও প্রাচীন কাহিনীর কাছে হাত পেতেছেন। তিনি 'বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থ, রাজস্থানের কাহিনী, মারাঠাগাথা, শিখ ইতিহাস প্রভৃতির সন্ধান' করেছেন, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বিষয়ের সন্ধান করেছেন শিল্পীদের এমন কি নিজের আঁকা ছবির মধ্যে। "মহুয়ার কয়েকটি, বিচিত্রিতার সকলগুলি এবং পরিশেষ বীথিকার গুটিকয়েক এই শ্রেণীর-চিত্রের প্রেরণায় রচিত।"[৪]

সব মিলিয়ে বলা যায় এই পর্বে 'বীথিকা' রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ, কিন্তু এই গ্রন্থখানির খ্যাতি ও প্রচার পাঠক সমাজে তত বেশী নয়। এ জন্যে সমালোচক মহলে যথেষ্ট ক্ষোভও

আছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"জীবনের শেষতম পর্বের অনেক কল্পভাবনার আভাস 'বীথিকা'র কবিতাগুলিতে সহজেই ধরা পড়ে। সপ্তবোত্তীর্ণ কবির 'বীথিকা' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ একথা বলিতে দ্বিধা হইবার কোনও কাবণ নাই। পাঠক সমাজে এই গ্রন্থটি কেন যে এখনও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই জানি না। 'বীথিকা'র কবিমানস অতি গভীবে প্রসারিত, গভীব গম্ভীব জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তবিত। কবিতার বিষযবস্তু যাহাই হউক, প্রায সর্বত্রই অতীত ও বর্তমান, নিসর্গ ও বিশ্বজীবন বা এক কথায বিশ্বসত্তা, প্রেম ও অনুবাগ, জীবন ও মৃত্যু ব্যক্তিগত জীবনেব ছাযা ও স্বপ্ন, মনন ও কল্পনা, সব কিছু জডাইযা সব কিছু বিদীর্ণ করিযা এই আত্মলীন জীবন-জিজ্ঞাসা একটি পবিব্যাপ্ত সুগভীব বিশ্বাস, একটি শান্ত নিস্তব্ধ অনুভব এবং জীবনের পুবাতন মূলগত দর্শন ও আদর্শগুলির নূতন মূল্য আবিষ্কাবকে প্রতিষ্ঠিত কবিযাছে বিচিত্র ছন্দে ও বর্ণে, বিচিত্রভাব ও বস্তু পবিবেশেব মধ্যে।"[৫]

'বীথিকা'ব প্রথম কবিতা হলো 'অতীতেব ছাযা'। বর্তমানের আশ্রযে দাঁড়িযে কবি অতীতেব যথার্থ স্বরূপ বিচার কবতে চাইছেন। মহাঅতীতেব সঙ্গে আজ কবিব বন্ধুত্ব। অতীতেব স্বরূপকে কবি এখানে মূর্ত কবে উপলব্ধি কবছেন, ভাবকে তিনি রূপমূর্তি দান করেছেন। অতীত ধ্যান-মৌন সাধক বিশেষ। দিনেব শেষে নিস্তব্ধ আকাশের তলায তাবার ধুনী জ্বেলে সে যেন বসেছে। কিংবা অতীত একজন শিল্পী, আসক্তিহীন তাব দৃষ্টি—বর্তমানের জীবন শেষ হলে —দিনাবসানেব সূর্যাস্ত ঘটলে মেঘলোক থেকে রক্তরাগ নিযে শিল্পী অতীত জীবনের হাবিযে যাওযা মুহূর্তগুলিকে চিত্রিত কবে বেখেছে। জীবনের যে পরিচয় বিস্মৃতির ধূসরতায় হাবিযে যাচ্ছে, অতীত তাকে

হারিয়ে যেতে দিচ্ছে না, বর্তমানের উপকরণকে সঞ্চয় করে রাখছে, এই মালমশলা নিয়েই ইতিহাস রচিত হয়, অতীত সেই ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসেবে হারানো ক্ষণটিকে তুলে ধরছে।
কবি দার্শনিকের দৃষ্টিতে অতীতকে দেখেছেন, কিন্তু কাব্যে রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ। অতীত তাই কবির চোখে আবার নারীর মূর্তিতে ধরা পড়েছে। অতীতের মূর্তিময়ী চেতনা হারিয়ে যাওয়া বহু বসন্তের ক্লান্ত-গন্ধে তার কালো কেশের সৌরভ বাড়িয়েছে, তার কণ্ঠহার প্রাচীন শতাব্দীর মাণিক্য-কণা দিয়ে গড়া। বর্তমান চলে যায় বটে, কিন্তু নিঃশেষ হয় না। বর্তমানের বহু স্বপ্ন, বহু চিন্তা অতীতকে দিয়ে যায়--যা দিয়ে অতীত নিত্যকালের ফসল গড়ে তোলে। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যেই অতীতের কারবার; কিছু হারিয়ে যায়, কিছু থাকে বেঁচে। আমাদের কবি আজ মৃত্যুর দ্বারে উপনীত, তিনি আজ অতীতরূপী শিল্পীর কাছে এসেছেন—নিজেকে ঠিক ভাবে জানতে; কবির যথার্থ স্বরূপ বিচার করে নেবার পর তাঁর কাব্য-সম্পদকে হয়তো শিল্পী অতীত ইতিহাসের পাতায় চিত্রিত করে রাখবেন—এই জন্যে মহাঅতীতের সঙ্গে তিনি সখ্য করছেন। বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন—বিবিধ বেদনা সহ্য করেছেন, কবি সে সব ঘটনার সত্য রূপকেই মূর্তি দিতে চেয়েছেন—

দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে।

মাটি আর মানুষের মধ্যে যে নিবিড় নৈকট্য—কবি 'মাটি' কবিতায় তারই স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। চিরদিন মানুষ মাটিতে আশ্রয় বেঁধে এসেছে, নিজের জন্যে ভূখণ্ডের ছোট্ট একটা সীমানাকে চিহ্নিত করে নিজের জীবনকে সেখানে বেঁধেছে, আমিত্বের অহংকারে

মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই গতিমান ধ্বংসশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই মাটিতেই তো কত যাত্রী আর্য-অনার্য, কত নাম-হীন ইতিহাসহারা জাতি এসেছে, ডেরা বেঁধেছে, সুখে দুঃখে জীবনের স্নেহ-মমতাঘেরা ঔজ্জ্বল্যকে মুছে ফেলে কোথায় তারা আবার হারিয়ে গেছে, মাটিতে তাদের কোনো চিহ্নই নেই। মূঢ় মানুষ তবু আমিত্বের অহংকারে মাটির অংশকে নিজের বলে দাবি করতে ভোলে না, কিন্তু একদিন এই আমিত্বের বেড়া ভেঙে যায়—মানুষ চলে যায়, মাটি আমি-শূন্য হয়ে চিরকাল ধরে টিঁকে থাকে।

প্রেমের অনির্বচনীয় উপলব্ধিতেও একটি বেদনার সুর থাকে—'দুজন' কবিতাটিতে এইরকম একটা ইঙ্গিত আছে। তবে বিশ্বজগতের অনাহত অগ্রসরতায় নারীপুরুষের মিলনকে কতদূর স্থায়ী ও চিরমিলন বলা যাবে—কবির ভাবনায় সে সংশয়ও জেগেছে। ক্ষণিক জীবনের যে আরাম—তা কিন্তু বিশ্বজীবনের চিরন্তন প্রবাহে কি স্থায়ী স্বাক্ষর রাখে? যে দুজন প্রেমিক অতীতকালে নিজেদের খণ্ড ও সামান্য জীবনে প্রেমের অভিসারে মত্ত ছিল, অনির্বচনীয় সুখে কম্পিত হৃদয়ে বর্তমানকেই সার জেনে মিলন গ্রন্থি বেঁধেছিল—তারা কি তখন অসীমের সংহত সুর শুনেছিল? তাদের এই প্রয়াসও মহাঅতীতে লীন হবে, সৃষ্টির অগ্রসরতায় ওদের প্রেমের স্থায়িত্ব কতটুকু? বিশ্বের যে বৃহৎবাণী অনন্তের মধ্যে লিখিত আছে—তার কতটুকু ওদের দুজনের মিলন-লিপির মধ্যে ধরা পড়েছে? প্রেমের মিলনেও যে একটি কারুণ্য অপেক্ষা করে পরিণামে—তা কি কেউ জানে?

ভাবনার সুগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে-ভাষা
করিয়াছে বাসা
অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা

কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।

বিশ্বের বৃহৎবাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে

তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে

ওদের মিলনলিপি চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে ?

'রাত্রিরূপিণী কবিতায় কবি নিজের পরিণত জীবনের ক্লান্তির-অপনোদনের কথা ব্যক্ত করে রাত্রির কাছে শান্তির আশ্রয় চেয়েছেন।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্লান্ত কবি উপলব্ধি করছেন যে তাঁর জীবনের ক্লান্ত দিনের সমাপ্তি ঘটেছে, এসেছে রাত্রির বিস্তৃত ঘন অন্ধকার। এই অন্ধকারময়ী শান্ত রাত্রিরূপিণীর প্রেমে কবি নিজেকে পবিত্র করে তুলতে চান। কবির জীবন-দিন ক্লান্ত, তাই রাত্রি-রূপিণীর কাছে তিনি শান্তির আশ্রয় চান। তার কাছে কবির প্রত্যাশা ঃ যত কিছু লাভক্ষতি রাত্রির অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক!

যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টি'র প্রাঙ্গণে

বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর

শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,

সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে

ক্ষুব্ধ এ জীবনে।

তব প্রেমে

চিত্তে মোর যাক থেমে

অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ

দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।

কবির ক্ষুব্ধ জীবন রাত্রিরূপিণীর আলিঙ্গনে মধুময় হয়ে উঠুক। কবি শান্ত, সমাহিত হতে চান।

বিশ্বের যে প্রকাশ কবি মানসলোকে উপলব্ধি করেছেন—এই 'ধ্যান' কবিতায় তিনি তাকে অনন্তের সঙ্গে একাত্ম করে ভেবেছেন।

ধ্যান-নেত্রে বিশ্বের বাস্তবাতীত যে সৌন্দর্য ধরা পড়ে—সেই সৌন্দর্যের কাছেই কবির আত্মসমর্পণ!

কবি নিজের জীবনের আশা-নৈরাশ্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুঃখসুখ, প্রেম-প্রীতি—যা-কিছু বাস্তব জীবনের উপলব্ধি—তা শেষ করে দিচ্ছেন, কেননা তিনি ধ্যানের দ্বারা অধ্যাত্মমানসের পূর্ণচেতনার আলোকে অনন্তকে ধরতে পেরেছেন। তিনি তাঁর খণ্ডজীবনের পটভূমিতে অখণ্ডকে উপলব্ধি করেছেন। সেই অনন্তের মধ্যেই কবি বাস্তব জীবনের সমস্ত কর্মকীর্তি ও উপলব্ধিরাশি ন্যস্ত করে নিজে সমাহিত হতে চান।

'কৈশোরিকা' প্রেমের কবিতা। কৈশোরের লীলাসঙ্গিনীর প্রেমকেই স্মরণ করেছেন কবি; জীবনপথের প্রত্যূষকাল থেকে এই প্রিয়া কবিকে বিচিত্র ভাবনচেতনার মধ্যে এনেছে, এক সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, একত্রে প্রেমের অভিসারে ছুটেছে। কবি আজ সব স্মরণ করেছেন, কিন্তু তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে এক মহাসুদূরের পথেই তাঁকে চলে যেতে হবে—সে কথাও যেন তিনি তাঁর কৈশোরিকার কাছেই শুনেছেন। কৈশোরিকা তাঁকে এক নবজীবনের পারে এনে দিয়েছে, দেশকালের অতীত যে মহাদূর—তারই বার্তা কবি কৈশোরিকার কণ্ঠে শুনেছেন। অসীমের দূতীর মতোই কৈশোরিকা অনন্তজীবনের নন্দন-ফুলমালা অপূর্ব গৌরবে পরাতে চায়।

এই কবিতাটির সঙ্গে এই পর্বে রচিত কবির আরো কয়েকটি প্রেম-কবিতার ভাব-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে; সে দিকটা মনে রেখে শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মশাই বলেছেন যে কবি একটি মানসী-মূর্তিকেই ধ্যান করেছেন। "একদিকে 'বলাকা'র 'ছবি' কবিতার সঙ্গে এই সব কবিতা মিলিয়ে পড়লে, এবং অন্যদিকে 'পূরবী'র 'কিশোর প্রেম' ও 'দোসর' কবিতার 'সঙ্গে 'বিচিত্রিতার'

'নীহারিকা' ও 'বীথিকা'র 'কৈশোরিকা'র ভাবানুসঙ্গ বিশ্লেষণ করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, কবি সর্ব্বত্র একটি মানসী মূর্তিকেই ধ্যান করেছেন,—একটি প্রেমই সর্বদা নব নব রূপে তাঁর চিত্তে আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে।"[৬]

'সত্যরূপ' কবিতায় দেখি কবি খণ্ডিত জীবনে অক্ষয় সৌন্দর্যের স্পর্শ উপলব্ধি করেছেন। ক্ষণস্থায়ী জীবন গতিমান,—অতিদ্রুত সে অতীতলোকের দিকেই ছুটে চলেছে। তবু এই জীবনের মধ্যেই কবি চিরন্তন সৌন্দর্যের আস্বাদ অনুভব করেছেন। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে জীবনের সবকিছু তো হারিয়ে যায়, কিন্তু একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর জাগরূক থাকে। জীবনের পথে কত লোকের আসা-যাওয়া, চঞ্চল সংসারে মায়ার আবর্ত-রচনা—সবই তো নিভে যায়। প্রত্যহের চেনা জানা কয়েকদিন পরেই তো পরিচয়হীন হয়ে পড়ে। এই চঞ্চল আবর্তনশীল জগতের মধ্যেই স্বর্গের জ্যোতির্ময় আলোর স্পর্শ যেন শুনতে পাওয়া যায়। এই ক্ষণ-জীবনেই কবির প্রত্যয় ঘটে—তিনি মহাকাল দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি মহেন্দ্র মন্দিরে আছেন। আর তখন তিনি বুঝতে পারেন—

বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা
আপন দেউটি।

প্রেমের দান-প্রতিদানের বোধ নিয়ে লেখা 'প্রত্যর্পণ' কবিতাটি। কবি নিজের মনের মমতা এবং সৌন্দর্য দিয়ে তাঁর প্রিয়ার যে মূর্তি রচনা করেছেন—তা অনবদ্য, এবং কবি স্মরণ করছেন যে তাঁরই কিশোর-শক্তি সেই মূর্তিতে প্রেমের মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়েছিল, কিন্তু কবি-প্রিয়া কবিকে কবির দানের চেয়ে গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ দান প্রত্যর্পণ করলেন ; পুষ্পমাল্য শুধু নয়, কবি-প্রিয়া

নিজেকে সমর্পণ করেই সেই অমূল্য দানের মর্যাদা রাখলেন। প্রিয়ের হাত থেকে প্রেমের পুষ্পমাল্য সে প্রেমেরই বিনিময়ে গ্রহণ করে নারী পুরুষের দানকে ধন্য করে, গ্রহণ করেই সে প্রেমের প্রত্যর্পণ ঘটায়।

'আদিতম' কবিতায় দেখি কবি-চিত্তের আকুতি জীবনের সুগভীর রহস্যময়তার দিকেই ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। কবি নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, যেখানে তিনি বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দন প্রতিধ্বনিত শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু-সৃষ্টি-রহস্যের সম্পূর্ণ কথা তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না,—মন বলে—কই, কিছু তো জানা গেল না। কবির চারদিকে বিচিত্র সুন্দব প্রাকৃতিক জীবন বিক্ষিপ্ত রয়েছে, কবি সেদিকে তাকিয়েছেন—সেই প্রাণপ্রাচুর্যভবা জীবন-চাঞ্চল্য মুখরতার মধ্যেই কবি বিশ্বসত্তাব আদিম বাণীই শুনতে পেয়েছেন! বিশ্বপ্রাণের প্রথমতম কম্পন অশথেব মজ্জায বিচরণশীল, সেই বৃক্ষের মর্মরধ্বনি আকাশের বুকেও ধ্বনিহীন ঝংকাব তোলে। এই তরুলতা— কুসুম ও পল্লবের মাধ্যমে বাঙ্ময হয, আর মূক জল স্থলে আদি ওঙ্কারধ্বনি ফুটিয়ে তুলছে!

> ধরণীব ধূলি হতে তারাব সীমার কাছে
> কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
> তার মাঝে নিই স্থান,
> চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

'সোনার তরী'তে 'অহল্যার প্রতি' 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় এবং 'ছিন্নপত্রে'র কয়েকটি চিঠিতে কবি আদি প্রাণের স্পন্দনের কথা বার বার বলেছেন।

'পাঠিকা' কবিতাটির সুর অপেক্ষাকৃত লঘু। কবি কল্পনা করছেন— তাঁর পাঠিকা নিজের মনের সমস্ত প্রীতি ভালবাসা দিয়ে কবিকে সম্মানিত করছেন; না-দেখা কবির বাণী তাঁকে আকুল করেছে।

কবির রচিত প্রেমগাথার মধ্যে পাঠিকা যেন প্রচ্ছন্নভাবে নিজের একটা ভূমিকারও সন্ধান পান। তাই পাঠিকা কবিকে না দেখেও নিজের সমস্ত প্রাণমন দিয়ে কবিকে ভালবাসার উপঢৌকন পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে '১৪০০ সাল' কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছেন—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে!

কবি সেই প্রশ্নের পাত্রীকে এখানে পাঠিকার ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন বলে একটা ক্ষীণ সন্দেহের কথা বলা যেতে পারে। তবে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে তাতে দূরান্বয় এবং অনন্বয় দোষ ঘটতে পারে।

'ছায়াছবি' কবিতাটি স্নিগ্ধ প্রেমের এক মিষ্টি অনুভূতির ফসল। বিস্মৃত কোন্ এক শ্রাবণের মুখর দিবসে একটি ভীরু ও নতনেত্র ছাত্রীর প্রীতি ও প্রেমের স্মরণেই এই কবিতা। কবির মনে সেই ছাত্রীটি তার অন্তর্লীন প্রীতির কোন্ এক সুর সংযোগ করে দিয়েছে—কবি আজ তা ধ্যান করছেন। কবিতাটি স্মরণমূলক।

হঠাৎ দেখি চিত্তপটে চেয়ে
সেই যে ভীরু মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর দুটি আঁখি।

'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কবি চন্দননগরের বাসকালে লেখেন। চন্দননগরের স্মৃতি কবির কাছে সর্বদা উজ্জ্বল। 'বীথিকায়' অনেক প্রেমের কবিতা আছে—যেগুলি এই চন্দননগরেই রচিত। তার মধ্যে কয়েকটিতে স্মৃতিচারণা আছে। 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি পড়লে সহসা মনে হতে পারে

এখানে বুঝি স্মৃতি রোমন্থন নেই, সাধারণভাবেই এই কবিতাটির রস-গ্রহণ সম্ভব, এবং সে দিক থেকেই কবিতাটি অনবদ্যতার দাবিও রাখে। তবু একথা ঠিক যে এটিও স্মৃতিমূলক কবিতা। কবি তার মানসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন, এ মানসী চিরকালের, প্রতিটি প্রেমিক পুরুষের মনোভূমিতে ধ্যানে ও কল্পনায় যে প্রিয়ার অধিবাস, তারই সগোত্র হচ্ছে কবির নিমন্ত্রিত এই মানসী। কোন্ পোষাকে কোন্‌ভাবে ও ভঙ্গিমায় কবির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাছে আসবে—তারও একটা ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে বটে, তবু প্রিয়া তার নিজের ইচ্ছানুসারে কাছে আসুক, বসুক। অবসর যদি থাকে—তবে কথা বলবে, নচেৎ সময় ফুরোলে ফিরে যাবে।

কবিতাটিতে কিছু রাগরসিকতাও আছে—বিশেষ করে কবি প্রিয়াকে যে সব জিনিসপত্র নিয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন, সেগুলির উল্লেখ যেখানে আছে। এর পরই কবিতার মধ্যে গভীর বেদনার সুর বেজে উঠেছে—

> যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
> লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে;
> মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
> কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

কবি যত কেন না সংশয় প্রকাশ করুন—এ নিমন্ত্রণ লিপি যে বউ ঠাকরুণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে—এমন সংকেত এখানে আছে। তাই গোড়াতেই বলেছি যে কবিতাটি স্মৃতিমূলক। এ বিষয়ে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশাইও সেইরকম ইঙ্গিত করেছেন। তিনি লিখছেন—"চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতি কাদম্বরী দেবীর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত জড়িত। মনঃসংযোগ করিয়া কবিতা কয়টি পাঠ করিলে কবির মনোভাব স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়।" [৭]

এই কবিতার চতুর্থস্তবকে (যার শুরু—মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হল,/বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;) যাঁর ছবি অঙ্কিত আছে—তিনি যে কাদম্বরী দেবী ছাড়া অন্য কেউ নন, এমন ইঙ্গিতও প্রভাতবাবু করেছেন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করে। সেই অংশটি হলো— "দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচি পান। বৌ ঠাকরুণ গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা।" [৮]

এই 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটির সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মশাইও সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন—"রবীন্দ্রনাথের বিরহী চিত্তে অতীত-বর্তমানে ভাগ-করা কাল পবিধির গণ্ডি হয়েছে বিলুপ্ত, ইহলোক ও পবলোকের সীমান্তরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। চন্দননগরের লেখা "নিমন্ত্রণ" কবিতাটি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রেমের কবিতা হিসাবে কবিতাটিব তুলনা নেই। দেশকাল অভিভূত করা মিলনের এমন অপূর্ব স্বপ্ন কামনা এমন মধুচ্ছন্দা কাব্য-মালিকা দ্বিতীয়বার গ্রথিত হয়েছে বলেও আমরা জানিনে। প্রাণের দোসবের সঙ্গে চিরপ্রত্যাশিত মিলনের আকাঙ্খায় কবিমানসে 'হাতে হাতে দেবার নেবার' যে নতুন পালা গড়ে উঠেছে তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে কবিতাটিতে।" [৯] শেষে তিনিও রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতবাবুর মতে সায় দিয়েছেন।

'ছুটির লেখা' কবিতাটি চন্দননগরে রচিত এবং মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতিও এখানে প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে। এই কবিতাটির সুর হাল্কা হলেও কবির মনে একটি ছবি জেগেছে, সেই ছবিটাই তিনি লঘুছন্দে এঁকেছেন। তাঁর 'ছুটির লেখা' শূন্য দ্বীপের সৈকতরেখার মতো—দৃষ্টি অতীত দূরের দিকে মুখ ফেরানো, কিংবা

আরো সাধারণ আটপৌরে কাপড়ের মতো ধুলোমাখা, সামাজিক নিমন্ত্রণরক্ষায় পরে যাওয়া যায় না, অথবা যেন বয়ঃসন্ধিলগ্নেব কোনো বালিকা, কৈশোর জীবনেব উড়ো উড়ো ভাবনায় যে চঞ্চল। তাঁকে দেখার সংবেদন নিয়ে এলেই উপলব্ধি করা যাবে কবির এ লেখা। কবি সেই প্রগল্‌ভ বালিকারই ছবি এঁকেছেন।—কে জানে এই বর্ণনায় কবির নিভৃত মনেব কোনো নারীমূর্তিব রূপ ধরা পড়েছে কিনা।

'নাট্যশেষ' কবিতায় কবিব বেদনামিশ্রিত অথচ এক গম্ভীব ভাবানুভূতিব পবিচয় বয়েছে। এই বিশ্ব হচ্ছে বঙ্গমঞ্চ, মানুষ তাব নটনটী— এই অতি সহজ ও পুবানো ভাবেব ওপবই ভিত্তি কবে কবিতাটি বচিত, তবে কবিব ব্যক্তিক জীবনেব অন্তর্গূঢ় একটি ব্যথাই এই কবিতাটিব ভেতব বীজাকাবে বয়েছে।

বিশ্ব-বঙ্গমঞ্চ আব মানুষেবা অভিনেতৃবর্গ। এখানে যে যার জীবন-ভূমিকাব অভিনয়টুকু কবেই চলে যাচ্ছেন। কবি এই বিশ্ব-বঙ্গমঞ্চেব নটনটীদেব জীবন-ভূমিকাব পবিপ্রেক্ষিতে নিজেব ব্যক্তিগত জীবনেব অভিনয়টুকু মিলিয়ে দেখছেন।

মানুষ নটরূপে নেপথ্যলোক থেকে দেহ-ছদ্মসাজে এসেছে, হাসি-কান্নাব মাধ্যমে যে যাব অভিনয় সেবে দেহবেশ ফেলে আবাব নেপথ্যলোকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন বিশ্ব-মহাকবিব কাছে হয়তো এই অভিনয়েব নাটকীয় কোনো অর্থ আছে, তাঁর কাছে হয়তো হাসি-কান্নাব এই ভূমিকাব তাৎপর্য ধবা পড়ে। মানুষরূপ নটনটী যতক্ষণ সংসাব বা পৃথিবীব নাটমঞ্চে ছিল— ততক্ষণ তাদেব হাসি-কান্নামাখা জীবন-পবিচয়টুকু একান্ত সত্য বলে জেনেছিল—তাবপব যবনিকা-পতনেব সঙ্গে সঙ্গে যখন দীপশিখা নিভে গেল, বিচিত্র চাঞ্চল্য থেমে গেল, তখন তাবা বিশ্বরঙ্গমঞ্চ হতে অপসৃত হলো। তাদেব ভালোমন্দ, সুখদুঃখ, স্তুতিনিন্দা, উত্থানপতন—সব অর্থহীন হয়ে গেল, চিরতরে লুপ্ত হলো। বিশ্ব-মহাকবির কাছে হয়তো এই ভালোমন্দ

বা হাসিকান্নার একটা গূঢ় অর্থ থাকালেও থাকতে পারে,—তিনি হয়তো এই ব্যাপারটিকে কবির কাব্যরচনার মতো নাটকের উপজীব্য বিষয় বলে গণ্য করতে পারেন।

কবিও আজ মৃত্যুর দেশে উপনীত, তাঁর জীবনে গোধূলি এসেছে, জীবনের ভাঙা ঘাটে তিনি বৃদ্ধ বটবৃক্ষের ছায়াতলে এসে পৌঁছেছেন। সেখানে বসে তিনি তাঁর জীবন-নাট্যের প্রথম নাট্যভাগ—কালের লীলায় যা অভিনীত হয়েছে—তাই তিনি রোমন্থন করতে বসেছেন। সেদিনের জীবনভূমিকায় তিনি অভিনয় করে চলেছেন—না বুঝে না জেনে, কোনো কিছুর কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণা না করেই তিনি তাঁর ভূমিকা অভিনয় করে গেছেন। তখন সহসা তাঁর জীবন-পথে দেখা হলো একজনের সঙ্গে, মুহূর্তেই জানাশোনা পরিব্যাপ্ত হলো জীবনের দিগন্ত পেরিয়ে; জীবন হলো সৌরভে পূর্ণ, ফাল্গুনচাঞ্চল্যে শিহরিত। তারপর—

সহসা রাতে সে গেল চলে
যে-রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে-অঞ্জলে
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে। সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে বিঁধে আলোকের সূচি;
সে-রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি।
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে, ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

শেষ অঙ্কে বসে আজ কবি জীবননাট্যের প্রথমাঙ্কের ঘটনাবলী স্মরণ করছেন। এই কবিতাটিও চন্দননগরে লেখা। তাই জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কের এই বিশেষ চরিত্র হিসেবে কাদম্বরী দেবীর কথা কবির মনে পড়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। স্মৃতিলগ্ন এই বেদনাটুকু এই কবিতায় অন্তর্লীন হয়ে আছে।

'বিহ্বলতা' কবিতাটি কিছু অস্পষ্ট, বিভিন্ন ঋতুর রূপবিভিন্নতা দেখে কবি বিহ্বলতা বোধ করেছেন, না প্রকৃতির ভিন্ন পটভূমিতে কোনো নারীকে দেখে কবি বিহ্বল হয়েছেন—তার স্পষ্ট প্রমাণ নেই। প্রকৃতির দিক থেকেই আগে অর্থ বোঝা থাক।

প্রকৃতির যথার্থ রূপের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর, বৈশাখে শুষ্ক তরু, ম্লান অরণ্যে প্রকৃতির যে রূপ দীপ্তমূর্তি—তা কবি দূর থেকে মুক্তকণ্ঠে নিঃশব্দ মধ্যাহ্নে তার বন্দনা করেছেন, হয়তো তা অশ্রুত-ই থেকে গেছে তবু তা ব্যর্থ নয়, কবি যে স্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে সত্য নমস্কার ও পূজা অর্ঘ্য অর্পণ করেছেন—তা তো কবিরই গৌরব।

বসন্তে মাধুর্যময়ীরূপে কবি বিহ্বল, চেনবার বা চেনাবার শান্ত অবসর তিনি পান নি, শুধু মোহমুগ্ধ উপলব্ধিতেই লগ্ন রয়ে গেল। এবার অন্য অর্থ দেখা যাক।

বিকশিত ফুলের উৎসবে পল্লবের সমারোহে সহসা অপরিচিত নারীকে দেখা অবশ্যই তৃপ্তির। কবির মনে পড়ে সেই কবে শুধু ক্ষণকালের জন্যে দেখেছিলেন! বৈশাখে খর সূর্যতাপে তখন ধরিত্রী দীর্ণ, শুষ্কতরু, ম্লানবন, অবসন্ন পিককণ্ঠ, শীর্ণচ্ছায়া নির্জন অরণ্য, সেই তীব্র আলোর দীপ্তমূর্তি কবি সেই নির্বিকার মুখচ্ছবি দেখেছিলেন!

> বিরলপল্লব স্তব্ধ বনবীথি-'পরে
> নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠস্বরে
> করেছি বন্দনা।

জানি, সে না-শোনা স্বর গেছে ভেসে
শূন্যতলে।
সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে
একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার,
অসংকোচে পূজা-অর্ঘ্য,
সেই জানি গৌরব আমার।

আবার বসন্ত দিনে মদির আকাশতলে পুষ্পরেণু-আবিল আলোকে মাধুর্যের ইন্দ্রজালে রাঙা তাকে কবি দেখলেন, কিন্তু চেনার বা চেনাবার অবসর পেলেন না।

কোনো কথা বলা হল না যে,
মোহমুগ্ধ ব্যর্থতার সে বেদনা চিত্তে মোর বাজে।

'শ্যামলা' কবিতাটি রূপেব পূজাবী ববীন্দ্রনাথেব রূপতন্ময়তার এক দার্শনিক বোধেরই পরিচয় বহন করে আছে। নারীর রূপ আর প্রকৃতির দৃষ্টিগত রূপ যে উপলব্ধিব একই ক্ষেত্র থেকে উৎসাবিত—এখানে সে কথাই ঘোষণা করা হযেছে। প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে যখন নারীকে দেখা যায়—আন ঐ একই দৃষ্টি দিয়ে প্রকতিকে দেখা যায—তখন উভয় ক্ষেত্রে যে সৌন্দর্য ধবা পড়ে—তার মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না, উপবন্তু উভয় সৌন্দর্যই তখন দূবেব অধরা সামগ্রীর মতোই মনে হয়।

কবি শ্যামলা নারীকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেছেন, চিত্তের গহনে সে চুপ করে আছে, মুখে তার সুদূবেব রূপ ধরা পড়েছে, সন্ধ্যার আকাশের মতোই সে স্নিগ্ধ, চিন্তাহীন। তার দূর দৃষ্টিতে সমুদ্রের ইঙ্গিত কবি দেখেন—

অধরে তোমার বীণাপাণি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝংকার।

অগীত সে সুর
মনে এনে দেয় কোন্ হিমাদ্রির শিখরে সুদূর
হিমঘন তমস্যায় স্তব্ধলীন
নির্ঝরের ধ্যান বাণীহীন।

প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বিশ্বে সকল কিছুর মধ্যেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের খনি আবিষ্কৃত হয়। সীমিত বিশ্বের সৌন্দর্য তখন অসীম লোকের সম্পদ হয়ে যায়। তাই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখা শ্যামলা নারীর সৌন্দর্য প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক্ মুখখানি।

প্রকৃতির ‍ন্দব বস্তুব মাধ্যমে যে অনুভূতির রণন কবিচিত্তে জাগে শ্যামলীর নির্বাক মুখখানি দেখে কবিব চিত্তে সেই একই সুর বাজছে। কবির সৌন্দর্যদৃষ্টি কবিকে কাছেব জিনিসকে দূবের ও অপ্রাপণীয়তার সামগ্রী বলে মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতিব সৌন্দর্য ও নারীর সৌন্দর্য—তাঁর মনে দূরের সৌন্দর্যের আভাস জাগাচ্ছে। সৌন্দর্য—প্রকৃতিরই হোক, বা নারীরই হোক কবির ধ্যানলোকে তা ধরাছোঁয়ার বাইরের জগতের বস্তু হয়ে দূরাতীত অনির্বচনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে!

‘পোড়োবাড়ি’ কবিতাটি হারানো প্রেমের বেদনাবহ, কবি তাঁর পুরাতন প্রেমের স্মৃতিরঙীন একটি ছবি এঁকেছেন। অতীতে কবে কোন্ দিন কবি তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে পরমপ্রীতিতে আবদ্ধ

থেকে দিন কাটিয়েছেন, প্রিয়ার শয়নকক্ষে কবি ফুল রেখে আসতেন, বালিশের তলায় রেখে আসতেন চিঠি। বহু বর্ষ মাস দিন আজ কেটে গেছে, কবির সেই প্রেমজীবন শেষ হয়েছে, স্মৃতি বিবর্ণ হয়েছে, আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে সেদিনের কথাগুলি দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো যেন ঝুলে রয়েছে, প্রিয়ার সেদিনটি আজ পোড়োবাড়ির মতো— তার লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে, বিস্মৃতির আগাছায় পথ ভরে গেছে, দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাসে তাকে ভূতে পাওয়া ঘর বলে মনে হচ্ছে।

'মৌন' কবিতায় নীরব সাধনাই যে কবির কাম্য—সে কথা বলা হয়েছে। কথা দিয়ে যাকে ডাকা যায়, প্রকাশের ব্যাকুলতা দিয়ে যাকে আহ্বান জানানো যায়—তাকে তো অন্তরে পাওয়া যায় না। আড়ম্বর বা ঘটার মধ্যেই যেন তার অবসান ঘটে। কিন্তু প্রাণের নীরব সাধনায় যাকে ডাকা যায়, ধ্যানে যাকে অন্তরে চাওয়া হয়— তারই আসন পাকা হয় মনে। পর্বতের এই নির্লিপ্ত সুদূরতা ও নীরবতা আকাশে আকাশে বিশাল আকর্ষণ জানায়, আর সেই আর্তি ও আকুলতা জয়ী হয়, চিরন্তন হয়। মুখরতা অপেক্ষা তাই মৌন সাধনা অনেক বেশী গভীর ও কার্যকরী।

'ভুল' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যধারণার একটি দিক উদ্‌যাপিত হয়েছে। সর্বাঙ্গসুন্দরকে কেন্দ্র করে প্রেমের তীব্রতা প্রকাশিত হয় না, যেখানে ভুল, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভাব, যেখানে ত্রুটি এবং অপূর্ণতা সেখানেই মানুষের প্রেমের তীব্রতা এবং সার্থকতা—তথা গৌরব। 'ভুল' কবিতায় কবি এই তত্ত্বটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

কবি-প্রেয়সী গান গাইতে গিয়ে ভুল করেছে, এবং তাললয়ের ভুলের জন্যে লজ্জিত হয়েছে। তার সেই শরমরাঙা মুখের যে ম্লানায়মান অশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য—কবি তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন—

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনা ভরা ত্রুটির মাঝখানে।
নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে
করুণ পরিচয়
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

ত্রুটিও অপূর্ণতার মধ্যেও খাঁটি প্রেম সৌন্দর্য আবিষ্কার করে থাকে। নিখুঁত শোভা তো অমিত তেজে নিজেকে প্রকাশ করে—সেখানে প্রেম কিছুতেই সার্থক হতে পারে না। যেখানে ত্রুটি, সেখানে যদি প্রেমের উজ্জীবন ঘটে—তবেই সে প্রেম গৌরব ও সার্থকতা লাভ করে। পর্বতে যেমন জমা থাকে কঠিন তুষার, উত্তাপে যেমন তা গলে নদীর ধারা রূপে নেমে আসে সমতলে, তেমনি প্রেয়সীর এই ত্রুটিজনিত লজ্জারাঙা যে অপূর্ণতা—তা ছিল স্তব্ধ হয়ে—এখন অশ্রুর ছদ্মসাজে মহিমান্বিত রূপ নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দেখা দিল, কবি সেই ফাঁকে উপলব্ধি করলেন অপূর্ণতার মধ্যেই যথার্থ প্রেমের অধিবাস।

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো

টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো ;

আমার সাধনাতে

এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে।

মর্ত্ত্যলোকে অমর্ত্যলোকের সৌন্দর্যাভাস কবি দেখছেন, সীমার প্রকাশে যেন অসীম প্রকাশিত হচ্ছেন।

'ব্যর্থ মিলন'ও প্রেমের কবিতা। কবি তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যগ্র, কিন্তু তাকে একাগ্রভাবে পান না, মিলন ব্যর্থ হয়ে যায়। কর্ত্তব্যের খাতিরে প্রেমের ঋণ শোধের মনোভাব নিয়ে এলে মিলন যে ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে। শরতের মেঘের মতো ছায়া দিয়ে প্রিয়া চলে যায়, মরুভূমির পিপাসা তাতে দূর হয় না। কবি প্রেমের তপস্যার দ্বারাই জয় করতে চান প্রিয়াকে, দস্যুর মতো কেড়ে নিতে চান না। যদি এতেও প্রেয়সীকে না পাওয়া যায়, তবু তিনি প্রত্যাশী থাকবেন—আশা করার মধ্যেই তাঁর শান্তি ও সফলতা।

'অপরাধিনী' প্রেমমূলক কবিতা। কবি তাঁর প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করতেই চান। যে হাতে তিনি তাঁর কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিয়ে বরণ করেছেন—সেই হাতে তো শাসনের দণ্ড থাকতে পারে না। কবি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে তিনি তাঁর প্রিযার প্রতি অন্যাযভাবেই প্রেম ও প্রীতির আসন মুক্ত করে রেখেছেন। তাঁব প্রিযা তাঁকে চান না, অথচ কবি অযথা তাঁকে প্রেমের কারাগারে আটকে রেখেছেন। কবি আজ সেই রুদ্ধ কারাগারের দ্বার মুক্ত করলেন. ভালবেসেছিলেন বলে নিজেই আজ কাঁধে তুলে নিলেন শাস্তির জোয়াল। এতদিন তাঁর অনিচ্ছুক প্রিয়াই তো ছিল আটকা কবির প্রেমের কারাগারে ; সেই শাস্তির অবসান ঘটিয়ে কবি আজ তাকে মুক্ত করে দিতে চান, তার বদলে শাস্তি শুরু হোক কবির—ভালবাসার জগতে বুঝি এই হলো বিধির বিধান।

'বিচ্ছেদ' বিরহভাবনার কবিতা। দার্জিলিঙে থাকার সময় হিমালয়ে

বর্ষার আগমনে কবি কয়েকটি বিরহভাবমূলক কবিতা লেখেন, সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠেই হিমালয়ে বর্ষা নামে, কবি তাই লিখেছেন—যক্ষ, বিচ্ছেদ প্রভৃতি কবিতা। ব্যক্তিগত কোনো বিরহবেদনার উপলব্ধি এসব কবিতায় নেই বলেই মনে হয়।

মেঘদূতের বিরহী যক্ষ এবং যক্ষপ্রিয়ার বিচ্ছেদ ও বিরহ নিয়ে কবি প্রচুর কবিতা লিখেছেন, 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি রচনার দুদিন পরেই তিনি 'যক্ষ' কবিতা লেখেন। 'বিচ্ছেদে' তিনি বিরহের এক রূপ অঙ্কিত করেছেন—এখানে দুজনের মধ্যে কল্পনার বাধা আছে, স্বপ্নেও মিলনের পথ-রচনা সহজ হয় না, মনে মনে একে অন্যকে ডাক দেয়, তবু সামান্য আঘাতেও দুজনের মুখোমুখি দেখা ঘটলো না

দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে ;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে।

তাই বিচ্ছেদ-বেদনা তীব্রতর হয়, প্রকৃতিতেও বুঝি তার প্রতিফলন জাগে। দুজনের ভাগ্য শুধু অপেক্ষা করে আছে—কখন দোঁহার মধ্যে একজন সাহস করে বলে উঠবে যে—যে মায়াডোরে বন্দী হয়ে দূরে আছি এতদিন—তা এবার ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন। যাকে সামনে চাই—সে যে পিছনেই দাঁড়িয়ে। বিরহ ঘটিত এই সমস্যার সহজ সমাধানের কথাই কবি এই 'বিচ্ছেদ' কবিতায় বলেছেন।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি চন্দননগরে লেখা। কবি আকাঙ্খিত বস্তু পান নি, কিন্তু ভিক্ষুকের মোহ নিয়ে প্রার্থনা করতে পারবেন না ; বরং তিনি বিচ্ছেদ বেদনায় নিজের অদৃষ্টকে অভিশাপ হানবেন, দুর্লভকে না পান—ক্ষতি নেই। পর্বতের অন্ত প্রান্ত বেয়ে নির্ঝরিণী বয়ে চলে, তার কলধ্বনি আর প্রান্তের তৃষ্ণাকে শুধু বাড়িয়ে তোলে ; কবির জীবনেও তেমনি স্বপ্নের বঞ্চনা বাড়িয়ে দেয়। তিনি তাই ব্যর্থ দুরাশাকে কঠোর

বীর্যের দ্বারা জয় করার শক্তি অর্জনের চেষ্টা করবেন— ভিক্ষুকের মোহ পোষণ করার চেয়ে তিনি বিদ্রোহী হবেন—বরং সেই ভালো।

'আসন্ন রাত্রি' কবিতায় কবি নিজের জীবন-সন্ধ্যায় মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন-বাসরে মৃত্যু-বধূর আগমন ঘটছে, তারই সংকেত এসেছে—শীতের সন্ধ্যা তাই মৃত্যুবধূর জন্যেই বাসর সাজাতে ব্যস্ত। অতীত দিনের সৌরভ হারিয়ে গেছে, মধুপূর্ণিমা রাতে যে মাধবীহার গাঁথা হয়েছিল তাও আজ বিবর্ণ।

মিলনদিনের প্রদীপের মালা
পুলকিত রাতে যত হয়েছিল জ্বালা,
আজি আঁধারের অতল গহনে হারা
স্বপ্ন রচিছে তা'রা।
ফাল্গুনবনমর্মর-সনে
মিলত যে কানাকানি
আজি হৃদয়ের স্পন্দনে কাঁপে
তাহার স্তব্ধ বাণী।

আজ কবির মনের কক্ষে মৃত্যু তার অবগুণ্ঠিত নিরলংকার মূর্তিখানি নিয়ে এসে তুষারশীতল শেষ স্পর্শ হৃদয়ে ছোঁয়াতে চাইছে।

'গীতচ্ছবি' কবিতাটি চন্দননগরে কবি তাঁর নিজের মানসকে সম্বোধন করে বলেছেন যে তাঁর মানস-প্রিয়া যখন গান করেন—তখন সেই-অমূর্ত সংগীত কবির চেতনায় মূর্তিময় হয়ে ওঠে, যজ্ঞ থেকে উঠে আসা যাজ্ঞসেনী মূর্তিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের পটভূমিতে কবি-প্রাণে এসে ধরা দেয়, প্রাণের রহস্যলোকে প্রবেশ করে সেই অমূর্ত চেহারা। এই রূপাতীত অনুভবময় মূর্তিই কবির কাব্য। মানসীর গানে যে অনাদি সুর নামে, সেই সুর-মূর্ছনার সূত্র ধরে কবি বিশ্বলোকের অন্তরে, প্রাণের রহস্যলোকে প্রবেশের পথ পান! কবির চেতনা সেখানে নিঃশব্দে প্রবেশ করে—

যেখানে বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে-গীতি।

'ছবি' কবিতাটি লঘু প্রেমের কবিতা। একটি নারীর ছবি এঁকেছেন কবি, আর সেই নারীকেই সম্বোধন করে বলেছেন—সেই ছবি দেখতে। প্রকৃতি রূপ, রঙ, রস দিয়েই এঁকেছেন সেই ছবি, প্রকৃতির সঙ্গে তাই আঁকা ছবি যেন একাত্ম হয়ে উঠেছে।

'প্রণতি' কবিতার বক্তব্য সাধারণ। জীবনসন্ধ্যায় কবি অস্তমহা-সাগরের তীরে পৌঁছেছেন, সেখান থেকে তিনি উদয়গিরি শিখরের উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছেন। নবজন্মলগ্নে, নবজীবনযাত্রার সময়ে তিনি পৃথিবীর আশীর্বাদ পেয়েছেন, সুখ দুঃখের বিচিত্র আবর্তনের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছেন, অনেক তৃষ্ণা অনেক ক্ষুধার মধ্যেও তিনি সুধার সন্ধান পেয়েছেন—সে সব স্মৃতি নিয়েই তাঁকে আজ চলে যেতে হবে, মায়াঘেরা খেলাঘরের মতোই সংসার-জীবন শেষ হতে চলেছে ; কখনো সুখে কখনো দুঃখে, কখনো সুরে কখনো বা বেসুরে জীবনের রাগিণী গেয়েছেন তিনি, আজ তার শেষ।

সাজাতে পূজা করি নি ত্রুটি
ব্যর্থ হলে নিলেম ছুটি,—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

'উদাসীন' প্রেমের কবিতা। কবির প্রেমনিবেদন প্রেয়সীর কাছে গৃহীত হয় নি, ঔদাসীন্যভরে তা সরানো হয়েছে ; প্রকৃতির সুন্দর অবদানের কাছে কবির দান তুচ্ছ,—প্রকৃতি নিজের সুন্দর দানে পৃথিবীকে সুন্দরতর করে, কেউ তাতে ঔদাসীন্য দেখায় না, কবির অন্তরের দানও কেউ যেন উদাসীন নির্মমতায় অবহেলা না করে।

তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে মানবিক দান অপেক্ষা প্রাকৃতিক দানের মহিমা গুরুতর।

'দান-মহিমা'য় কবি তাঁর প্রেয়সীর এক মহিমান্বিত রূপ অঙ্কিত করেছেন, দান করেই কবি-প্রেয়সীর মাহাত্ম্য। ঝরণা যেমন নিস্তরঙ্গ গতিতে এগিয়ে এসে তৃষিত চিত্তের কাছে অফুরন্ত বারিধারা দান করে, বটবৃক্ষ যেমন পল্লবে পল্লবে ছায়ার আশীর্বাদ ছড়ায়, কবি-প্রেয়সীও তাঁর মনের ধীর এবং উদার গাম্ভীর্যে আকাশের মতো নিজের মহিমা বিকীর্ণ করে। কবির কাছে যে কবি-প্রেয়সী আছেন—এটিই পরিতৃপ্তির বিষয়, কবি তাই উপলব্ধি করেন—

ঐশ্বর্যরহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই, ভেদ নেই মাঝে।

'ঈষৎ দয়া' কবিতায় কবি বলতে চান যে অন্যের প্রেমকে যদি চিবন্তন ভাবে অন্তরে পুঁজি করে কেউ জমিয়ে রাখতে চায়—তবে সে বঞ্চিত হতে বাধ্য। যেটুকু প্রীতি ও ভালবাসা পাওয়া যায়—তাই তো জীবনের অক্ষয় সম্পদ। কবি চান আরো বেশী—তাঁর প্রিয়ার কাছ থেকে তিনি যেটুকু পান—তাঁব মনে হয় তিনি বুঝি খুব কম পাচ্ছেন, ঈষৎ দয়াই বুঝি তিনি লাভ করছেন। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে এ জিনিস তো ঘটে থাকেই। নিষ্ঠুর শীত বাতাসের মতো কবি পুষ্পবৃক্ষেব কাছে অকালেই ফুল চান—কিন্তু তখন যে মুকুল ঝরার কাল। সেই ঝরা মুকুলের যে সৌরভ—তাই তো ঈষৎ দয়া।

'ক্ষণিক' কবিতায় ছোট্ট একটি তত্ত্বকথা রয়েছে। দান গ্রহণ করার মধ্যে যেমন সার্থকতা আছে, তেমনি মহত্ত্বও হয়তো আছে। কিন্তু যেটা বাড়তি সম্পদ, যেটা উপচে পড়ে যাচ্ছে, যেটি অপ্রয়োজনীয়—তা কুড়িয়ে নেওয়ার মধ্যে, জমিয়ে রাখার মধ্যে তো কোনো গৌরব নেই। যে জিনিস ভুলে যাবার—তাকে চিরকাল মনে রাখার কোনো মানে হয় না। বিধাতা আলোছায়ার বিচিত্র লীলায় সুখদুঃখের বিবিধ

সামগ্রী সাজিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কৃপণের মতো কিছু সঞ্চয় করেন না ; জীবনের স্রোতে চলতি মেঘের রঙ বুলিয়েই চলেছেন তিনি।

চলন্তরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
শিল্পেব মায়া,—নির্মম তার তুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি।
বিস্মৃতিপটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি।
হাসিকান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতাব অবহেলা।

স্বর্গের সুধা চিরদিনই ঝবে থাকে, ক্ষণিকের অঞ্জলিভরে তা গ্রহণ করে নিতে হয়।

'রূপকার' কবিতায রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে প্রাত্যহিক জীবনের লাভ-লোকসান নিয়ে যাবা মত্ত—তারা তো বিরাট সাধনার ধ্যানমূর্তি বা সত্যকার শিল্পচেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না। যে রূপকার রাত জেগে দিন জেগে নিজের সমস্ত জীবন ব্যয় করে সাধনার দ্বারা শিল্পমূর্তি গড়লেন, সাধারণ লোক—যারা প্রেমের মর্ম বোঝে না, সাধনার স্বরূপ জানে না—তারা তার মর্ম কি করে বুঝবে? রূপকারকে তাই নিজের জীবন উপহার দিয়ে নীরবে কোনো ফলের প্রত্যাশা না করেই চলে যেতে হবে। শিল্পীর পাঁজরভাঙা কঠিন বেদনার অংশ নেবে—এমন বোদ্ধা বা সংবেদনশীল রসিক জন কোথায় পাওয়া যাবে। যিনি বিশ্বস্রষ্টা—তিনি তাপস, তিনি অপরূপ শিল্পী—তিনিও এই বিশ্ব-জগতে একা ; সাধক শিল্পী রূপকারকেও সেই রকম একাই থাকতে হয়।

'মেঘমালা' কবিতায় কবি স্থির পর্বতের ওপরে চঞ্চল মেঘের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। আকাশেব মেঘ কঠিন পর্বতের ওপর গিয়ে জমেছে। ধ্যানমৌন তপস্বীর মতো পর্বত ছিল শান্ত সমাহিত, মেঘের লীলাচঞ্চল

গতিতে তার ধ্যান গেল ভেঙে। অচল পর্বত আর চঞ্চল মেঘের মিলনে এল অপূর্বতা। সুকঠিন শিলা সিক্তরসে মত্ত হয়ে উঠলো। মেঘমালা যেন গোপন দানে ভরিয়ে দেয় অচলের প্রাণ। সেই বর্ষণ যেন পর্বতের বাণী হয়ে জেগে ওঠে।

এ বর্ষণ তারি
পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে
নৃত্যবন্যাবেগে
বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করে
তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।

'প্রাণের ডাক' কবিতায় কবি নিজের অন্তরাত্মাকে ডাক দিয়েছেন—আকাশে বাতাসে—প্রকৃতির সর্বত্র যে জাগরণের আবেদন—তাতে সাড়া দিতে। প্রকৃতির জগতে প্রাণেব প্রকাশ সর্বত্র—কবির আন্তর-সত্তাও যেন সেই উজ্জীবনযজ্ঞে সামিল হয়, কেন তাঁর সত্তা ভাবনার বেড়ায় বাঁধা থাকবে, প্রাণের প্রকাশ থেকে অবলুপ্ত থাকবে? কবি তাই আহ্বান জানাচ্ছেন—

হয়তো বা কোনো কাজ নাই,
ওঠো তবু ওঠো;
বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথ-পানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহো।

রবীন্দ্রকাব্যে বৃক্ষ-চেতনাও একটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে, এবং এবিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার সুযোগও আছে। 'দেবদারু' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষচেতনাকেই প্রতিফলিত করেছে। সামান্য একটি বৃক্ষ কবির কাছে অসামান্যের খবর এনে দিয়েছে। দেবদারু বৃক্ষের অন্তর্লগ্ন স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে কবি বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ

পেয়েছেন। দেবদারু গাছই প্রথম মৌনের-বুকে প্রাণমন্ত্র এনে দিয়েছে —যে প্রাণ যুগযুগান্তর ধরে প্রস্তর শৃঙ্খলে মরুদুর্গতলে স্তব্ধ হয়েছিল।

'কবি' শীর্ষক কবিতাটি 'পরিশেষ' গ্রন্থের 'অপূর্ণ' কবিতার সহযোগী বলা চলে।—প্রকৃতির যা-কিছু প্রকাশ ও অভিব্যক্তি—তার মধ্যেই অকথিত কাব্যের সুরমূর্ছনা কবি শুনতে পেয়েছেন। মনে হয় প্রকৃতি বুঝি কবির প্রতি নির্দয়, কিন্তু ঋতুপতি আজো তাঁর প্রতি সদয়, মাসে মাসে প্রকৃতিকে বিচিত্র সাজে সাজায়; বসন্তে ফুল ফোটে, মনে হয় ফুলই বুঝি কবি-বসন্তের কবিতা। প্রকৃতি তার সামগ্রিক সৌন্দর্যেব অভিব্যক্তির দ্বারা কবিকে মুগ্ধ করে রাখে।

'ছন্দোমাধুবী' কবিতাটিতেও কবি বিশ্বস্রষ্টার এক শান্ত রূপেব প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। রূঢ়, ধূসর, কঠোর, কঠিন, বাস্তবজর্জর সংসাব-লোকেও কবি বিশ্বসত্তার স্পর্শ পান। জগৎ বোপে আজ লোভ ও স্বার্থপবতা দুর্বলকে চেপে মারছে, হিংসা হলাহল মাথা তুলে রয়েছে,— চতুর্দিকে হানাহানি, কাড়াকাড়ি, তবু এই লজ্জাহীন বেসুরো কোলা-হলেব মধ্যে সৌন্দর্যদূতী ছন্দহীন হাটে নূপুব বাজায়, কর্কশকে নৃত্যের দ্বারা পরাজিত করে ছন্দোময়ী মূর্তি জাগিয়ে তোলে, অমৃতের বাণী পূর্ণ করে ঘট ভরে আনে।

> ছন্দ ভাঙা হাটের মাঝে
> তরল তালে নূপুর বাজে,
> বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
> কর্কশেরে নৃত্য হানি
> ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
> ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।

'বিরোধ' কবিতার বক্তব্য খুবই সহজ। এই পৃথিবীতে ভালোমন্দ উভয় জিনিসই আছে—সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে তাই। তাই জীবন যেমন সত্য—মৃত্যুও ঠিক এই রকমই সত্য। মৃত্যুর মধ্যেই যথার্থ শ্রেয় বিরাজ

করে—কবি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন—তাই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর এই নূতন মূল্যায়ন। এ জীবনের যা-কিছু দুর্মূল্য, যা-কিছু অমর্ত্য, যা-কিছু অক্ষয়—তা যে মৃত্যু-মূল্যেই কিনতে হয়। কবি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে করছেন—কেননা, তিনি এই ভালো ও মন্দে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছেন।

'রাতের দান' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে দিনের শেষে জীবনের আলো নিভে আসে। জীবন-পথের শেষেই অন্ধকার। দিনের আলোয় ও পথচলার হট্টগোলে যে মৌনবাণী লুক্কায়িত থাকে—তা তো দিনে প্রকাশিত হতে পারে না,—রাত্রে সেই বাণী স্পষ্টতা লাভ করে। তাই কবি বলছেন যে মৃত্যুর অন্ধকার রাত্রি বন্ধ্যা নয়। দিনের হট্টগোলের মধ্যে যা ধরা পড়ে না বা পাওয়া যায় না, রাত্রির নিস্তব্ধতায় যেন তাই ব্যক্ত হয়।

'নব-পরিচয়' তত্ত্বমূলক কবিতা। নিজের জন্ম সম্পর্কে কবির মনে আজ এক নূতন প্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে। মানব-জীবন হচ্ছে অনন্ত যৌবনশক্তির প্রতীক, অনন্তের হোমানলে যে যজ্ঞশিখা জ্বলছে—মানব-জীবন সেই শিখারই আগুন থেকে জ্বালা যেন একটি দীপ। প্রকৃতিলোকে ব্যাপ্ত যে মহিমা, আশ্বিনের নবপ্রাতে শিউলিবনের আলোয় বা বৈশাখের ঝড়ে মানব-জীবনে সেই মহিমারও স্পর্শ লাগে। এমন কি এই সংসারের সব সীমা ছাড়িয়ে যে মহিমা বিরাজিত—যা অতীতে অনাগতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, মৃত্যুতে তাও যেন উপলব্ধ হয়! যে চির-মানব মৃত্যুকে পরাভূত করে চিরন্তন হয়ে বিরাজ করছেন, কবি সেই চির-পথিককেও নিজের মধ্যে উপলব্ধি করছেন।

মরণ করি অভিনব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

সংসারের ঝড়ঝাপ্টা, গ্লানি ম্লানিমা থেকে মানবাত্মা মুক্ত, নিরাসক্ত থাকে।

সংসারের ঢেউ খেলা

সহজে করি অবহেলা

রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—

সিক্ত নাহি করে তারে,

মুক্ত রাখে পাখাটারে,

ঊর্ধ্ব শিরে পড়িছে আলো এসে।

সে বুকের মধ্যে বিশ্ববীণার ধ্বনি শোনে, সকল লাভ-লোকসান তার কাছে তুচ্ছ ঠেকে।

'মরণ মাতা' কবিতায় কবি বলছেন যে মৃত্যু যেন মায়ের মতো, জীবন যেন সেই মায়ের কোলে দানের মতো। মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের সমাপ্তি, জীবনের শেষে মরণমায়ের কোলে আশ্রয় নেয় যে—সে তো আর পেছনে তাকায় না।

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,

তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।

তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি

নূতন যুগ তোল যে গড়ি—

নূতন ভালোমন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

কবিও এইভাবে চলে যাবেন, থেমে থাকবেন না। নূতন জন্মের সুযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে নিজের স্থান খালি করে দেবেন।

সহজে আমি মানিব অবসান,

ভাবী শিশুর জনম মাঝে নিজেরে দিব দান।

আজি রাতের যে-ফুলগুলি

জীবনে মম উঠিল দুলি

ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

'মাতা' কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত বেদনার একটি প্রচ্ছন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই কবিতাটি লেখার দু'দিন আগে কবি 'দুর্ভাগিনী' নামে আর একটি কবিতা লেখেন—সেটি কিছু পরে এই গ্রন্থে স্থান

পেয়েছে। সেটি আগে পড়ে নেওয়া যেতে পারে।

'পুনশ্চ' গ্রন্থের আলোচনায় আমি 'বিশ্বশোক' কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি—এখানে 'মাতা' এবং 'দুর্ভাগিনী' কবিতার আলোচনা প্রসংগেও সে কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। কবির ছোট মেয়ে হলেন মীরাদেবী, তিনি সাংসারিক জীবনে সুখী ছিলেন না ; কবি তাঁকে একটি মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন। এই মীরাদেবীর ছেলে হলেন নীতীন্দ্র ; নীতীন্দ্র জার্মাণীতে যান ছাপা সংক্রান্ত কাজকর্মে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্যে। সেখানে তিনি যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হন, খবর পেয়ে মীরা দেবীও সেখানে রুগ্ন পুত্রের কাছে যান।

এদিকে ৬ই আগস্ট ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সংবর্ধনা জানান ; এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন আগেই করা হয়েছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হওয়ার জন্য তা পেছিয়ে এই ৬. ৮. ৩২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন কবির কাছে খবর আসে জার্মানীতে তাঁর দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। এই খবর পেয়ে ঐ দিনই তিনি 'দুর্ভাগিনী' কবিতাটি লেখেন। নীতীন্দ্র মারা যান ৭ই আগস্ট ১৯৩২। ৮ই আগস্ট কবির কাছে তারে এই দুসংবাদ আসে। ঐ দিনই তিনি নারীহৃদয়ের বাৎসল্যের খবর জানিয়ে 'মাতা' কবিতাটি লেখেন।

'মাতা' কবিতাটি উপরি-উক্ত সত্যের আলোকে বিচার করতে হবে। কবি তাঁর কন্যার সান্ত্বনার জন্যেই মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-ব্যাকুলতার এই রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। মা সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন এবং ব্যাকুল থাকেন—কিন্তু এখানে কবি মা-কে সন্তানের জন্যে স্নেহ প্রকাশের ব্যাপারে মহিমান্বিত করে এঁকেছেন, সন্তান যেন বিশ্ব প্রাণস্রোতে ভাসমান বস্তু, প্রকৃতির নিয়মে আসে, ভাসে, সময়ে আবার অপসৃত হয়। বিশ্বের সম্পদ বলেই কোনো নির্দিষ্ট মায়ের স্নেহাঞ্চলে কোনো সন্তান চিরকাল বাঁধা থাকে না। বলা বাহুল্য, মীরা দেবীর প্রতি প্রচ্ছন্ন একটি

সান্ত্বনার বাণী লুকিয়ে আছে কবিতাটির মধ্যে।

কবিতায় মাতা-ই তাঁর অনুভব ব্যক্ত করছেন, কুয়াশাদীর্ণ প্রত্যূষের মতো আত্মপরিচয়হীন নারী অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো কি যেন কামনা নিয়ে ব্যগ্র ছিল; নবোদিত সূর্য যেমন কুয়াশাকে দূরে সরিয়ে দেয়, তেমনি নারীর মাতৃত্ব, সন্তান যখন কোলে আসে—তখন মনে 'পুষ্প কোরকের বক্ষে অগোচর ফলেব মতন' দেবতার আশ্বাস জাগে; তখন মা বলেন—

আশার অতীত যেন প্রত্যাশাব ছবি—
লভিলাম আপনার পূর্ণতারে
কাঙাল সংসারে।

কিন্তু সন্তান তো বিশ্বের, বিশ্বদেবতার, যে আনন্দ মায়ের মনে, তাঁর দেহেব শিরায় শিরায়—অচিবেই তা যে শুধু একান্তভাবে গৃহকোণের নয়, কিছু পরেই তো সন্তান চলে যায়। মায়ের হৃদয় যেন পান্থশালা, ক্ষণিক বিশ্রামের জায়গা।

আমাব হৃদয় আজি পান্থশালা,
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
হেথা কাবে ডেকে আনিলাম
অনাদিকালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।

শিশুর মুখের কলভাষাতেই মা বিশ্বের যাত্রীর গান শুনতে পান। আপন অন্তবের মধ্যে এসেও যে সে একান্ত আপনার হতে পারে না। বন্ধন ছিন্ন করতেই শুধু বন্ধনে ধরা দিয়েছে।

জননীব
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন—
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।

'কাঠবিড়ালি' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয়ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। সামান্য ঘটনার মধ্যে কবি অসামান্যের স্পর্শ পান—এ সত্য

তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন। রূপের পদ্মেই তিনি অরূপ-মধু পান করেছেন। সামান্য ছুটি কাঠবিড়ালির ছানা আঁচলতলায় ঢাকা দেখে তিনি অপরূপ মাধুর্যের সন্ধান পেলেন। একটি সন্ধ্যা তারকার স্নিগ্ধ আলো দেখে বা নদীর নির্জন ঘাটে জলাবর্তের কলধ্বনি শুনে কিংবা লেবুর ডালে ঈষৎ খুসির চমকে কুঁড়ি ফুটতে দেখে অথবা সুদূর আকাশে-ওড়া দৃশ্যতঃ হারানো পাখির সুর শুনে যেমন অপরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সামান্য এই কাঠ বিড়ালির ছানা ছুটি দেখে কবি সেই সুধামাখা মাধুর্যময় অপরূপকেই উপলব্ধি করতে পারলেন।

'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতাটিতে সাধারণ মানুষকে ধনবানেরা অর্থের বিনিময়ে কর্মে নিয়োগ করে—তার জন্যে কবির মনে যে প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে—তার প্রকাশ রয়েছে। একটি সাঁওতাল মেয়ে দেহ ও অন্তরের সৌন্দর্য-সুষমায় ভরপুর, লঘুপক্ষ পাখির মতোই চঞ্চল। পয়সা দিয়ে তাকে দিন-মজুরির কাজে লাগানো হয়েছে—কবির মাটির ঘর গড়তে গিয়ে, রোদে পিঠ পেতে ভিত গড়ে তোলে, দূর থেকে মাটি বয়ে আনে। যে মেয়ে ঘরের জন্যে নিজের দেহ এবং মনকে উজ্জ্বল করে তুলেছে, সেই ঘর-সংসারের সৌন্দর্য-স্বর্গ কিছুক্ষণের জন্যেও তো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে,—কেননা মজুরির সময় তো সেই মেয়ে ঘরে যেতে পারে না, সংসার তার সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

"প্রথম কবিতাটির ('সাঁওতাল মেয়ে') মধ্যে কবিচিত্তের নিগূঢ় সমাজতান্ত্রিক ভাব মূর্ত হইয়াছে, অকুলীন ধনিক-সমাজের বণিকবৃত্তি তাঁহাকে ক্লিষ্ট করে, কিন্তু আপনাকে মুক্ত করিবার পথ পান না বলিয়া তিনি অনুশোচনা বোধ করেন। কবির মন যে ক্রমেই সংস্কারবিদ্ধ সমাজ ও অর্থনৈতিক মতবাদ হইতে সরিয়া চলিয়াছে এইটি তাহার অন্যতম নিদর্শন।"[১০]

'মিলনযাত্রা' কবিতাটি কাহিনীমূলক। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের পরম দয়িতের সঙ্গে মিলি—এই রকম একটি ইঙ্গিত গোড়ার দিকে আছে, কিন্তু পরে কবিতাটির নাট্যীয় চমকই পাঠককে মুগ্ধ

করে।

বাড়ির গিন্নী আজ পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছেন, তিনি ছিলেন এ সংসারে জয়লক্ষ্মী বিশেষ। কর্তার মৃত্যুর পর তিনি একচ্ছত্র প্রভু ছিলেন। চন্দন ধূপপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা যথাযোগ্য সম্ভ্রমের সঙ্গে মৃতদেহ সাজানো হয়েছে; এমন কি তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁকে নববধূ-বেশে সজ্জিত করাও হয়েছে।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরনী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, "মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে-দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি।"

যে উজ্জ্বল সাজের নববধূবেশে ষাট বছর আগে এ সংসারে তিনি এসেছিলেন—আজ সেই বেশেই তিনি এখান থেকে চিরদিনের মতো চলে যাবেন।

গৃহকর্ত্রীর চিরপ্রস্থানের সময় আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ছে। এ বাড়ির ছেলে অনুকূল, সুপুরুষ যুবক, এম. এ. ক্লাসের ছাত্র পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছে, মা-বৌদিদের অত্যন্ত প্রিয়।

এই বাড়িতেই প্রমিতা নামে এক অনাথা কন্যা পালিত হচ্ছে। একদা গৃহকর্তা বন্ধুর ঘর থেকে মাতাপিতৃহীন এই মেয়েটিকে এনেছিলেন। ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুদাদা তার প্রতি কেমনধারা আসক্ত হয়ে পড়ে, মান অভিমানেরও পালা চলে। একদা বোঝা গেল অনুকূল প্রমিতাকে গোপনে পত্র লিখেছে—মার সম্মতি মিলবে না—জাতের অমিল বলে, আইনের সাহায্যে তাদের বিয়ে হবে।

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,

"এ মুহূর্তে প্রমিতারে

দূর করি দাও একেবারে।"

অনুকূল বলে—প্রমিতার কোনো দোষ নেই, তুমি কর্ত্রী, ন্যায় বিচার করো।

"এ ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,

তারি জোরে

হেথা ওর স্থান

তোমারি সমান।

বিনা অপরাধে

কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে।"

তবু প্রমিতাকে যেতে হবে। সে সব অলংকার খুলে রাখলে, মিলের মোটা শাড়ি পরে বের হলো। সদর দরজাতেই অনুকূল তার হাত ধরে বললে—এইবার প্রমিতার মিলনযাত্রার পথ মুক্ত হলো, আমরা দু'জন আর এখানে ফিরছি না।

কাহিনী-কাব্য হিসেবে এর মূল্য কম নয়, কিন্তু জয়লক্ষ্মীর চিরপ্রস্থান এবং প্রমিতা-অনুকূলের মিলনযাত্রার নিষ্ক্রমণের মধ্যে যাত্রাগত সাদৃশ্য-টুকুই লক্ষ্য করা চলে, রসের বিচারে দুটি দৃশ্যের তাৎপর্য ভিন্ন, এবং একই কবিতার আধেয় হিসাবে তীব্রভাবে উপভোগ্যও হয়তো নয়।

'অন্তরতম' গীতি-কবিতায় কবি তাঁর কাম্যবস্তুর কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কামনার ধন খুব সামান্যই। যে কামনার পেছনে তিনি চলেছেন তা বেশি কিছু নয়।

মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা—

তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,

পর্ণপুটে একটু শুধু জল,

উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।

কবির আকাঙ্ক্ষা যে কত তুচ্ছ, কত সামান্য—তা তিনি কয়েকটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। হাটের গোলমালের শেষে একটু সুর যেমন

দুর্লভ, কিংবা বৈশাখের তাপদগ্ধ শুকনো মাটিতে এক পসলা বৃষ্টির ক্ষণিক স্পর্শ যেমন করুণাকর, অথবা শ্বাসরোধকারী দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দেওয়া যেমন আকস্মিক—তেমনই সামান্য তাঁর চাওয়া। বাইরে যার ভার নেই, যাকে দেখাও যায় না, তেমনই অকিঞ্চিৎকরকে পাবার আকুলতা নিয়েই তাঁর আকাঙ্ক্ষার ভুবন ভরা। 'ক্ষণিকা' গ্রন্থে 'অন্তরতম' শীর্ষক কবিতাটির বক্তব্য কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, সেখানে মিলনের প্রথম লজ্জা ও আনন্দের প্রকাশ আছে।

'বনস্পতি' কবিতাটি বৃক্ষচেতনামূলক। বনস্পতির মধ্যে কবি চির-তারুণ্য লক্ষ্য করেছেন, প্রবীণ তরু প্রতিদিন কি নিবিড় নিগূঢ় তেজে জীবনের মহিমায় জরাকে ঝরিয়ে ফেলছে; গাছের ছায়াবীথি ধরে দিনাবসানের পর রাত্রির অন্ধকার নামে। ক্লান্ত মানুষও এই অন্ধকার বীথি পার হয়ে নিরুদ্দেশের দেশে শেষ যাত্রা করে। অথচ বৃক্ষ মাটিকে দান করে পুরানো পাতা, নতুন পত্র পল্লবে সজ্জিত করে নিজেকে, মনে হয় যেন তপোবন বালকের মতো বৃক্ষ সঞ্জীবন সামমন্ত্রগাথা আবৃত্তি করছে। নব কিশলয় সূর্য থেকে আলো আহরণ করে।

অমর অশোক
স্থষ্টির প্রথম বাণী;
বায়ু হতে লয় টানি
চির প্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত।

'ভীষণ' কবিতাটিও কবির বৃক্ষচেতনা সম্পর্কিত। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই বৃক্ষের জন্ম; আদি অরণ্য যুগে যে মাহাত্ম্যে বৃক্ষের প্রভাব ছিল—আজ সভ্য সংসারে সেই প্রভাব বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বাধীন অরণ্য-জীবনের এক উদ্দাম প্রকাশ নিয়েই বৃক্ষের আধিপত্য ছিল, আজ মানুষ নিজের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী বৃক্ষকে কঠোর শাসনে, প্রয়োজনের নিয়মে বেঁধে সংকুচিত করেছে। মানুষ তার আদিম অরণ্য ভয়কে জয় করেই বনস্পতিকে নিজের অনুশাসনে বশীভূত করে বিলাসের অনুগত

লীলাকাননের মাপে খর্ব করেছে। একদা সৃষ্টির প্রথম দিকে বৃক্ষ ভীষণরূপে প্রতিভাত হয়েছিল—যদিও সে ধরার কঙ্কাল শাখায় ঢেকে, ছায়া বুনে শ্যামলতা এনেছে—তবু মানুষের চোখে আদিম বৃক্ষের রূপ ছিল ভয়ঙ্কর। ক্রমে মানুষ অরণ্যলোকে ঢুকেছে, বৃক্ষের স্তবগান করেছে, তাকে সে আপন বলে ভাবতে পেরেছে।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু, আজিও সে-কথা মনে হয়।

...

হে ভীষণ বনস্পতি,
সেদিন যে-নতি
মন্ত্রপড়ি দিয়েছি তোমারে,
আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে একধারে।

'সন্ন্যাসী' কবিতায় তিনি হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপেরই বর্ণনা করেছেন। হিমালয় স্থির, নিশ্চল, ধ্যানগম্ভীর তপশ্চর শংকরের মতো—অথচ সেই হিমালয়ের বুকেই কত-না চাঞ্চল্য, কত-না নৃত্যচটুলতা। ধীর সন্ন্যাসীকে ঘিরে নদী ও অরণ্যে নিয়মবন্ধহারা যে আবর্ত ও আবর্তন—তা নীরবে পর্বতরাজ সহ্য করেন, তাদের এই চাঞ্চল্যের অর্ঘ্য সন্ন্যাসী নগাধিরাজের শান্তি নষ্ট করছে মনে হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে এই ধীর সন্ন্যাসীর পূজাই হচ্ছে এই রকমের অর্ঘ্যদান।

'হরিণী' কবিতায় কবি অরূপ সাধনার একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। বনের হরিণী দূর আকাশের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকে, সুদূর অগম্যকে সে কি জয় করতে চায়? তার টানা চোখে কি এরই স্বপ্ন জেগে ওঠে? নিকটের সংকীর্ণতা মুছে কোনো নতুন আলোয় কি ছুটে যায় হরিণী—কবি হরিণীকেই এই প্রশ্ন করছেন। কবি জানেন—

যারে তুমি জান নাই, রক্তে তুমি চিনিয়াছ যারে
সে যে ডাক দিয়ে গেছে যুগে যুগে যত হরিণীরে
বনে মাঠে গিরিতটে নদী তীরে,

জানায়েছ অপূর্ব বারতা
কত শত বসন্তের আত্মবিহ্বলতা।

অদৃশ্যকে খোঁজার জন্যে হরিণীর এই স্পর্ধোদ্ধত উৎসুক অনুসন্ধান লক্ষ্য করেই কবি জানতে চান হরিণী কি অশ্রুত বাণীর কোনো সাড়া পেয়েছে—তাই কি সে আকাশের ঘ্রাণ নেবার জন্যে কান খাড়া করে থাকে?

'গোধূলি' কবিতাটি শিল্পী নন্দলাল বসুর একটি ছবি দেখে লেখা। 'বিচিত্রিতা'র জন্যে কবি বিবিধ শিল্পীব আঁকা ছবি দেখে যে সব কবিতা লেখেন—সেগুলির মধ্যে দু'একটি কবিতা ঐ গ্রন্থে স্থান পায় নি; 'গোধূলি' এই রকম একটি কবিতা।

সারাদিনের সাংসারিক কর্মের পর গোধূলি লগ্নে নারী সহসা প্রকৃতির পটভূমিতে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। নীড়ে ফেবা কাকের শেষ ডাকের পর, দিগন্তে ধূসর রক্তবাগেব বিস্তার ঘটলে, দিনের শেষ আলোক-রশ্মি নদীর জলে মিলিয়ে যাবার সময়—চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন জড়াতে শুরু করে, তখন সব কাজ রেখে প্রাসাদ-ছাদের ধারে নীরব অন্ধকারে নারী যখন এসে দাঁড়ায়, সে তখন আর চেনা জগতের পরিচিত সত্তার অধিকারিণী থাকে না।

চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
সুদূব সন্ধ্যাতারা,
সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা।

তারপর আবার কর্মের সংসারে সে ফিবে আসে, ঘরের প্রদীপ আবার ঘরে জ্বালে।

'বাধা' কবিতায় কবি বলতে চান যে আত্মার সমস্ত কিছু নিবিড়ভাবে দান করতে না পারলে সেই দান কখনোই গ্রহণীয় হয় না। প্রিয়কে যখনই যা দিতে হয়—তখনই তা নিঃস্বার্থভাবে এবং নিঃশেষ করে

উজাড় করে দিতে হয়। স্বার্থপরতার চিন্তা সেই দানের বড় বাধা। নারী যখন প্রিয়ের কাছে প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়—তখন হৃদয়-দুয়ার খুলে শর্তহীনভাবে উপচার দান করতে হবে। শুধু বাণীর আকুলতায় প্রেমের তীব্রতা বোঝা যায় না।

'দুই সখী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রিয় ভাবকে ব্যক্ত করছে। দুটি মেয়ের বিচিত্র আলাপের মধ্যে কবি অসীমকালের অনুপম এক সৌন্দর্যের খনি আবিষ্কার করেছেন। আকাশের উন্মুক্ততা ও উন্মুখরতা ওই দুটি মেয়ের মনে ও বচনে। ওরা যেন দুটি অনন্তের আলোক-কণিকা কবির মনের পথে আকাশের বাণী রচনা করে গেল। যারা পরিচয় ও সান্নিধ্যের নিবিড়ডোরে ওই মেয়েদের বেঁধেছে, তারা তাদের ছোট করে ফেলেছে। কবি নিত্যের চিত্তপটে ক্ষণিকের চিত্র যেন প্রতিবিম্বিত দেখতে পেলেন—ওই দুটি মেয়ের মধ্যে। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে কবি তাদের দেখেন নি, অসীম অনন্ত সুদূরতার মায়াবলেপে কবি ওই দুই সখীকে দেখেছেন বলেই তাঁর চোখে এই বিস্ময়।

'পথিক' কবিতায় কবি বলছেন যে—নিজের অন্তরের তাগিদে যে সহজ ও সুন্দরভাবে নিজের সংসার সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পেতেছে—সে তো শূন্যতাপিয়সীর মতো বহির্জীবনের ডাকে পথে বেরিয়ে পড়তে পারবে না। পথিক চলার নেশায় পথ চলে, গৃহী ঘর বাঁধার আনন্দে ঘরে থাকে। গৃহী সুন্দরকে বন্ধনের মধ্যেই পেতে চায়, আর পথিক চায় শূন্যতায়। রবীন্দ্রনাথ পথিক-কবি, পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ। তিনি উদার আকাশে তাঁর মুক্তি দেখেছেন।

'অপ্রকাশ' কবিতায় কবি প্রকাশের পূর্ণতার প্রতি জোর দিচ্ছেন। নিজেকে যদি পূর্ণভাবে প্রকাশ করা না যায়—তবে কখনোই বিরাট বা সুন্দরকে উপলব্ধি করা যায় না। সঙ্কোচে, সংগোপনে নারী যখন নিজেকে অপ্রকাশিত রাখে, সে তখন খণ্ডিত হয়ে থাকে, বিশ্ব-জীবন-বিন্যাসে সে পুষ্পের মতো ফুটে উঠতে পারে না। বিরাট বনস্পতি প্রকাশিত বলেই সে ক্লান্ত পথিকের আশ্রয়স্থল, কিন্তু তৃণগুল্ম

অপ্রকাশিত, তাই তার নিচে কীটেরই বসবাস। সেই জন্যে কবি নারীকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে বলছেন—হে সুন্দরী,

মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ,—
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ
ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

'দুর্ভাগিনী' কবিতার প্রসঙ্গ কিছু আগে আলোচিত 'মাতা' কবিতাটির ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে। এই দুর্ভাগিনী নারী মনে হয় কবির ছোট মেয়ে মীরা দেবী। কবির একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ জার্মানীতে মৃত্যুশয্যায়, কবির কাছে খবর এসেছে, কবিও মীরাদেবীকে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেন। নীতীন্দ্রের মৃত্যুর আগের দিন তিনি এই 'দুর্ভাগিনী' কবিতাটি লেখেন। কি বলে তিনি কন্যাকে সান্ত্বনা দেবেন? এক পত্রে তিনি নিজের ব্যক্তিগত শোকের কথা লিখে মীরাদেবীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।[১১] এখন কবিতায় তিনি বললেন—

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে;
খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই,
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।
চিরচেনা ছিল চোখে চোখে,
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।

বেদনার মহেশ্বরীই যেন মীরাদেবীর জীবনকে দুষ্কর তপস্যামগ্ন করেছেন, বৈরাগ্যের ব্যবধান রচনা করে বিশ্ব থেকে সরিয়ে এনেছেন। আর কবিকন্যা স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে নির্বাক নির্বাসনে অশ্রুহীন

চোখে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন ?

এরপর 'গরবিনী' কবিতা। সাধারণ জীবনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বকে ভালবাসা এবং বহির্জগতে নিজেকে বিকীর্ণ করলেই পৃথিবীর আশীর্বাদ পাওয়া যায়। বাইরের আবহাওয়াকে অশুচি বলে জেনে, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চললে নিজের অন্তরকে পবিত্র করা যায় না; অপবিত্র ও অশুচি হয় মন, বাইরেটা যতই পরিষ্কার হোক না, অন্তর্জীবনের শুভ্রতা ফোটে না, ফলে নিখিলের আশীর্বাদ লাভ ঘটে না। নিজেই নিজের প্রহরী হয়ে নিজেকে বেঁধে রাখে।

অন্যপক্ষে যে সাধারণ, সকলের নির্বিচারে স্পর্শের ভয় নেই যার, সকল ভুবন জুড়ে যার স্বত্ব—সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, দেহে তার যত চিহ্ন লাগে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে সে চকিতে শুদ্ধ হয়ে যায়। সে তরুর মতন, নদীর মতন—একান্তভাবেই সাধারণ। গরবিনী নারী অবজ্ঞায় সমস্ত পৃথিবীকে অশুচি করেছে—তাই অন্তরে অমলিন থাকার শক্তি তার ঘুচে গেছে, সে নিখিলের আশীর্বাদহীনা হয়ে থাকে।

'প্রলয়' কবিতায় অন্ধকার কি সৃষ্টি করে আর মহাকাল প্রলয় রচনা ক'রে কি করে—তার কথাই বলা হয়েছে। অন্ধকার বিভ্রান্তি আনে, চেতনাকে আবিল করে, ভয়ের জন্ম দেয়। দূর আকাশ চোখে সুদূর ঠেকে বটে, কিন্তু মনের কাছে তা দূর নয়, অথচ অন্ধকার কাছের জিনিসের মধ্যেও ব্যবধান রচনা করে, ছায়ার সৃষ্টি করে জানাকে অজানা করে তোলে, সত্যপথ লুপ্ত করে ভ্রান্ত পথের নির্দেশ দেয়।

মহাকাল অগ্নিবন্যা বিস্তার করে প্রলয় আনে, চন্দ্রসূর্য লুপ্ত করে আবর্তে-ঘূর্ণিত জটাজালে, বজ্রের ঝঞ্ঝনায় তার রুদ্রবীণার ধ্বনি বাজে। বিশ্বে বেদনা হেনে সে বিশ্বকে শুচি করে, জীর্ণজগতের ভস্ম ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। অবশেষে তপস্বীর তপস্যাবহ্নির শিখা থেকে নব সৃষ্টি উঠে আসে নবীন আলোয়। ধ্বংসের মধ্যে নতুন সৃষ্টির উন্মেষ দেখা দেয়। অন্ধকারের মতো মুক্তির কবরে জগদ্দল শিলা চাপিয়ে দেয় না। বর্তমান শতাব্দীর কলুষিত নাগরিক জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির কথা স্মরণ

করেই 'কলুষিত' কবিতাটি কবি রচনা করেন, এবং শহরে ধূলিমলিন পরিবেশে প্রকৃতির আশীর্বাদ পাওয়া যায় না, বরং জীবন এখানে বিষাক্ত এবং যান্ত্রিক তথা অভিশপ্ত হয়। নগর-জীবন কলুষিত। শ্যামল প্রাণের উৎস থেকে যে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়—বিশ্বধরণী তাতে ধৌত হয় বটে, কিন্তু নগর নিজেকে সেই পুণ্যবারি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, মলিন অশুচি কঠিন পাষাণে নিজেকে আবৃত করে রেখেছে, প্রত্যূষ তার নির্মল আলোকচ্ছটা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে না, রাতের তারাও আবিল শহুরে আকাশে জাতিচ্যুত হয়ে পড়ে।

হেথা সুন্দরের কোলে
স্বর্গের বীণার সুর ভ্রষ্ট হল ব'লে
উদ্ধত হয়েছে ঊর্ধ্বে বীভৎসের কোলাহল,
কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল
গর্বভরে
শৃঙ্খলের পূজা করে।

এখানে মুখ নয়, মুখোশের মেলা, যান্ত্রিক সভ্যতার করুণ পীড়নে প্রকৃতির শান্ত শ্রী অপগত। এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা শতগুণে শ্রেয়। ছদ্মবেশ নেই, শক্তির সবল তেজের অনাবৃত প্রকাশ।

নির্মল তাহার রোষ,
তার নির্দয়তা
বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা।
প্রাণশক্তি তার মাঝে
অক্ষুণ্ণ বিরাজে।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।' কলুষিত নগরের নীচতার ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে অরণ্যজীবনের স্বাভাবিকতা বরং ভালো। তাই কবি জানাচ্ছেন—রুদ্র যেন এই নাগর জীবনের গ্লানি চূর্ণ করে দেয়। তাঁর মন প্রবল মৃত্যুর জন্যে কেঁদে উঠেছে।

১৩৩৯ সালের বর্ষশেষের দিন 'অভ্যুদয়' কবিতাটি লিখিত। কবির মনে হচ্ছে দিকে দিকে যেন কোন্ নবীনের অভ্যুদয় ঘটছে। যদিও ললাটে তার রাজটীকা আঁকা নেই, প্রকৃতিতেও অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন নেই, দিক্‌লক্ষ্মী জয়ধ্বনি দিচ্ছে না—তবু ভবিষ্যতের গর্ভে অলক্ষিত পথে তার অর্ঘ্যভার রচনা হচ্ছে। আকাশে সেই বিজয়ী নির্ভীক মহাপথিকের জন্যে ঘোষণা ধ্বনিত হচ্ছে।

'প্রতীক্ষা' একটি গান, বর্ষণমুখর শ্রাবণ রাত্রিতে নিঃসঙ্গ মনের বিধুরতা নিয়ে লেখা। কবির মনে নিঃসঙ্গতার যে বেদনা কবিকে বিহ্বল করেছে —এই গানে তা প্রকাশিত হয়েছে।

'নুটু' কবিতাটি নুটু ওরফে রমাদেবীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। ১৯৩১ সালে ৬ই মে মাত্র বছরচারেক আগে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে এই রমাদেবীর বিবাহ হয়। রমাদেবী আশৈশব শান্তিনিকেতনেই লালিত। ইনি দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখে বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী অকস্মাৎ রমাদেবীর মৃত্যু ঘটে, কবি মর্মাহত হন। তখন তিনি এই শোক-কবিতাটি লেখেন। বসন্ত এসেছে ফাল্গুনে, কিন্তু আশ্রমের দূত হিসাবে রমাদেবীকে যে প্রকৃতি চাইছে, কোথায় সে আজ? কাননলক্ষ্মীকে কে এখন অর্ঘ্যদান করবে? বসন্ত ফিরে এল, কিন্তু নুটু তো আর এল না। প্রকৃতি আজো তেমনি রয়েছে, যেমন বছর বছর থাকে, শুধু নুটু নেই।

> হায় হায়, এত প্রিয়, এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়
> একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়।
> হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে
> তার ব্যথা কিছুই না বাজে,
> সৃষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায়।

'বাদল সন্ধ্যা' গানটি 'বীথিকা' গ্রন্থের কবিতাগুলি রচনাকালে লিখিত বলেই এখানে স্থান পেয়েছে; রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে রচনার স্থান

কালানুক্রমিক অনুশাসনে নির্ণীত হয়েছে। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় ভুলে এসে পড়া দয়িতেরও সংবর্ধনার ত্রুটি হবে না—এই রকমের একটি বক্তব্য রয়েছে।

'জয়ী' কবিতায় কবি মানব-বাণীর জয়-ঘোষণা করেছেন। চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা, ধ্বংসের লোল জিহ্বা। কবি উপলব্ধি করছেন যে এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে মানবের চিরন্তন বাণী কোনো বাধা না মেনে জয় ঘোষণা করছে। মহাশূন্যতা কিংবা মহানৈঃশব্দ্যের মধ্যে মানুষের বাণী হারিয়ে না গিয়ে বেজে ওঠে—সমস্ত বাধা বা প্রতিকূলতাকে পরাভূত করে মানবের সেই বাণী জয়ী হয়।

'বাদলরাত্রি' একটি গান। বিদায়লগ্নে কবির মনে যে বিষণ্ণতা—তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বোধহয় গানটিতে আছে। অনেক দূরের মিতাকে ডেকে কবি তাঁর মনের বেদনাখানি নিবেদন করেছেন।

'পত্র' লঘুরসের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে নিতান্ত লঘু তারল্যের সঙ্গে নিজের লেখা সম্পর্কে পরিহাস করেছেন। তাঁর শেষ জীবনে নিজের লেখাকে সমালোচনার কাঠগড়ায় হাজির করতে চান না। তাঁর উদাসীন চিত্তরূপের মধ্যে অরূপের বিত্ত দেখতে পেয়েছেন, তাই তিনি কিছু সঞ্চয় করতে চান না, যশও না। যে রবি অস্তগামী, তাকে আর সমালোচকের হস্তে কেন দেওয়া ?

'অভ্যাগত' একটি গান। কবি নিজের অতিক্রান্ত জীবনপথের দিকে তাকিয়ে দেখছেন ; জীবনের এই পথের শেষপ্রান্তে এসেছেন বলে কবির মনে বিষণ্ণতার সুর বাজছে।

'মাটিতে আলোতে' 'বীথিকা'র এক বিশিষ্ট রোমান্টিক কবিতা। খণ্ড জীবনের মধ্যে কবি যে অখণ্ড চেতনার স্পর্শ পেয়েছেন—সেই কথাই এখানে আর একবার ব্যক্ত হয়েছে। মাটিতে যে আলোর লীলা, জীবনের বিকাশ—তার মধ্যেই যে অনন্ত আশ্রয় নিয়েছেন। শরতের আলোয়, সবুজ শ্যামলিমায় এই মর্ত্যে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটে। মাটির বাঁশিতেই এই অনিত্যের প্রাঙ্গণের মধ্যে চিরন্তন নিজের

খেলাঘর বাঁধে।

বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে—

তখন কবি লক্ষ্য করেন যে প্রিয়জনের চাহনির মাধুর্যে চিরসুন্দর ধরা পড়ে, আকাশের স্বর্ণলেখায় স্বর্গের আশীর্বাদ রূপায়িত হয়, কচি ধান খেতের সৌন্দর্যে, গাছের নবীন পল্লবে অপরূপ এসে ধরা দেয়। বস্তুর মধ্যেই বস্তুর অতীত ভাবমূর্তি জেগে ওঠে। তাই অন্তর্গূঢ় প্রেমের দৃষ্টিতে কবি যে রূপ দেখেন—তাতেই রূপাতীতের সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পারেন।

আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে ;
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্য পবিত্র ধুলায়।

'মুক্তি' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মন যখন সংকীর্ণ পরিপার্শ্ব থেকে উঠে প্রাকৃতিক চেতনায় ন্যস্ত হয়, তখনই

সত্যকার মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। কবির ব্যক্তিক প্রেম প্রত্যাখ্যাত হবার পর তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

দূর হতে দূরে গেনু সরে
প্রত্যাখ্যানলাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

কবি তখন প্রকৃতিকে নির্মল আলোয় মোহমুক্ত চোখে দেখলেন।

কামনার যে-পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন
নিষ্ঠুর আঘাতে তার
ভেঙে গেছে দ্বার,—
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে।

সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে কবির মন আজ মুক্ত, খাঁচার পাখি আজ যেন আকাশে ছাড়া পেয়েছে।

'দুঃখী' কবিতায় কবি বলছেন যে যে নিঃসঙ্গ, সেই যে এ জগতে সব চেয়ে বড় দুঃখী তা নয়। যে দুজন পাশাপাশি আছে, অথচ একা— তাদের চেয়ে দুঃখী এ জগতে আর কেউ নয়।

দুইজনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি ;
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

যে একা, তার চিত্তে প্রকৃতি স্বপ্নস্বর্গ রচনা করতে পারে, কিন্তু যারা কাছাকাছি আছে—তাদের মধ্যে যদি অন্তহীন বিচ্ছেদ থাকে—

তবে তারাই যথার্থ দুঃখী।

দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

'মূল্য' কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লেখা। কবি জীবনে যা পেয়েছেন—যত তুচ্ছ মূল্যই তার তার হোক না কেন—তবু তার ঋণ অপরিশোধ্য। অযাচিত দান মাত্রেই দুর্লভ, কিন্তু যা স্বাভাবিকভাবে আসে—তাকে দান হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়।

'ঋতু-অবসান' কবিতাতে কবির জীবন-গোধূলির কথাই ব্যক্ত হয়েছে রূপকের আড়ালে। কবি আজ জীবনের উপান্তে এসেছেন, তাঁর সুদীর্ঘ অতীত জীবনে কত লোকের আসা-য়াওয়া, কত সুখস্মৃতি, কত-বা বেদনার কাহিনী। বসন্ত আসে নবপত্রপুষ্পে পৃথিবী সুন্দর হয়, সজ্জিত হয়, মধুঋতুর অবসানে ফের রিক্তরূপ প্রকৃতিকে বিষণ্ণ করে তোলে। কবির জীবনের ঐশ্বর্য একদিন উজ্জ্বল ছিল—আজ তারা নিষ্প্রভ; কবি এখন তাঁর জীবনের দিনগুলিকে স্মরণ করছেন—তারা যেন কোন্ বিরাটের উদ্দেশে অঞ্জলি, রাত্রির আকাশ যেমন বিরাটের পায়ে তারকার অঞ্জলি দেয়, কবিও আজ নিজের জীবনকে, নিভৃত অন্তরকে সার্থক করার জন্যে কোন্ দেবতার উদ্দেশে নিবেদিতপ্রাণ হতে চাইছেন।

'নমস্কার' কবিতায় কবি সৃষ্টির মধ্যে দুই বিপরীত ধর্মকেই লক্ষ্য করেছেন, এবং ঈশ্বরই স্রষ্টারূপে যেমন গড়ছেন, তেমনই অজ্ঞাত প্রয়োজনে আবার ভাঙছেনও। তাঁর ভাঙাগড়ার এই লীলার অর্থ বোঝা দুরূহ। একদিকে যেমন ঝরনাকে সাগরে পৌঁছতে দিয়েছেন গতি, তেমনি শিলাকে বলেছেন—ঝরনার গতি রোধ করতে। ঈশ্বরের মনের খবর পাওয়া যায় না। তাঁর অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে কালো তো কালো থাকে না, সে অঙ্গার রূপে ছদ্মবেশী আলো হয়ে ওঠে। দুঃখ লজ্জা ভয় যেমন রয়েছে—আবার বীর্য, সম্মান মাহাত্ম্যও সেখান থেকে জন্মলাভ করছে। নিষ্ঠুর পীড়নে অন্ধকার যখন ফোটে, তখনই তাতে

জলে অমৃত জ্যোতি। ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমাকেই কবি নমস্কার জানিয়েছেন।

'আশ্বিনে' কবিতায় দেখি কবি শরতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, সবুজে সোনায় ভূলোকে দ্যুলোকে মিলে গেছে, তাঁর চোখে অপরূপ মায়া বিস্তার করেছে, ঘাসে ঝরে পড়া শিউলি ফুলের সৌরভে মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে। কবির মনেও ব্যাকুলতা জাগছে—তাঁর হারানো বন্ধুকে খোঁজার জন্যে মন চঞ্চল হচ্ছে।

দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,
　　　বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া ;
খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথি,
　　　বকুল গন্ধে দিয়েছিল বুঝি সাড়া।
আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিতসম
　　　নেমে আসে বাণী করুণ-কিরণ-ঢালা ;
চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
　　　এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।

কবির ব্যক্তি-প্রেমের আলোকে এই কবিতাকে আমরা ব্যাখ্যা না করি, তবে কবি যে শরতে বিকীর্ণ সৌন্দর্যরাশির মধ্যে অরূপের স্পর্শ-লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন—সে দিক থেকে কবিতাটির রস গ্রহণ করতে হবে।

'নিঃস্ব' কবিতায় কবি নিজের কবিসত্তাকে নিঃশেষ বলে বর্ণনা করতে চান। পুষ্পতরুর উপমানে তা ব্যক্ত করেছেন। যখন শেষ-বসন্তেরও উৎসব শেষ হয়ে যায়, তখন নূতনতর উৎসবের আশায় যারা আসে,—তারা তো তখন প্রকৃতির নিঃস্ব রিক্ত রূপকেই দেখে যায়। একদিন প্রকৃতির অজস্র থাকে, তাই সে দান ক'রে নিঃস্ব হয় ; কিন্তু এই দানের পর উৎসব-প্রিয় কারুর জন্যে তো তার দেবার কিছু থাকে না। তখন সে ঐশ্বর্যময় দানের স্মৃতিটুকু মনে রেখে দেবার অনুরোধ জানায়।

এই কবিতাটির মধ্যে কবি নিজের কবিসত্তাকে নিঃস্ব ও রিক্ত ভেবে

কল্পনা করেছেন। এটি রচনার পেছনে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এবং প্রকাশন বিভাগের কর্মী শ্রীসুধীরচন্দ্র করের প্রচণ্ড তাগাদা ছিল। 'রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা'র মুখপত্র হিসেবে এঁরা দুজন একটি হাতে লেখা পত্রিকা "রবীন্দ্র-পরিচয়-পত্রিকা" পরিচালনা করতেন, সেই পত্রিকার জন্যে কবির কাছে লেখা চাওয়া হয়, কবি এই 'নিঃস্ব' কবিতাটি লিখে দেন। আজ কবির দান করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে, কিন্তু একদা তাঁর অজস্র অপরিমেয় দানের কথা যেন স্মরণ করা হয়। 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা বহুদিনের প্রতিষ্ঠান।'[১২]

'দেবতা' কবিতাটি কবির এক নূতন উপলব্ধির ফসল, মর্ত্যলোকে যেখানে প্রেম এবং সৌন্দর্যের আবির্ভাব, সেখানেই দেবতার আবাহন ঘটে। দেবতা মানুষের অনিত্যলীলার মধ্যে মানবলোকে ধরা দিতে চায়, যেখানে সৌন্দর্য এবং যেখানে ব্যক্তিচেতনার অবসান—সেখানেই অনন্ত বিশ্বপ্রাণের পরিচয় স্পষ্ট হয়, কবিও অনুভব করেন যে তাঁর নিজের প্রাণ বিশ্বপ্রাণলীলার রঙ্গভূমিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায়।

পুরুষ যখন নারীর যথার্থ প্রেমলাভ করে—তখনও মর্ত্যে স্বর্গের আনন্দ জাগে।—

মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

নারীর প্রেমে যে অনির্বচনীয়তা উপলব্ধ হয়—তাতেই অমৃতের আস্বাদ জাগে।

তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে ;
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়।

'শেষ' কবিতায় কবি আসন্ন মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যুর স্পর্শ পাচ্ছেন তিনি। এই সংসার, এই জীবন, এর প্রীতি প্রেম, সুখদুঃখ সব কিছুই কবির কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। অতীতের সকল বেদনা, ক্লান্তি, গ্লানি, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, প্রীতি, সুখস্মৃতি—সব কিছুকে শিথিল করে কবির দেহ কবির কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে। এই অবলুপ্তির মধ্যেই কবি দেখতে পাচ্ছেন—সামনে নবজীবনের আলোকরেখা, জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎ যেন তাঁর জীবনচেতনাকে নূতন আলোক দান করছে। কবির ভবিষ্যৎ জীবন যেন বিশ্বসত্তায় লীন হতে চলেছে। এই জগৎ, এই জীবনের সমস্ত বন্ধনকে তিনি উপেক্ষা করেছেন, এই বন্ধনে তিনি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। সৃষ্টির আদিম তারকার মতো তাঁর চেতনা বিশ্ব-সত্তার প্রবাহে মিশে যাচ্ছে।

'জাগরণ' কবিতাটি এই গ্রন্থের এক বিশিষ্ট কবিতা। কবি এখানে এই মর্ত্যলোকের জীবনকে বিচার করেন নি। বরং যখন তিনি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নূতন জগতে যাবেন, পুনর্বার জেগে উঠবেন অন্য এক ভবে, তখন সেখানকার জীবনকে, অর্থাৎ পরজন্মের জীবনকে—কি চোখে দেখবেন—তার ইঙ্গিত আছে। আর তখন পরজন্মে গিয়ে বর্তমানের এই ফেলে-যাওয়া জীবনকে স্বপ্ন বা সত্য—কি মনে হবে, তার কথাও এই কবিতায় আছে। নূতন জগতে জন্মান্তরের জাগরণ কি পৃথিবীর এই জীবনকে সত্য ভাববে না মিথ্যে ভাববে? কবি এই প্রশ্ন করেছেন।

পত্রপুট

'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখেছি কবি আপন সত্তার অগম রহস্য-সন্ধানে ব্যস্ত হয়েছেন, বিশ্বপ্রাণধারার সঙ্গে মানবের অন্তর্লীন সত্তার সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। 'পত্রপুটে'ও তাঁর এই মনন ও কল্পনার রেশ সম্পূর্ণ বজায় আছে। তার ওপরে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার বিশ্লেষণ করেছেন। মানব-জীবন এবং বিশ্বসংসারের তাবৎ বস্তু যে ক্ষণস্থায়ী—সেকথা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে অনিত্য মানব-জীবনে কবি বিশ্বাত্মার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে 'শেষ সপ্তকে'র সুরের একাংশ 'পত্রপুটে'ও উচ্চারিত হয়েছে। 'পত্রপুটে'ও কবি আপন সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, এখানেও কবির জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছে—মানুষের আন্তর সত্তার যথার্থ স্বরূপ কি। এই সত্তার পরিচয়লাভের জন্যেও কবির ব্যগ্রতা দেখা গেছে। আত্মচিন্তায় তন্ময় হয়ে কবি ভাবিত হয়েছেন মানবলোকের সুখদুঃখের উপলব্ধিতে বিশ্বাত্মার কি ভূমিকা, ব্যক্তিপ্রাণের সঙ্গে বিশ্ব-প্রাণের যোগ কোথায় এবং কতটুকু—কবি এই গ্রন্থে সে রহস্যেরও অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। অসীমের রূপ কোন্ দুর্লভ মুহূর্তে আমাদের কাছে ধরা পড়ে—কবি সে খবরও আমাদের জানিয়েছেন এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই।

প্রকৃতিপ্রীতিও এই গ্রন্থের আর এক বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের তিন নম্বর কবিতায় ('পৃথিবী' নামে যেটি প্রকাশিত হয়েছিল) আমরা দেখবো যে কবি এই মাটির পৃথিবীকে কত গভীরভাবে ভালবেসেছেন, এবং ঋতুতে ঋতুতে যে ধরণীর বিচিত্র সাজ কবিকে কেমনভাবে মুগ্ধ করেছে —সেই উপলব্ধির প্রকাশ আছে এখানে। বিদায়ের আগে পৃথিবীকে

প্রণতি জানাচ্ছেন তিনি, পৃথিবী যে ললিতে কঠোরে বিপরীতমুখী, মানবলোকের বিবিধ ইতিহাসের সাক্ষী—এই পৃথিবীর প্রতি কবির মমতা ও বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে। ন' নম্বর কবিতায়ও প্রকৃতির বর্ণনা আছে, ঝড়ের বর্ণনাকে কাব্যিক সুষমায় সিক্ত করেছেন তিনি। আট নম্বর কবিতায় দেখি নামহারা এক ফুল প্রকৃতির রাজ্যে শুধু অন্ত্যজ হয়ে অনাদরই কুড়িয়ে যায় না, সৃষ্টিলোকে তারও একটা মর্যাদার জায়গা আছে। এগারো নম্বব কবিতায়ও প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয় রয়েছে, সেখানে তিনি প্রকৃতিকে আপন সহচরী রূপে কল্পনা করেছেন।

শেষপর্বের কাব্যে সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার প্রকাশ ঘটেছে; 'পত্রপুটে' কবি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কথা ভেবেছেন; এমনকি প্রকৃতি-লোকে বিশ্বস্রষ্টার নয়ন-বিমোহন রূপ দেখেও মৃত্যু-ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। কবির মনের অদম্য শক্তি যেন কমে আসছে, ভেতরে ভেতরে তিনি নিরুৎসাহ বোধ করছেন, ছুটির অবসাদেও তিনি জীবনীশক্তির হ্রাস লক্ষ্য করছেন—

সাঙ্গ হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা। (২নং কবিতা)

'পৃথিবী' শীর্ষক তিন নম্বরের কবিতাতেও কবি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাইছেন আর বিদায়কালে পৃথিবী যেন তাঁর কপালে মাটির ফোঁটার একটি তিলক এঁকে দেয়—এই বাসনা প্রকাশ করেছেন,—সেই চিহ্ন অবশ্য যাবে মিলিয়ে।

সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।
(৩নং কবিতা)

মানবপ্রীতির কথাও 'পত্রপুটে' আছে, অবহেলিত মানুষকে বুকের

সোহাগ দিয়ে আপন করে নিতে হবে—তবেই মানবতার কল্যাণ।
আত্মস্বরূপের বিশ্লেষণও 'পত্রপুটে'র কয়েকটি কবিতার উপজীব্য বিষয়। আত্মার স্বরূপ কি—মুক্ত আত্মারই বা কি পরিচয়—সে কথার উপলব্ধি আছে দশ নম্বর কবিতায়। দেহমন এবং বহির্জীবন থেকে মুক্ত যে আত্মা—সেই আত্মস্বরূপকে কবি সূর্যস্নানে সিক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। সৃষ্টি সম্পর্কেও কবির চিন্তার পরিচয় আছে। সাত নম্বর কবিতায় বিশ্বসৃষ্টি-স্রোতের কথা রয়েছে—সৃষ্টিরহস্যের মূল সূত্রেরও কবি অনুসন্ধান করেছেন।

এছাড়া কবির স্মৃতির রোমন্থন রয়েছে, কখনো তিনি বাল্যের কথা ভেবেছেন, কখনো যৌবনের। নিজের জীবনে মহৎ কিছু করা হয় নি, পাহাড়তলির নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতোই তাঁর বদ্ধ জীবন,—কখনো বিরহ-বেদনায় তিনি কাতর হয়েছেন, কখনো তিনি মনের মানুষকে পাবার আকুলতা প্রকাশ করেছেন—(যেমন পাঁচ নম্বর কবিতা)। এই বিবিধ অনুভূতি নিয়েই 'পত্রপুট' গ্রন্থ। সেকথা তিনি তেরো নম্বর কবিতাতেই বলেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে এই তেরো নম্বর কবিতার বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের নামকরণেরই আলোচনা। কবি হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি এবং উপলব্ধির বাঙ্ময় রূপায়ণগুলিই এখানে পত্র বা পল্লব। এই বিবিধ অনুভবই কবির মনোবৃক্ষের পটপুট, 'আমি-বনস্পতি'-র কিরণ-পিপাসু পল্লব-স্তবক, এরাই 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট'। বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির সমষ্টিতে যে কবিসত্তার উদ্বোধন এবং উজ্জীবন—সেই উপলব্ধিরাজিই 'আমি-তরু'র পত্রপুট। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে জীবন-সন্ধ্যায় খেয়া ঘাটের শেষ ধাপে এসে বসেছেন, বিবিধ বোধও কবির মনে উপস্থিত হচ্ছে, বিচিত্র চেতনাই আজ কবির সম্বল, সেই চৈতন্য ভরসা করেই কবি জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইছেন, বহুদিনের পরিচিত এই পৃথিবী, বিচিত্র মেজাজের বিবিধ মানুষ, রূপরসগন্ধেভরা প্রকৃতি—সব কিছুই আজ কবিকে বিচলিত করেছে, কবি তাঁর মনোবৃক্ষের এই

ভাবনারূপী পত্র ও পল্লবগুলির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'পত্রপুটে'র মূল সুরের আলোচনা প্রসঙ্গে কবির যেসব ভাব ও ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ভাব ও ভাবনারাজিই হলো কবির সত্তা-তরুর পত্রপুট.। আঠারোটি পত্রের প্রকাশেই কবি-সত্তার বৃক্ষচেতনা বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। তাই এই গ্রন্থের নামকরণটিও খুব সুন্দর হয়েছে।

সহজ পরিস্ফুটতা কিন্তু 'পত্রপুটে'র একটি বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের সব কবিতাগুলি যেমন গাম্ভীর্যে, ভাবনার ঐশ্বর্যে মননশীল দ্যুতিতে উজ্জ্বল, তেমন স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে অর্থগ্রহণের দিক থেকে খুবই সরল ও সহজ-বোধ্য। কবিতাগুলির ভাব এবং অর্থভঙ্গী বা অলঙ্করণের সৌন্দর্যে হারিয়ে যায় না। লিরিক কবিতায় যেমন লঘু তারুণ্যের ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তা থাকে, তেমন ইঙ্গিত আছে, কিন্তু অস্পষ্টতা বা দুরূহ ইশারা নেই।

আর একটি কথা। 'পত্রপুটে'র কবিতাগুলিতে লিরিকধর্মের তারল্য একেবারেই অনুপস্থিত, বরং প্রবন্ধরসের গাঢ়তাই বেশী করে উপলব্ধ হয়। কবির মননশীল প্রভার দ্যুতি প্রায় প্রতি কবিতাতেই বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই কবিতাগুলিকে কবির ভাবনালোকের মন্ত্রশুদ্ধ সূর্যপূজক ঋষির উক্তির মতোই দীপ্তিময় এবং শ্রদ্ধার্হ মনে হয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও 'পত্রপুটে'র কবিতা-প্রসঙ্গে বলেছেন—"এই কবিতাগুলি যেন বিরাট গম্ভীর চিন্তারণ্যের মহাটবীগুলির প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মর্মরধ্বনি। ...'পত্রপুটে' জীবন ও সৃষ্টির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে মনন-কল্পনার ধ্যান এত গভীরে প্রসারিত, এবং তাহা প্রকাশের ধ্বনি এত গম্ভীর ও বিস্তৃত, গতি এত সবল ও বেগবান, বর্ণ এত গাঢ় ও বিচিত্র এবং ভাষা সমাসে-অনুপ্রাসে এত সংস্কৃত ও অভিজাত যে, সকলে মিলিয়া 'পত্রপুটে'র গদ্যকবিতাগুলিকে এক অভিনব কাব্যরূপ দান করিয়াছে। ইহারা যেন গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংহত সংযত কাব্যরূপ।"[১]

গোড়ার দিকের দু'একটি কবিতায় অতিকথন দোষ আছে; বিশেষ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কবিতা দুটিতে অতিবিস্তার লক্ষণীয়। দৈর্ঘ্যের

জন্যেই মনে হয় কবিতাগুলিতে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে, কবির আবেগ কখনও উচ্ছ্বসিত হয়েছে, ফলে ভাষাকে আতিশয্যের চড়া সুরে উচ্চ-কণ্ঠ হতে হয়েছে। পাঠ্যতাগুণ ক্ষুণ্ণ না হলেও রসনিস্পত্তির ক্ষেত্রে এদের ইঙ্গিতময়তা অনেকখানি হারিয়ে গেছে।

কবির ছোট মেয়ে মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতার অসবর্ণ বিবাহ হয় কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে এবং এই বিয়ে সিউড়ীতে রেজিস্ট্রী করা হয়। যদিও কবির মত নিয়ে এই বিয়ে হয় নি, তবু তিনি এই বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন এবং নবদম্পতিকে 'পত্রপুট' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সুন্দর একটি আশীর্বাদী কবিতা লিখে।

'পত্রপুটে'র কবিতাগুলির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের সুযোগ খুব বেশী নেই, কারণ আগেই বলেছি, এই গ্রন্থে কবি তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা আরোপ করেন নি। ভাষায় সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের অভাব নেই বটে, কিন্তু কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই, বরং সর্বত্র সহজ পরিস্ফুটতাই কবিতা-গুলিকে মধুর করে তুলেছে।

প্রথম কবিতাতে প্রকৃতির রূপমুগ্ধতার বিস্ময়ে কবিচিত্ত কিভাবে অভিভূত হয়েছে—তেমনই একটা সুন্দর মুহূর্তের বর্ণনা। নগাধিরাজ হিমালয়ের সৌন্দর্য কবি বহুসময় বহুভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গান—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর'—তিনি রামগড়ে উষাকালে হিমালয়ের উন্মুক্ত পার্বত্য প্রান্তরে পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে সুন্দরকে দেখেই সুরে বসিয়ে রচনা করেন; এই সহজ সুন্দরকে সব সময় দেখা যায় না, চর্মচক্ষুতে এই সুন্দর ধরা পড়ে না, একে দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে, ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে।

ধ্যানের দৃষ্টিতেই সুন্দরকে তার নিজের দ্যুতিতে দেখে নিতে হয়, বাইরের প্রভায় সুন্দরকে দেখার চেষ্টা হাস্যকর, সুন্দরকে তখন ধরা যায় না। নগাধিরাজ হিমালয়ের রূপ দর্শনের জন্যে বাইরের কোনো আয়োজনের দরকার নেই। সে অনির্বচনীয় রূপ নিজেই ধরা দিতে জানে। তবে নির্দিষ্ট মুহূর্তে সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য অভিব্যক্ত হয়;

জীবনে নানা দুঃখ সুখের ভিড়ের মধ্যে কখনো সখনো ছোট্ট সৌভাগ্য-মূলক এমন টুক্‌রো মুহূর্ত কবির কাছে এসেছে—সময়ের এই টুকরোকে তাঁর মনে হয়েছে গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে যেন আচমকা কুড়িয়ে-পাওয়া একটা হীরে।

এক নম্বর কবিতায় কবি সেই আশ্চর্য মুহূর্তের উপলব্ধিটুকুরই বর্ণনা দিয়েছেন। কবি ছিলেন দার্জিলিঙে। সঙ্গীদের উৎসাহ হলো সিঞ্চল পাহাড়ে রাত কাটাবে। সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার ওপর ভরসা রাখতে না পেরে অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ হিসেবে এসরাজ, ভোজ্যের পেটিকা, হো-হো করে হেসে মাৎ করবার উৎসাহী যুবক—সবই ওপরের সিঞ্চল পাহাড়ে গেল, শৈলশৃংগবাসের শূন্যতা দূর করার জন্যে।

অবশেষে দিনাবসানে চড়াই-পথ পেরিয়ে যখন শৃঙ্গদেশে পৌছানো গেল—তখন সূর্য নেমেছে অস্ত দিগন্তে।

পশ্চিমেব দিগ্‌বলয়ে
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ তুচ্ছ আর অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলো। একদিকে সূর্য অস্তপথগামী, অন্যদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় 'বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।' নগাধিরাজ হিমালয়ের বুকে প্রদোষ-কালের এ এক দুর্লভতম সময়ের একটা টুকরো—এই মুহূর্তে সুন্দর সহসা আবির্ভূত হলো।

গুণী প্রতিদিন বীণায় আলাপ করে।
এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হল
যা আর কোনোদিন হয় নি।
সেদিন বেজে উঠল যে রাগিণী

সেদিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হল
অসীম নীরবে।
গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।

হিমালয়ের ওই অনির্বচনীয় রূপ সৌন্দর্যের মধ্যেই বুঝি সেই অপূর্ব সুর বেজে উঠলো—কবি উপলব্ধি করলেন মুহূর্তের সেই অতুল ঐশ্বর্য। এটি ১৩৪২ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসীতে 'বিস্ময়' নামে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় কবিতাটির নাম ছিল 'ছুটি'; ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রেব ১৩৪২ সালের পৌষ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। প্রথমে এই কবিতার বক্তব্য পত্রাকারে লেখা হয় কালিদাস নাগকে, পরে তা গদ্যকবিতায় রূপান্তরিত হয়।

শান্তিনিকেতনে পূজাব ছুটি শুরু হয়েছে; ধান কেটে-নেওয়া খেতের মতো কবির ছুটিও চারদিকে ধুধু করছে। আশ্বিনে সবাই বাড়ি গেছে, কবি তাঁর ছুটিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন দিগন্তপ্রসারী বিবহের জন-হীনতায়, কল্পনার রঙ মাখিয়ে দেন তিনি তাঁর ছুটিতে। অতিবিস্তৃত করে কাব্যিক অলঙ্কাবে সাজিয়ে তিনি ছুটিকে উপমিত করেন, তাঁর ছুটি যেন পদ্মার ওপর শেষ শরতের প্রশান্তি, বাইরে তরঙ্গ থেমে গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রয়েছে গতিবেগ। অল্প বয়সের ছুটির কথাও কবির মনে পড়ছে, কাজের বেড়া ডিঙিয়ে লুকিয়ে আসতো ছুটি, আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন বিরহবোধও হতো।

সেই বিরহগীত গুঞ্জরিত পথের মাঝখান দিয়ে
কখনো বা চমকে চলে গেছে
শ্যামলবরণ মাধুরী
চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত বাণী বিক্ষেপ করে,
বসন্তবনের হরিণী যেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ছুটে যায়
দিগন্তপারের নিরুদ্দেশে।

এমনি করেই কবি উপলব্ধি করছেন—ছুটির অর্থই হলো অকারণ বিরহের

নির্জনতায় মোহনকে লুকিয়ে দেখার অবকাশ। কিন্তু বাস্তবজগতে কাজের লোকে ভাবে ছুটি মানেই হাওয়া-বদলে যাবার অবকাশ : টাইমটেবিল, গাঁঠরিবাঁধা, স্টেশন, ট্রেন, পয়সা খরচ। কবি কিন্তু দেখতে পান—

উনপঞ্চাশ পবনের লাগাম যাঁর হাতে
তিনি আকাশে আকাশে উঠেছেন হেসে
ওদের ব্যাপার দেখে।

কবি এই হাসি দেখতে পান, তাই নীরবে আকাশের নিচে বসে দেখেন শরৎ এল, বর্ষা আকাশ থেকে তার কালো ফরাশটা গুটিয়ে নিলে। হাওয়া-বদলের দায় কবির নয় ; প্রকৃতির রূপ-বদলে তাঁর মনে লাগলো হাওয়া! প্রজাপতির দল ফুলভরা টগরের ডালে এসে বসলো, জুঁই-বেল ফুলের কাছে সংকেত এল নেপথ্যে সরে যাবার, শিউলি এল ব্যস্ত হয়ে। বর্ষার জলে ধোওয়া অথচ নতুন যে উত্তরীয় চাঁদ এখন পরছে—সেখানা গায়ে দিয়ে জ্যোৎস্না জেঁকে বসলো কাশের বনে।

আজ নি-খরচায় হাওয়া-বদল জলে স্থলে, খরিদ্দার তাকে এড়িয়ে দোকানে বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, বিধাতার দামী দানের কদর বোঝে না। সামান্য কয়েকজনের মধ্যেই এই দুর্লভ সামগ্রীকে চেনার ক্ষমতা থাকে, কবি তাঁদেরই একজন, তিনি আকাশে মেঘের খেলা দেখে তৃপ্ত হতে জানেন।

কিন্তু কবিতাটির উপসংহারে কবি এই পৃথিবী থেকে ছুটি নেবার ইঙ্গিতও দিয়েছেন, বাস্তব জীবন থেকেও ছুটি নেবার সময় হয়েছে তাঁর।

আমার মন বেরোল নির্জনে-আসন-পাতা
শান্ত অভিসারে
যা-কিছু আছে সমস্ত পেরিয়ে যাবার যাত্রায়।

বাস্তব সংসারের মানুষ ছুটির শেষে অসমাপ্ত কাজের খেই ধরবে ফের, কিন্তু কবির ফুরোবে ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ, তাঁকে ফিরতে হবে এইখান থেকে এইখানেই, মাঝখানে শুধু পার হবে অসীম সমুদ্র।

কবিতাটিতে প্রকৃতিপ্রীতি রয়েছে যেমন, তেমনি অতিকথনও আছে। তবে কারুকার্যখচিত চিত্রধর্মিতা থাকায় কোথাও আড়ষ্টতা নেই; কবির মনে যে মৃত্যুচেতনা রয়েছে, উপসংহারে সে কথাও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি কবির যে কি নিগূঢ় ভালবাসা—তা তিন নম্বর কবিতায় ধরা পড়েছে। এই কবিতায় পৃথিবীর প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগেরই প্রকাশ ঘটেছে। অগাধ কল্পনা এবং ভাবগম্ভীর বর্ণনায় পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করেছেন কবি, ঋতুতে ঋতুতে ধরণীর যে বৈচিত্র্য, নিত্যনবীন মূর্তি ও মহিমার প্রকাশ—কবি তাকে বন্দনা করছেন।

পরিণত বয়সে তিনি পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তাকে প্রণতি জানাচ্ছেন—তার বিবর্তনের এবং রূপবৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, তিনি বৈপরীত্যের মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখেছেন। মহাবীর্যবতী, বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরা, ললিতে কঠোরে বিপরীত, তার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে মিশ্রিত, যেমন বস্তুময় ও স্থূল, তেমনই চৈতন্যস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম। অচল অবরোধে কোথাও আবদ্ধ, আবার কখনো মেঘলোকে উধাও মুক্ত। একদিকে স্নিগ্ধ-শান্ত, অন্য দিকে রূঢ়-ভয়ংকর। একদিকে অন্নপূর্ণা সুন্দরী, অন্যদিকে আবার অন্নরিক্তা ভীষণা। একদিকে আপক্ক ধান্যভারনম্র শস্যক্ষেত্র, রৌদ্র কিরণে উজ্জ্বল, অন্যদিকে শুষ্ক রুক্ষ মরুভূমি। একদিকে শ্যাম-শস্যের হিল্লোল, অন্যদিকে মরীচিকার প্রেতনৃত্য। বৈশাখে কালো শ্যেন পাখির মতো ঝড়, আবার ফাল্গুনে আতপ্ত দক্ষিণ হাওয়া। পৃথিবী যেমন স্নিগ্ধ, তেমনই হিংস্র; যতটা পুরাতনী, ঠিক ততখানিই নিত্য-নবীনা।

মানবজীবনের মহিমা প্রকাশের ব্যাপারে পৃথিবীর অশেষ দানের কথা কবির মনে পড়ছে, দুঃখকে জয় করার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা পৃথিবীই দান করেছে মানুষকে, দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ না করে দুঃখকে জয়

করার ব্রতই ধরিত্রী শিখিয়ে এসেছে মানুষকে ; মৃত্যু-বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তাই পৃথিবীর মুখে ঘোষিত হচ্ছে। কবি বলছেন—

দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মালা হয় সার্থক।

কবি ইতিহাস-চেতনার দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, আদিম যুগে অবিন্যস্ত পৃথিবীতে দানবদেরই ছিল প্রাধান্য, তারপর দেবতা এসে দানবদলনের মন্ত্র পড়লেন, ঘুচলো জড়ের ঔদ্ধত্য, শুরু হলো কৃষি যুগ।

জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখর চূড়ায়।

পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তি ঘট। তবু চিরকালের শান্তি আসে না পৃথিবীতে, মাঝে মাঝে অশান্তির প্রমত্ত দানব বিশৃঙ্খলতা আনে, পাগলামি শুরু করে, বসুন্ধরার বক্ষের পাতাল থেকে আধ পোষা নাগদানব ফণা তুলে রুখে ওঠে, বিঘ্নিত হয় শান্তি। তবু শুভ অনুপস্থিত নয় পৃথিবীর বুকে ; শুভে অশুভেই স্থাপিত তার পাদপীঠ।

কবি পৃথিবীকে তার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণাম জানাচ্ছেন, পৃথিবীর যে মাটির তলায় বিরাট প্রাণের তথা মৃত্যুর গুপ্ত সঞ্চার,— আজ তাকে স্পর্শ করে ধন্য হয়েছেন, সেই ধূলিতলে কবির আপন সত্তাখানিও অবলীন হবে।

আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত দুঃখ সুখের শেষ পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল
পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।

এই ধরণীর চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়ানো আছে শত শত ভাঙা ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় অবশেষ। পৃথিবী জীবশালিনী, সে তার খণ্ড-কালের ছোট ছোট পিঞ্জরে আমাদের পুষেছে—তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান।

কবি আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবার বেলায় বলে যেতে চাইছেন যে শাশ্বত কালের পটভূমিতে যদি কোনো খণ্ড মুহূর্তের একটি আসনে উপবিষ্ট হবার সত্য মূল্য দিয়ে থাকেন—তবে পৃথিবী যেন তার মাটির ফোঁটার একটি তিলক এঁকে দেন কবির কপালে; কবি তাই বিস্মৃতি লাভ করে আগেই পৃথিবীর নির্মল পদপ্রান্তে তাঁর প্রণতি রেখে যেতে চাইছেন।

কয়েক স্থানে অতিভাষণের দৈর্ঘ্য কবিতাটির রসোপলব্ধির পক্ষে গৌরবের হয় নি, যেমন—'তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে 'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী' প্রভৃতি কিছু পঙ্‌ক্তির বিন্যাসধর্ম কাব্যের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার পক্ষে কারুকার্যখচিত হতে পারে, কিন্তু রসের জোগানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মনে হবে। এছাড়া কবিতাটির আর কোনো দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জাতীয় বর্ণনা কবিতাটিকে ক্ল্যাসিকাল মর্যাদায় ভূষিত করেছে; এবং তৎসম শব্দপ্রধান সাদৃশ্যমূল অলংকার-সৃজনের ক্ষেত্রে উপমানকে বিস্তৃততর সজ্জা ও মহিমা দান করার জন্যে মহোপমা ব্যবহারের দুর্লভ গৌরব থেকেও কবিতাটি বঞ্চিত হয় নি। কবিতাটির ক্ল্যাসিকাল মর্যাদা কিন্তু মূলতঃ এই উপভোগ্য বর্ণনার জন্যেই।

এ যুগের এক অতি বিখ্যাত কবিতার একটি হলো এই পৃথিবী কবিতাটি। মানুষের মহিমা সম্পর্কে কবির পরিণত মানসের কি ধারণা—তারও ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে। 'কবিতাটির বিশেষ বক্রতা লক্ষণীয়। বিশেষণ প্রয়োগের মধ্যেই এর চিত্র-সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। আবার এর মধ্যে দিয়ে কবির বন্ধনহীন আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিচয়ও ব্যক্ত হয়েছে।'[২]

এই কবিতাটিতে কবির উচ্চকোটির মনন রয়েছে, এবং এখানে কবি তাঁর কল্পনাকে উচ্চগ্রামে নিয়ে গেছেন ও তাঁর উপলব্ধিকে এক দুর্লভ মহিমা দান করেছেন। এই কবিতাটির গদ্যভঙ্গীর প্রশংসা করে এ জাতীয় কবিতায় শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কবির গদ্যচ্ছন্দের অনিবার্যতা স্বীকাব কবেছেন। এ জাতীয় কবিতায় 'কল্পনাব বিশ্বব্যাপী প্রসার, ভাবানুভূতির সুগভীর মহিমা এমন একটা উচ্চস্তর স্পর্শ করিয়াছে, এমন একটা গভীর ঐক্য ও দৃঢ় সংহতি লাভ করিয়াছে যে, মনে হয় ইহাদের মানসিক ও বাহ্যিক গড়ন একান্তভাবেই এই রীতিরই অপেক্ষা রাখে। গদ্যের দৃঢ় কাঠিন্য, উত্থান পতনের অনিয়মিত ধ্বনি-তরঙ্গ, শব্দ ও পদেব সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অর্থের ইঙ্গিত ছাড়া এমন কাব্য-রূপ কিছুতেই সম্ভব হইত না।'[৩]
কিন্তু ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ভিন্নমত পোষণ করতেন; 'শেষ সপ্তকে'র শিল্পরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মতের কথা আমি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছি। তবে একথা ঠিক, মিল বন্ধে ছন্দ চটুলতায় 'পত্রপুটে'র ৩নং, ১২নং, ১৫নং কবিতার গাম্ভীর্য হয়তো ক্ষুণ্ণ হতে পারতো, তাই কবি প্রকরণ সম্পর্কে সচেতন হয়েই এই শিল্পপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; যদিও দু একটি ক্ষেত্রে অতিকথন দোষ ঘটেছে,— তবু কবির আবেগ, কল্পনা, মনন-ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি কোথাও নষ্ট হয় নি।
'মানসী-সোনার তরী' যুগে বসুন্ধরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রীতির পরিচয় পাই, কিন্তু কবির মন তখন রোমান্টিক আর্তি ও আকুলতায় পূর্ণ, পৃথিবীকে ভালবাসা তখন রোমান্টিক অনুরাগের গাঢ়তায় বর্ণাঢ্য কিন্তু 'পত্রপুটে'র 'পৃথিবী' কবিতাটিতে কবির অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীবনানুভূতির গভীরতাই বাণীমূর্তি লাভ করেছে।
বিদায়ের আগে পৃথিবীকে বিদায় জানাচ্ছেন—তবু বিরহব্যাকুল বেদনার প্রকাশ নেই—যা আমরা 'বসুন্ধরা' কবিতায় এর আগে দেখেছি। "বসুন্ধরাকে এখানে কবি একটি পৃথক সত্তারূপেই দেখছেন না, কর্ত্রী শক্তিরূপে অনুভব করছেন এবং দুঃখজয়ী মানুষের মহিমার জনয়িত্রী

ব'লে অভিনন্দিত করছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মানুষের মূল্যেই কবি পৃথিবীর মূল্য পরীক্ষা করেছেন। কবিতাটির মধ্যে ক্রমোৎকর্ষের পথে যাত্রী মানুষের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেহেতু দুঃখকে বরণ, মৃত্যুকে অস্বীকার তথা প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধির মুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের সার্থক জীবনযাপনের সুযোগ এই ভয়ংকরী ও সুন্দরী, রুদ্রাণী ও কল্যাণী পৃথিবী থেকেই সম্ভব হয়েছে, সেইহেতু কবি সৃষ্টি-পালন-সংহারের সমস্ত দায়িত্ব পৃথিবীর উপরেই অর্পণ করেছেন এবং তাকেই প্রণাম জানিয়েছেন। সুতরাং এই কবিতাটিও তাঁর সুদৃঢ় মানবানুরাগ ও মানবমূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত বলা যেতে পারে।"[৪]

কবিতাটি 'পৃথিবী' নামে ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

চার নম্বর কবিতাতেও (কালের যাত্রা) কবির প্রকৃতিপ্রীতির নিবিড় পরিচয় রয়েছে; বর্ষব্যাপী বিবিধ ঋতুতে প্রকৃতির রূপ বদলে কবির মানসলোকে যে সব অনুভূতি জেগেছে—সেই ভাবরাজিও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ষার ঢল নামলে ক্ষেতে শুরু হয় ফসলের জীবনী রচনা, মাঠে মাঠে কচি ধানের চিকন অঙ্কুরে। জলভারে অভিভূত নীল মেঘের নিবিড় ছায়া নামে বাঁশ বনের মর্মরিত ডালে। বর্ষার সর্ব-ব্যাপকতায় চারিদিকে একটা পূর্ণতার জোয়ার নামে, দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে উদার প্রাচুর্যের ছবি—মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোতে পারে। মাস যায়। শ্রাবণের স্নেহ নামে।

সবুজ মঞ্জরি এগিয়ে চলে দিনে দিনে
শিষগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে
অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।

মাস যায়। শরতের প্রশান্তি নামলো আকাশে। মাস যায়; নির্মল শীতের হাওয়া এসে পৌঁছল হিমাচল থেকে, হেমন্তের হলুদ ইশারা

আঁকা পড়লো সবুজের গায়ে। মাস যায়, ধানকাটা শেষ হলো, সোনার ফসল চলে গেল অন্ধকারের অবরোধে।

মাস গেল। মাঠের পথ দিয়ে রাখাল গরু নিয়ে চলে যায়। অশথ গাছ একলা দাঁড়িয়ে থাকে প্রান্তরে সূর্য-মন্ত্র-জপ করা ঋষির মতো। তারই তলায় গ্রাম্য সুরে ছেলে একটা বাঁশি বাজায়, সেই সুরে তামাটে তপ্ত আকাশে বাতাস হুহু করে ওঠে—

সে যে বিদায়ের নিত্য ভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
একদিনেরও জন্যে।

কবিতাটির শেষে বিদায়জনিত একটি বেদনার সুরধ্বনিত হয়েছে, কবি প্রকৃতির শ্যামশোভা ও সুন্দর সমারোহের কথা বলে বিদায়ের উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে সৃষ্টির মধ্যেও চলে যাওয়ার কারুণ্য আছে। কবিতাটিতে ঋতুবদলের সংকেত-উপস্থাপনার উপায় হিসাবে 'মাস যায়' পদ দুটিকে কবি বার বার ব্যবহার করেছেন দৃশ্যান্তর বোঝাবার পর্দা হিসেবে; শেষে বললেন—'মাস গেল।' এর দ্বারা শুধু প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যেরই রূপান্তর বর্ণিত হয়নি—ঋতু বদলের সঙ্গে কালের চঞ্চল গতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের একটা মূল সুরই হচ্ছে প্রকৃতিপ্রীতি—কিন্তু পরিণত বয়সের এই প্রকৃতিরম্যতার মধ্যে নিছক ভাললাগা ও ভালবাসার কথাই নেই—যা তিনি এতাবৎকাল একান্ত-ভাবে বলে এসেছেন। এখন তিনি গতিশীল পটভূমিকে অনিবার্য সংলগ্নতা দান করলেন; চলিষ্ণু প্রকৃতিকে সৌন্দর্যের সঙ্গে তালরেখে যে কালেরও এগিয়ে চলার উদ্যোগ রয়েছে, এই পর্যায়ে কবি যেন সে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

পাঁচ নম্বর কবিতাটির নাম 'হাটে', এবং ১৩৪২ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে এটি মুদ্রিত হয়। এই কবিতাটি কবির স্বপ্নরঙিন রোমান্টিক

মনের ফসল। এখানে বাস্তবকে দেখেও কবি বাস্তবাতীতের ব্যঞ্জনার আরোপ ঘটিয়েছেন। আমরা জীবনে না-পাওয়ার বেদনা বহন করে চলেছি—কি স্বপ্নময় কল্পনায়, কি বাস্তব জীবনে—বিরহাতুর এক আর্তিকে আশ্রয় করেই মন টিঁকে আছে। স্বপ্নে, কল্পনায় কবির মনে জেগেছে তাঁর মনের নিভৃতে থাকা তাঁর মানসী।

অসমানি রঙের শাড়ি পরে সন্ধ্যার মায়াবিষ্ট স্তব্ধ মুহূর্তে খোলা ছাদে সেই নারী একা গান করছে—যে চলে গেছে—তাকে আর ডাকা যাবে না, এই বেদনারই প্রকাশ গানে। জীবনে তো সব কিছু পাওয়া যায় না, অপ্রাপণীয়েব জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস বহন করতেই হয়, সেও তাই তার সুরের ভুবনে এই দুরূহ দুরাশার বেদনাকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে। এই সুর কবির কাছে অমৃতময়ের অশ্রুত বাণীর ভুবনের স্পর্শ এনেছে। সংগীতময় ধরার ধূলি যে মধুময়,—এই ঋষিব উপলব্ধ বেদবাণীকে কবি অনুভব করতে পারছেন; গানের সুর যদি আমাদের বাস্তব সংসারের উর্ধ্বে তুলতে পারে, গানের খেয়া বেয়ে যদি তুচ্ছতার উর্ধ্বে তুরীয় সাগরে পাড়ি জমাতে পারি,—তবেই আমরা বুঝতে পারবো—পৃথিবীর ধূলিও মধুময়, পৃথিবীর ধূলিও গানের সুরে মধুময় হয়ে ওঠে। মৃত্যুও তখন আর বেদনাবহ অবসান থাকে না, মধুমানতা লাভ করে। কবি বলেন—

আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায়।

সুরের তন্ময় মোহ বা অমৃতময়ের ক্ষণিক স্পর্শ রূপকে বাস্তবাতীত অপরূপ করে তোলে, কবির মন রোমান্টিক অনুভূতিতে আতুর হয়ে ওঠে, সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা ঘুচে যায়, অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ধরা পড়ে, কবি তখন দেখেন—

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,

আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।

কিন্তু এই রোমান্টিক স্বপ্নের বস্তু যে অপ্রাপণীয়—তার সাধনা করা চলে, প্রতীক্ষা করা চলে, তাকে কাছে পেতে গেলে ছিন্ন হয় স্বপ্নসূত্র; কাছে গেলে সে বলে ওঠে—"এ কী অন্যায়, কেন এলে লুকিয়ে।" মধুময়ের ওপর নেমে আসে ধূলার আবরণ।

এই রোমান্টিক অনুভবের পরিপূরক হিসেবে এই কবিতার দ্বিতীয়াংশের একটি বাস্তব চিত্রাঙ্কন—সেখানে কবি একটি হাটের ছবি এঁকেছেন। খোলা জানলা দিয়ে হাটের এক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে—রোদের আলো পড়ে মাঠে, বাটে—

মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক-সবজির ঝুড়ি-চুপড়িতে,
আটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।

কাল আসব বলে যে চলে গেছে—সেই কালের দিকে তাকিয়ে থাকার বেদনাকে প্রকাশ করে পথের ধারে এক অন্ধ বৈরাগী গান ধরেছে—কবির মনে হলো—

কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে
ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠছে
যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—'তাকিয়ে আছি।'

এক জোড়া মোষ গাড়ি টেনে চলে উদাস চোখ মেলে, তাদের গলায় ঘণ্টা বাজছে, চাকার পাকে পাকে উঠছে কাতরধ্বনি।

আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া।
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।

বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার মন বললে—

মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

কেরোসিনের দোকানের সামনে একজন একেলে বাউল তালি দেওয়া আলখাল্লা পরে কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া নিয়ে গান ধরেছে—অধরার সন্ধানে হাট করতে এসেছে সে।

রোমান্টিক কল্পনার সুন্দর দৃশ্যের মতোই বাস্তব সংসারের চিত্রেও কবির সমান উপভোগ্যতা,—বাস্তব দৃশ্যেও কবির মন মুগ্ধ হয়েছে, পার্থিব রজ যে মধুমৎ—বেদমন্ত্রের এ কথা ঘোষণা করতেও তাঁর দ্বিধা নেই।

প্রকৃতি-বর্ণনা বা বাস্তব জগতের হাটের দৃশ্য রচনাই এই কবিতার মূল কথা নয়। আমাদের জীবনে অপ্রাপণীয়কে না পাবার যে বেদনা, যা সুন্দরতম অমৃতময় তাঁর সুব, স্পর্শ কখনো কখনো কবির মনকে আপ্লুত করে—অকাশে বাতাসে সুন্দরেব দুর্লভ দেখা মেলে, বাস্তবের সংসারেও তার অলক্ষ্য আবির্ভাবও মুহূর্তকালের জন্যে উজ্জ্বল হয়—কিন্তু চিরন্তন করে তাকে ধরে রাখা যায় না।

এই কবিতায় তিনটি গানের দুটি করে পঙ্‌ক্তির উল্লেখ আছে। কবির রোমান্টিক অনুভূতিতে যে নারীর উপস্থিতি তাঁর মনোলোকে জেগেছে—তার গান, তার হাটের দুটি বাউলের গান—এই তিনটি গানেই একটি সংবেদনেব কথাই ভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে, যে চলে গেছে, যে হারিয়ে গেছে, আর যে অধরা—তারই পুনর্দর্শনের জন্যে, তাকে পুনরায় পাবাব জন্যে—অপ্রাপণীয়ের জন্যে বিষাদ করুণ সংবেদন নিয়ে জীবনব্যাপী অপেক্ষা করার সাধনার কথাই বলা হয়েছে।

বিচিত্রায় (মাঘ, ১৩৪২) 'পথের মানুষ' নামে ছ' নম্বরের কবিতাটি প্রকাশিত হয়। শেষ পর্বে কবির মন সাধারণ মানুষের জন্যে প্রীতি ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং এ যুগের সকল গ্রন্থেই মানবপ্রীতির সেই স্বাক্ষর আছে; অবহেলিত সাধারণ মানুষের প্রতি মমতার পরিচয়ই এই কবিতার মূল কথা। বঞ্চিত অবহেলিতকে প্রীতি ও

প্রেমের সোহাগে কাছে টেনে নিলে মানবতার কল্যাণই হয়, বঞ্চিত মানুষের তাতে দুঃখের অবসান ঘটে, তার ভয় ভাঙে, মানুষকে ডেকে বুকে তুলে নেওয়ার বাণীই শুনিয়েছেন কবি—

অতিথিবৎসল,
ডেকে নাও পথের পথিককে
তোমার আপন ঘরে,
দাও ওর ভয় ভাঙিয়ে।
দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক মিলিয়ে,
থেমে যাক ওর বুকের কাঁপন।

অসম্মানে এবং অবমাননায় যাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, সে সাহস পায় নি ভেতরে যেতে, আজ তাকে তার আপন বিশ্ব দেখিয়ে দেবার ডাক দিয়েছেন কবি। বাইরে বাইরে পান্থশালার ভাড়াকরা আবাসেই যার জীবন কাটলো, 'একবার ঘরের অভয় স্বাদ পেতে দাও তাকে'—কবির এই আহ্বান। অতিথিবৎসল মানুষেরই মতো তারও ঔদার্য, কিন্তু নিজেকে চেনার সময় পায় নি সে, 'ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়; পর্দা খুলে দেখিয়ে দিতে হবে যে সে আলো, সে আনন্দ।

হে অতিথি বৎসল
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে।

মানবপ্রীতিই এই কবিতার মূল সুর সন্দেহ নেই, তার এই পর্বে 'ঐকতান', 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতায় সাধারণ মানুষের কথায় কবি আরো বেশী স্পষ্ট এবং আরো বেশী উচ্চকণ্ঠ। আবার তামাম মানুষের প্রতি কবির যে প্রীতি—তার আলোকেও এটির বিচার চলে, তবে 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' ('প্রবাসী' কবিতা) কবিতার তুলনায় এই কবিতাটি অপেক্ষাকৃত

হীনপ্রভ মনে হবে।

সাত নম্বরের কবিতাটি 'সার্থক আলস্য' নামে ১৩৪২ সালেব মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে ছাপা আছে। কবিব জীবনে যে সব অলস মুহূর্ত আছে, ছোট ছোট এমন বহু খণ্ডিত সময়—যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে বৃথা ও ব্যর্থ বয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টি স্রোতেব মধ্যে সে সব খণ্ড মুহূর্তেব গডানে ঢেউগুলি একেবারে নিবর্থক নয়, সে সব মধুময় অমৃতভবা মুহূর্তেব দবকাব আছে। সেই মুহূর্তে কবিব দৃষ্টিও সার্থক হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টিব প্রাঙ্গণে দাঁডিয়ে সৃষ্টিব পূর্ণতায় তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হেমন্তেব তরুণ আলোয় কবি-প্রাণ ঝলমলিযে উঠেছে, আকাশে পাৎলা সাদা মেঘেব টুকবো স্থিব হয়ে ভাসছে—ঠিক যেন দেবশিশুদেব কাগজেব নৌকো। হাওয়ায় গাছেব ডালে দোলা লাগে, ফিকে নীল আকাশে গোরুব গাডি বিছিয়ে দেয গেরুয়া ধুলো, কবিব মনও অকাজে ভাবনাহীন দিনেব ভেলায় ভেসে চলে।

সংসাবেব ঘাটেব থেকে বশি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।
রঙেব নদী পেবিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তবঙ্গ ঘুমেব কালো সমুদ্রে।

সৃষ্টি-সমুদ্রে এই দিনটা একটা ছোট্ট ঢেউ-এব মতো, অচিবেই যাবে সে মিলিয়ে। কালেব পাতায় ফিকে কালিতে লেখা বইলো এই শূন্য দিনটাব চিহ্ন। গাছের শুকনো পাতাটি পর্যন্ত মাটিতে ঝরেও মাটিব দেনা শোধ কবে যায়; কবিব আক্ষেপ হচ্ছে যে তাঁব এই অলস দিনেব ঝবা পাতা লোকাবণ্যকে কিছুই ফিবিয়ে দেয় নি।

কিন্তু তাই কি? গ্রহণ কবাও যে ফিবিয়ে-দেওয়ার রূপান্তব। সৃষ্টির ঝর্ণা বেয়ে যে রস নামছে আকাশে আকাশে, কবি তো তাকে মেনে নিয়েছেন, সেই বঙিন ধাবায় রাঙিয়েছেন তাঁর জীবনের নিগূঢ় অনুভবগুলিকে। সৃষ্টির ঝর্ণাধারা বেয়ে যে রঙ নেমেছে—কবির মনে

এই অলস এবং অবসরের মুহূর্তেও সেই রঙীন ধারার ছোপ লেগেছে, কবির মনও তাৎক্ষণিক রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কবিও সৃষ্টিলোকের আসরে নামার প্রেরণা লাভ করেছেন।

এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,
এই নিয়ে ঋতুর দরবারে গেঁথে চলেছে একটি মালা—
আমার চিরজীবনের খুশির মালা।

অকাজের দিনে অলস মুহূর্তেও ঐ মালায় গাঁথা পড়েছে একটা বীজ। এ পর্যন্ত এক সুর, এরপর পালাবদলের রাগিণী। সমাহিত সাধকের মতোই কবি পার্থিব সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন। এক দুর্লভ অবসরের মুহূর্তে বিশ্বসৃষ্টির সহজ সৌন্দর্যসূত্রটি কবির কাছে উন্মোচিত হলো, সহজ সুন্দর প্রকৃতির আঙিনা ধরে কবির কাছে আবির্ভূত হলো। রাস্তায় চলা ব্যস্ত পৃথিবী আকাশ-আঙিনায় আঁচল মেনে দিয়েছে, লক্ষ্য নেই কাছের সংসারে, তারার আলোর পুরাণ কথা শুনতে বসেছে। তারপর বাষ্পযুগের শৈশবস্মৃতি মনে পড়ছে।

যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হ'ল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে
অলস কবির এই সার্থকতা।

আট নম্বর কবিতার নাম ছিল 'পেয়ালী', ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টিলোকে শুধু বড়রই যে সম্মান, ছোট বা তুচ্ছের কোনো মর্যাদার আসন নেই এমন নয়; এক বুনো নামহীন ফুল—কবি যার নাম দিলেন পেয়ালী—তারও একটা বিশিষ্ট

ভূমিকা আছে সৃষ্টিলোকে। কবিতাটির উপজীব্য বিষয় হলো এই—তুচ্ছ একটি ফুলের অস্তিত্ব সৃষ্টিলোকেও অপরিহার্য মনে হওয়ার মধ্যে কবির অবচেতন মনে নিজের অস্তিত্বের রহস্য এবং প্রয়োজনীয়তাও বুঝি তেমনভাবেই উপলব্ধ হচ্ছে। এদিক থেকেও এই কবিতাটির একটি বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে।

বুনো একটি চারা গাছ—এর পাতার রঙ হল্‌দে-সবুজ। এর ফুলগুলি যেন আলো পান করবার শিল্প-করা বেগুনি রঙের পেয়ালা। কবি নাম-হীন এই অপরিচিত ফুলের নাম দিলেন পেয়ালী। ফুলের অভিজাত মহলে ও অনাদৃত, অসামাজিক। ওই ফুলের ফোটা, ঝরে পড়া, বুকে মধু বহন করা—সবই কেমন অচিহ্নিত নিঃশব্দতার মধ্যেই সমাধা হয়।

একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ
আগুনের-পাপড়ি-মেলা সূর্যের বিকাশ।
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস। সৃষ্টিস্রোতের বৃহৎ তরঙ্গের মতো উঠলো নামলো কত শৈলশ্রেণী, সাগরে মরুতে কত বেশবদল ঘটলো, সেই নিরবধি কালের দীর্ঘপ্রবাহে এই ছোটো ফুলেরও আদিম সংকল্প সৃষ্টির ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে এসেছে। সৃষ্টি-রহস্যে বড় ছোটর তফাতটা বাইরের, আসলে উভয়ের ভূমিকাই এক। যেমন বড়র মধ্যে দিয়ে, তেমনই ছোটর মধ্যে দিয়েও নিত্য সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।

এই কবিতাটির শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তিতে কবি নিজের অস্তিত্বেরও রহস্য অনুভব করতে চেয়েছেন।

ন' নম্বর কবিতাটির নাম 'ঝড়'। ঝড়েরই বর্ণনা এই কবিতায় আছে। তবু ঝড়ের আকাশ, ঝড়ের সন্ধ্যা ও রাত্রির রূপ নিয়ে বিবিধ উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে ঝড়কে সহজ গোচর করে কবি পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছেন। এখানে ইংতিময়তা নেই, বা কবির পরিণত মনের গভীর কোনো বোধ এই কবিতায় অভিব্যক্ত হয় নি। ঝড়ের নিছক রূপায়ণই এই কবিতার উপজীব্য।

ঝড় হেঁকে উঠলো, সূর্যাস্ত সীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে মেঘ বেরিয়ে পড়লো দ্রুত, মনে হলো—

> বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
> গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
> শুঁড় আছড়িয়ে।

বর্ণনায় অলংকার সৃষ্টিতে কবি এখানে কল্পনার উত্তুঙ্গ শিখরে সমারূঢ়, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তিনি লিখছেন—'বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে, চালাচ্ছে ঝকঝকে খাঁড়া'। আকাশের রঙও কেমন ধূসর হলো, পাটকেল বর্ণের অন্ধকারে ঢাকা পড়লো, মনে হচ্ছে—যেন ভূতে পাওয়া।

মর্ত্যেও ঝড়ের ফলশ্রুতি সাংঘাতিক, পথিক উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, ঘন আঁধির মধ্যে থেকে ঘর-হারা গোরু ডাক পাড়ছে, কাক মুখ থুবড়ে মাটিতে ঘাস কামড়ে ধরেছে ঠোঁট দিয়ে, নদীপথে বাঁশ-ঝাড়ের লুটোপুটি :

> তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
> অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।
> জলে স্থলে শূন্যে উঠেছে
> ঘুরপাক-খাওয়া আতঙ্ক।

হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজলো সব, কেমন একটা সোঁদা গন্ধের দীর্ঘশ্বাস উঠলো মাটি থেকে। রাত তিন পহরে থামলো ঝড়বৃষ্টি, চারিদিকে তখন শুধু ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝি পোকার শব্দ। আর মাঝে মাঝে আঁৎকে

ওঠা দমকা হাওয়ার চমক, আব থেকে থেকে জলঝবা ঝাউয়ের ঝব-ঝবানিব আওয়াজ।

নিতান্ত সাধাবণ বর্ণনা—এবং আটপৌবে গদ্যভাষায়ও যে ঝডেব বর্ণনা-সুন্দব একটি অনবদ্য ছবি আকা যায়—তাবই প্রকাশ কবি দেখিয়েছেন। ভাষা ও ভঙ্গীর দিক থেকে শেষ পবেব কবিতা হিসেবে একে চিহ্নিত কবা চলে ; ভাবেব দিক থেকে কোনো তাৎপর্য নেই—একথা আগেই আমি বলেছি।

দশ নম্বব কবিতাটিব নাম ছিল 'দেহাতীত'। ১৩৪২ সালেব চৈত্রমাসেব প্রবাসীতে এটি মুদ্রিত হয়েছে।

মানুষ যতই নিজেকে আকাঙ্ক্ষাব ঘেবাটোপে ঢেকে বাখে—ততই সে অন্তর্লোকেব শুভ্র চৈতন্য থেকে দূবে সবে থাকে, কামনা-বাসনাব বিষয় বসে সে মত্ত থাকে, তাব সূক্ষ্মদৃষ্টি ঢাকা পড়ে, পঙ্কে তাব পক্ষ হয় লগ্ন। যদি স্বচ্ছ নিবঞ্জন সূর্যালোকে সে আত্মাকে স্নান কবাতে পাবে, তাব আত্মা মুক্তদৃষ্টি ফিবে পেতে পাবে, তখন তাব পঙ্ক থেকে উত্তবণ ঘটে। আলোক স্নানেই মনেব ক্লেদ, গ্লানি, ও কামনার অন্ধকার দূব হয। আত্মাব স্বৰূপ তখন সহজ উপলব্ধিব সামগ্রী হয়।

কবি প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে নিজেব আত্মাব স্বৰূপ সন্ধানেব চেষ্টা কবেন, প্রাচীন ভাবতবর্ষেব ঋষিবা মানবাত্মাব মহৎ স্বৰূপকে অন্ধকাবেব পাব থেকে উদিত আদিত্য-বর্ণ সূর্যেব মধ্যেই দেখেছিলেন, কবিও আজ নিজেব আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে সূর্যস্নাত কবে অনুভব কবতে চাইছেন।

এই কবিতাব উপজীব্য বিষযই তাই—বহির্জীবন নয, দেহ ও মন থেকে কবি আত্মাকে মুক্ত কবে তাব স্বৰূপ আবিষ্কাব ও উপলব্ধিব বাসনা প্রকাশ কবছেন। দেহ তো বাইবেব আবর্জনায পঙ্কিল হয়ে থাকে, রাগ দ্বেষ, ভয-ভাবনা, কামনা বাসনাব আবিল আববণে আত্মাব মুক্তৰূপ বার বাব ঢাকা পড়ে যায়। সত্যের মুখোশ পবে সত্যকেই আড়াল করে রাখে। মৃত্যুর কাদা-মাটিতেই আপনাব পুতুল গড়া হয়,

প্রাণপণ সঞ্চয়ে রচনা করে মরণের অর্ঘ্য ;
স্তুতি নিন্দার বাষ্প বুদ্বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত।
বক্ষ ভেদ ক'রেও হাউয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার।

বস্তুগত এই আবর্জনা এবং দেহমনের এই তুচ্ছতা থেকে কবি নিজের মহৎ আত্মস্বরূপকে বিচ্ছিন্ন করে উপলব্ধি করতে চান। তাই তিনি সূর্যালোকে অবগাহন করে নিজের অন্তরলোকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানের জন্যে 'অসংখ্য দণ্ডপল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত দেহটাকে সরিয়ে' ফেলেন মনের থেকে, সূর্যস্নানে পরিশুদ্ধ হয়ে সত্যের তথা আত্মশক্তির কল্যাণরূপ দেখতে চান।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষি কবিরা নিজেদের আত্মার কল্যাণরূপ অনুভবের জন্যে এবং আত্মার জ্যোতির্ময়তা উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় সকালবেলার নবোদিত সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্ পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥[৫]

[হে পূষন্ (পোষণকর্তা সূর্য, এখানে পরমেশ্বর অর্থও গ্রহণ করা চলে) সত্যের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির) দ্বার হিরণ্ময় (আপাতরম্য উজ্জ্বল) পাত্রের দ্বারা (সুখকর বিষয় দ্বারা) আবৃত। সত্যসেবী আমি যাতে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করি—সেজন্যে সেই আবরক পাত্র অপসারণ করুন।]

হিরণ্ময় আবরণে যেমন সূর্যশক্তি ঢাকা, তবু সূর্যশক্তি সেই আবরণ উন্মুক্ত করে নিজেকে প্রকাশ করে, তেমনি কবি অনুভব করেন যে তাঁর আত্মাকে আবৃত করে আছে তাঁর এই দেহ, এই আচ্ছাদন। সূর্যের প্রকাশ তেজোময় অগ্নিসত্তায়, কিন্তু তার অন্তরে আছে সত্য ও

কল্যাণের রূপ,—কবি সেই রূপকে নিজের ধ্যান দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে চান। তিনি সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন—

তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,
তারও অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।

প্রাচীন যুগে সভ্য দেশের সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই ধ্যানদৃষ্টিতে সূর্য-শক্তিকে অনুভব করেছেন আপন আত্মসত্তার গভীরে; কবিও আজ ধ্যানদৃষ্টিতে আত্মস্বরূপের সত্যমূর্তি দেখতে চাইছেন। ১৯২৪ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা একটি পত্রের সঙ্গে কবিতাটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।[৬]

এগারো নম্বর কবিতাটি ১৩৪৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'উদাসীন' নামে প্রকাশিত হয়। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি মুগ্ধ হয়েছেন, এক ঋতুর বৈভব শূন্যতায় লীন হয়, নূতন সৌন্দর্যের সূচনা ঘটে,—আজ কবির জীবনে বার্ধক্যের ছায়া নামছে, একদা প্রকৃতি সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তাঁর রক্তে দিয়েছিল দোল, তাঁর চোখে বিছিয়েছিল বিহ্বলতা, আজ কবির বিষণ্ণ মনে সেই রূপ ভিন্নভাবে ধরা পড়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী সত্তাকে তিনি প্রমদা সহচরী নারীরূপে কল্পনা করেছেন।

একদিন প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ ছিলেন, আজ বার্ধক্যে কবি প্রকৃতির মধ্যে সেই রূপমুগ্ধতা দেখতে পাচ্ছেন না; প্রকৃতি বুঝি তাঁর স্তুতিকে করছে উপেক্ষা। প্রকৃতি-নারীর মনোহারী সজ্জাও বুঝি নেই। চাঁদের নয়নাভিরাম মাধুর্যও হারিয়ে গেল, যে স্বপ্ন ও কল্পনার ঐশ্বর্যময় ভুবন গড়া হয়েছিল চাঁদকে কেন্দ্র করে, আজ কোথায় সেই রঙের শিল্প, সুরের মন্ত্র, সেই নিত্য নবীনতা? আজ তো আর ফুল ফোটে না, কলমুখরা ঝরণাও প্রবাহিত হয় না।

প্রকৃতিও আজ কবির কাছে সেই বাণীহারা চাঁদেরই মতো, কিন্তু

উদাসীন প্রকৃতির এতে কোনো দুঃখ নেই।

একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারই ভালো লাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারই উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।

কবিকে রূপসুধা থেকে বঞ্চিত করে প্রকৃতি কি নিজের সার্থকতা থেকে বঞ্চিত নয়? কবির মনে আজ স্মৃতি হিসেবে প্রকৃতির মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ জেগে আছে। তিনি লিখছেন—

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।

অথচ প্রকৃতির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, বাঞ্ছিতের প্রতি মমতায় যে নিজেব আন্তব সৌন্দর্যের উদ্ঘাটন—এ সত্যও যেন প্রকৃতি ভুলতে বসেছে! কবি প্রকৃতিতে বান্ধবী নারীর বোধ আরোপ করেছেন, এই সমাসোক্তি কিন্তু এই কবিতার একটি বাড়তি আকর্ষণ।

বারো নম্বর কবিতা 'পত্রপুট'র এক বিশিষ্ট কবিতা। এটি ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসেব প্রবাসীতে "বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে" নামে বের হয়। এ কবিতাটির গুরুত্ব হচ্ছে—এখানে কবির পরিণত মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতায় কবির কৈশোর জীবনের স্মৃতি রোমন্থন আছে, অসম্পূর্ণ প্রেমের কারুণ্য ও বেদনার কথা আছে, আবার অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ—সেই প্রতিরোধ-অভিযানে কবির যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ঘটে নি,—সে স্বীকৃতিও এই কবিতায় আছে। জীবন-সায়াহ্নে কবি আজ মানবেতিহাসের স্রষ্টা যে কল্যাণ-সুন্দর নিত্য-মানব—তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এক কথায় বলা চলে কবি এখানে তাঁর আত্মজীবনকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এই কবিতাটিকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে লেখা 'কবির আত্মস্বরূপবিবৃতির কবিতা' বলেছেন। 'কবিতাটি বাচ্যার্থে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে এবং কর্মীর জীবনের সঙ্গে কবির নিজ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাববোধ প্রকাশিত।'[৭]

এই কবিতায় তিনটি পর্যায় আছে।

জীবনের অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে শেষধাপের কাছটাতে এসে কবি বসেছেন, পা ভিজিয়ে দিয়ে কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। পিছনের জীবনের কিছু কথা মনে পড়ছে, কত কিছুই তো জীবনে পূর্ণতার, সাফল্যের গৌরব অর্জন করে নি, কত কিছুই তো জীবনে চরিতার্থ হয় নি। জীবনে কবে অকাল বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল, ভোরের কোকিল জেগেছিল, সেদিন সেতারে তারও চড়ানো হয়েছিল, কিন্তু যাকে শোনাবার জন্যে গানে সুর বসানো হলো—তার আর সময় হলো না, ছেড়ে চলে গেল এই সংসার, ধূসর আলোর ওপর পড়লো কালো মরচে।

থেমে-যাওয়া গানখানি নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলার মতো
ডুবল বুঝি কোন্ একজনের মনের তলায়,
উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,
কিন্তু জ্বালানো হ'ল না আলো।

প্রথম যৌবনের এই অচরিতার্থ প্রেমের স্বপ্নই কবির সম্বল—এ জন্যে কবির কোনো ক্ষোভ নেই। বিরহজর্জর বঞ্চিত জীবনকে নিয়েই কবির সার্থকতা, বিরহাতুর আর্তির সংবেদনই কবির পাওনা—তাঁর 'তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত গৌড়-সারঙের আলাপ'। তাই দুঃখ করবার কিছু নেই।

এই অংশে কবির হয়তো মনে পড়তে পারে তাঁর বৌঠানকে, তাঁর কিশোর বয়সের সঙ্গী, তাঁর নিভৃত মনের বন্ধুকে আজ জীবনের শেষপর্বে মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এ কথা মনে করার কারণ হলো যে কবি অকপটে স্বীকার করছেন যে বিরহদশাই তাঁর অফুরন্ত কবিতার উৎস।

বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে ঢেলে দিয়েছে ক্ষুধিত সুরের ঝর্ণা রাত্রিদিন।

এর পরই কবি নিজের কবিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি. মৃত্যূত্তীর্ণ প্রাণের পরিচয় লাভ করতে পারেন নি, তাঁর কবিসত্তা যেন পাহাড়তলিতে অবস্থিত নিস্তরঙ্গ সরোবর। সেখানে তীরে গাছ থেকে বসন্তশেষের ফুল ঝরে পড়ে, কালবৈশাখীর পাখার ঝাপট তার স্থির জলে অশান্ত উন্মাদনা জাগায়, নববর্ষার গম্ভীর শ্যামমহিমায় সে হয় লীলাচঞ্চল। বর্ষা বা বৈশাখীর তাণ্ডবে সে চঞ্চল এবং উদ্দাম হলেও পাথর ডিঙিয়ে সীমাহীন নিরুদ্দেশের পথে বের হতে পারে নি, আবদ্ধ থেকেছে সে নিজের গণ্ডীটুকুর ভেতরে—আপন অবরুদ্ধ বাণীকে বুকে নিয়ে নতুন জীবনের খোঁজে তার আর বের হওয়া ঘটলো না। কবি আজ আত্মবিশ্লেষণ করছেন বৃহত্তর জীবনধর্মে তাঁর আর দীক্ষা নেওয়া হয় নি, আজ তাই তিনি কুণ্ঠিত বোধ করছেন।

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

কবিতার শেষাংশে কবিব মানবদরদী সত্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে তিনি শ্রমজীবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের দুঃখদুর্দশার মূক বেদনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। শেষপর্বের কবিতায় তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় আমরা বার বার পেয়েছি। 'জন্মদিনে' গ্রন্থে 'ঐকতান' কবিতা (বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি), 'আরোগ্য' গ্রন্থের ১০নং 'ওরা কাজ করে' কবিতা প্রভৃতি কবিতাতেও কবি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাদের মাহাত্ম্য দান করেছেন। এখানেও কবির বলতে দ্বিধা নেই যে বুদ্ধিধর মানুষ শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করে এসেছে—

বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে ;

এই অত্যাচারের প্রতিবিধানে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই, এই অন্যায় রোধ করার জন্যে যেসব মৃত্যুবিজয়ী দেবকল্প মানবের জয়যাত্রা—কবি তাঁদের সঙ্গে সংগ্রামসহকারিতায় সামিল হন নি, কেবল তিনি স্বপ্নে শুনেছেন সেই দেবকল্প মানবের যুদ্ধযাত্রার ডমরুর গুরুগুরু ধ্বনি, আর সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন। অতীত জীবনে অন্যায়ের প্রতিরোধে সংগ্রামীর ভূমিকা নিতে পারলেও আজ জীবনসন্ধ্যায় তিনি মহামানবের প্রতি প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছেন—যিনি মানবের কল্যাণকামী, যিনি মানুষের নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা।

শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—
মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

'নবজাতক' গ্রন্থের নবজাতক কবিতাটিও এইপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

তেরো নম্বরের কবিতাটিতে কবি আলংকারিক ভাষায় আত্মপরিচয়েরই বর্ণনা দিয়েছেন, রূপকের চমৎকার আধিকারিক প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি নিজের আন্তর অনুভবগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। কবি-হৃদয়ের অসংখ্য অনুভবপুঞ্জকে কবি 'পত্রপুট' রূপে কল্পনা করেছেন, তাই কবি-সত্তা হলো 'আমি বনস্পতি' রূপের আমি-বৃক্ষের পত্রসম্ভার। হৃদয়ের এই অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে কবির চারদিকে চিরকাল ধরে।

আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী-ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,

নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়

এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।

যেসব অনুভূতি ও উপলব্ধির সমাবেশে কবিসত্তার উদ্বোধন ও উজ্জীবন —যেগুলি কবির হৃদয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রীতি প্রেম, ভালো মন্দ, কামনাবাসনাতাবৎ অনুভবের বিশ্বভুবনখানি গড়ে তুলেছে—সেগুলিকেই কবি পত্রপুঞ্জ বলেছেন; এই পত্রসম্ভারই তো কবিকে জগৎসংসারের বিবিধ ঐশ্বর্য ও যাবতীয় সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। সুখ-দুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে, কবিচিত্তের স্পর্শবেদনশীল সেই পত্রগুচ্ছে, কখনো জেগেছে হর্ষের অনুকম্পন, কখনো বা এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সঙ্কোচ, কলঙ্কের গ্লানি, জীবনবহনের প্রতিবাদ। প্রাণ-রসপ্রবাহে তারা ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ সঞ্চার করেছে। এই চঞ্চল চিন্ময় পত্র ও পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি কবির জাগ্রত স্বপ্নকে উধাও করে দেয় চিল—উড়ে যাওয়া দূর দিগন্তে কিংবা মৌমাছি-গুঞ্জন-মুখর অবকাশে। গাছের সবুজ পাতারা দিগন্ত সূর্যের থেকে শ্বেতসার-জাতীয় প্রাণরস আহরণ করে, তেমনি চৈতন্যময়তার সকল দ্বারগুলিই কবির প্রাণকে বিশ্বভুবনের সকল ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে

মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া

রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।

এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, তো বস্তুর অতীতকে;

এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে

যার সুর যায় না শোনা।

এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে

প্রাণলীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদিযুগের,

অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস

নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।

আজ শেষ বয়সে কবি উপলব্ধি করছেন—আমি-তরুর পত্রঝরা শুরু

হয়েছে, তাই কারুণ্যভরা এক বিষণ্ণতায় কবিতাটির শেষাংশ ভারী হয়ে উঠেছে। জীবনবৃক্ষের পত্রপুট ঝরবার দিন এল; কবি তাঁর দেবতার কাছে জানতে চান—পত্রদূতগুলি-সম্বাহিত দিনরাত্রির অপূর্ব অপরিমেয় যে সঞ্চয় কবির আত্মস্বরূপে মিশে রয়েছে—সে সঞ্চয় কবি কোন্ রসজ্ঞ গুণীর কাছে রেখে যাবেন।

যদিও জীবনের প্রান্তসীমায় কবি এসে পৌঁচেছেন—তবু বিগত যৌবনের প্রেমের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় নি। এই চোদ্দ নম্বরের কবিতাটি—যার নাম ছিল 'চিরন্তনী'—কবির প্রেমিক মনের কল্পনা-বিলাসের রঙকেই প্রকাশ করেছে।

আজকের তরুণীকে সম্বোধন করে কবি তাঁর যৌবন কালের প্রেমের বর্ণরঙীন লীলারহস্যের কথা শুনিয়ে ঐ তরুণীর সখ্য যাচ্ঞা করেছেন,—একালের আবহাওয়ার কবি যতই কেন অনুপযোগী হন না, এ যুগের প্রেমের আসরে অফুরন্ত গানের যোগান দিতে তিনি পারবেন; সেই গানের সুরে প্রেমিক-প্রেমিকা নতুন করে নিজেদেরকে চিনবে—নিজেদের সীমানার অতীত পারে নিজেদেরকেই। কবি এনেছেন তাঁর যৌবনকালের বাঁশির সুর—একালের প্রেমের অভিষঙ্গে জড়িয়ে দিতে চান; কবির বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো একালের নববসন্তের হাওয়ায় রেখে যেতে চাইলেন। আজকের তরুণীর বুকে থাকুক অতীত দিনের ব্যথা, আজকের নারী সেদিনের উপলব্ধিতে পূর্ণ হোক, অধুনাতনী হোক পুরাতনী, হোক চিরন্তনী। কবিও বললেন—

ওগো চিরন্তনী

আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—

যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।

এই কবিতার কোথাও তত্ত্ব নেই, লঘু রোমান্টিক রসের অনাবিল স্বচ্ছতায় কবিতাটি স্নিগ্ধ এবং সুন্দর হয়েছে।

'আমার পূজা' শীর্ষক ১৫নং কবিতাটি কবির আত্মপরিচয় বহন করছে।

এখানে কবি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তিনি ব্রাত্য, মন্ত্রহীন; জাতিধর্মের অহংকার তাকে মোহগ্রস্ত করে নি। সংস্কারে বদ্ধ মন্ত্রের গণ্ডীতে বাঁধা পূজা—ব্যবসায়ীর ভড়ংকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি কখনো দেবতাবিলাসী ছিলেন না। তাঁর ধর্ম-চেতনার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে কবিতার প্রথম দিকে, পরে তিনি জানাচ্ছেন যে তাঁর গানে ধরা পড়েছে "সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালবাসার অমৃত।" শেষাংশে কবি তাঁর মনের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। এই নারী তার অন্তরের আনন্দকে মুকুলিত করেছেন।

অতি শৈশবকাল থেকেই কবির মনে মন্ত্রহীন দেবপূজার আয়োজন চলছিল; সূর্য-সংকেতেই পৃথিবীর জন্ম, সূর্যদেহেই উপ্ত ছিল পৃথিবীর প্রাণের বীজ, সূর্যের জ্যোতিতেই মানুষের আত্মার যথার্থ উদ্বোধন। কবি যখন বালক ছিলেন—তখনই তিনি আলোর মন্ত্রের হদিস পান। নারকোল শাখার ঝালর ঝোলা বাগানটিতে, ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের ওপর একলা বসে অনির্বচনীয়ের স্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন—প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে উৎসারিত তেজোময়ী লহরীর মধ্যে।

আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদি কালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।

এই ভাবেই তিনি সূর্যের কাছ থেকে আলোর মন্ত্র গ্রহণ করেছেন। বহু আগে তো তাঁর বাস সূর্যমণ্ডলেই ছিল। তিনি বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন ছিলেন। অনাচারের অনাদৃত সংসারে তাঁর জন্ম, প্রতিবেশীর পাড়া ছিল যেন ঘন বেড়ায় ঘেরা, তিনি ছিলেন নাম-না-জানা বাইরের ছেলের মতোই। শাস্ত্রের বিধান-মানা মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তাই অল্প।

দলের উপেক্ষিত আমি,

মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,

যে মানুষের অতিথিশালায়

প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

লোকালয়ের বাইরে ইতিহাসের মহাযুগের যাঁরা বীর, জ্ঞানী, সাধক, তপস্বী—তাঁরাই কবির নির্জনতার সঙ্গী হয়েছেন, তাঁদের নিত্যশুচিতায় কবি পবিত্র হয়েছেন, সেইসব মৃত্যুঞ্জয় মহান্ পুরুষদের দেখেছেন তিনি ধ্যানে; তাঁদের মন্ত্রই কবির জপমালা। সূর্যের অক্ষয় জ্যোতিতে যে অনির্বাণ অগ্নিমন্ত্র, কবির গানে সেই আলোর প্রকাশ ধরা পড়েছে আর তখনই তা তাঁর তপস্যা হয়ে উঠেছে, আর মৃত্যুঞ্জয় মহাপুরুষেব দেখানো পথই তাঁর অনুগমনের অয়ন হয়ে উঠেছে। তাই পূজা ব্যবসায়ীর তৈরি করা জড়মন্ত্রকে এড়িয়েই তিনি বলতে চান, লোক-দেখানো সংস্কারের ফ্রেমে বাঁধা মন্ত্রের বিলাস তাঁর নয়, তিনি তাই ব্রাত্য, তিনি তাই মন্ত্রহীন, রীতিবন্ধনের বাইরেই তাঁর পূজার আয়োজন।

কবির পূজা মুক্ত আকাশ থেকে বঞ্চিত চার দেওয়ালে ঘেরা মন্দিরে আটকানো দেবতাকে উদ্দেশ্য করে নয়,—তাঁর দেবতা কোনো কুসংস্কার-জীর্ণ বেড়াজালে অধিষ্ঠিত হয়ে বন্দী দশা ভোগ কবেন না। মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে কবি দেবতার উদ্দেশে পূজা নিবেদন করতে পারেন না, তাঁর এই রকম পূজা পদ্ধতির জন্যেই তিনি পথের মানুষকে আপন করতে পেরেছেন—যে মানুষের অতিথিশালায় কোনো পাহারা বা প্রাচীর নেই,—সেই সব মানুষই ইতিহাসের মহাযুগে আলো নিয়ে অস্ত্র নিয়ে মহাবাণী নিয়ে এসেছে—বন্দী হয়ে থাকে নি। এইভাবেই তাঁর পূজা দেবলোক থেকে মানবলোকে উন্নীত হয়েছে।

'পুনশ্চ' গ্রন্থেব 'মুক্তি', 'শিশুতীর্থ' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও আমরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সংস্কারের নিষ্প্রাণ বিধিনিষিধের বেড়াজালে-ঘেরা দেবতাকে দেখি, তাদের নিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা বাস্তববুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে উঠেছে এবং তাদেরকে হাটের পণ্য সামগ্রীর মতোই ব্যবহার করা হয়েছে।

এই কবিতাটির শেষাংশে কবি ভালবাসার অমৃতকে সৃষ্টির শেষ রহস্য বলেছেন। প্রথম দিকে যেমন আলোকোজ্জীবনের কথা আছে, শেষাংশে তেমনি ভালবাসার অমৃত সম্পর্কে কবির ভাবনার বাঙ্ময় রূপায়ণ ঘটেছে।

পূর্ণকে চিনতে মানুষের দেরি হয়; যেটুকু আমরা চিনি, সেটুকু আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গত জগতের সামগ্রী—তা কিন্তু পূর্ণ নয়। অর্থাৎ অপূর্ণ ই আমাদের চেনা, আর যা পূর্ণ—তা অচেনা, অজানা। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অচেনা নারীর মধ্যেই অসীম স্ত্রীলোকের মহিমান্বিত ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত হতে দেখলেন, বলা যেতে পারে নারীকে তিনি পূর্ণতার মহিমায় উপলব্ধি করলেন।

প্রাত্যহিক জীবনে নারীর প্রেম এক রকম—স্নিগ্ধ বেষ্টনে সংসারের মায়াকে কেন্দ্র করেই যেন সে বাঁধা থাকে।—'গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো' নিত্যকার জীবনের অনুচ্চ তটচ্ছায়ায় অল্প-বেগেই সেই প্রেমের গতি বইতে থাকে,—এ ক্ষেত্রে নারীর অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপই কবিকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও লালিত করেছে।

এ ছাড়া, ভালবাসার আর একটা ধারা আছে—যেখানে মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত আছে, যার অতল থেকে মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে—'সে এসেছে অপরিসীম ধ্যান রূপে' কবির সবদেহে মনে—

পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপ শিখা।

কবিতার উপসংহারে কবি তাঁর আলোক-চেতনা, প্রেমবোধ এবং দেবলোক থেকে মানবলোকে উত্তরণের কথাই আবার সংক্ষেপে ব্যক্ত করে বললেন—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাইরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হ'ল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

এই কবিতাটির দুটি পাঠান্তর রবীন্দ্র রচনাবলীর বিংশ খণ্ডের পরিশিষ্টে উৎকলিত আছে। সেদিকে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ষোলো নম্বর কবিতাটির নাম 'আফ্রিকা'; এটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে। ১৯৩৮ সালে মুসোলিনির ইতালী যখন আবিসিনিয়াকে (আবিসিনিয়ার বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে তখনই এই কবিতাটি লিখিত হয়। আফ্রিকা অশিক্ষিত অনগ্রসর দেশ, কিন্তু খনিজ এবং আরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ, তাই শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা এসে এখানে উপনিবেশ গড়ে আফ্রিকাকে ভাগ করে নিয়ে কালো আদমীদের শোষণ ও শাসন করছে, এরই মধ্যে আবিসিনিয়া ছিল স্বাধীন। ইতালী যখন কাপুরুষের মতো এই দেশ আক্রমণ করে বসলো, তখন আবিসিনিয়া সম্রাট হাইলে-সেলাসির পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ তখনই এই কবিতাটি লেখেন। জানা যায় যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী মশায়ের কাছ থেকে আফ্রিকা সম্পর্কে একটি কবিতা লিখে পাঠাবার জন্যে কবির কাছে অনুরোধ এলে কবি এই কবিতাটি লেখেন।[৮]

আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে এই মহাদেশে বৃক্ষলতার আধিক্যবশত নিবিড় অরণ্য গড়ে উঠেছে, কবি তাকে কল্পনাসুন্দর অভিব্যক্তি দান করেছেন। স্রষ্টা যখন তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপন সৃষ্টিকে নবতর সৌন্দর্যদানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন রুদ্র সমুদ্রের বাহু তখন প্রাচীন ধরিত্রীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বনস্পতির

নিবিড় পাহারায় তাকে বেঁধে রাখলে! নিভৃত অবকাশে এই আফ্রিকা দুর্গমের রহস্য উপলব্ধি করেছিল,—

চিনেছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতিব দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।

ছায়াবৃত অপবিচিত আফ্রিকার দিন কাটছিল কালো ঘোমটার নিচে; সভ্যতার উপেক্ষিত দৃষ্টিতে সে ছিল অনাদৃত, কিন্তু তবু লোভী দস্যু নেকড়েসুলভ মনোবৃত্তিব মানুষ—যাবা সভ্যতার গবে আফ্রিকার 'সূর্যহারা অরণ্যেব চেয়ে' বেশী অন্ধ—তারা এল লোহাব হাতকড়ি নিয়ে, বন্দী করলে আফ্রিকাকে, চললো শাসন, শোষণ।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হ'ল ধূলি তোমাব রক্তে অশ্রুতে মিশে;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মাবা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

অথচ এই সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গের দল সমুদ্রপারে নিজেদের দেশে সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে পূজো দেয়। অন্যদেশে উপনিবেশে মানবতাকে অবমানিত করতে এদের বাধে না, আবার নিজের দেশে সুন্দরের আরাধনা থেকে এবা ক্ষান্ত হয় না, এদের প্রতি কবিতাতেই কবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কবলেন। শেষে তিনি ঘোষণা করলেন—যদি সত্যিই মানবতার কল্যাণে ব্রতী হতে হয়, সভ্যতার আশীর্বাদে যদি আফ্রিকাকে পরিস্নাত কবতে হয়—তবে এই মানহারা মানবীরূপী আফ্রিকার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাকে শুভ্র ব্রতে কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে হবে, হিংসা দ্বেষের শেষে সভ্যতার পুণ্যবাণী যেন উদ্‌গীত হয়ে ওঠে।

আফ্রিকা কবিতাটি এই সময়ে নানা কারণে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশ স্থাপনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, একাধিক

প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ সরকারের উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়ে নিয়মিত নিন্দা করে আসছিলেন, বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতি আফ্রিকায় উপনিবেশ রচনা করে সেখানকার মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে—এ কবির পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল, তাই তিনি উপনিবেশবাদকে প্রকারান্তরে তিরস্কার হেনেছেন এই কবিতায়।

তাছাড়া, গদ্যচ্ছন্দে লেখা এই কবিতার ভঙ্গী-সৌকর্য যেমন সুন্দর তেমনই এর অলংকরণের চারুত্বও মনোরম। গোটা আফ্রিকাকে লাঞ্ছিতা, অবমানিতা নারীর ভূমিকায় আরোপ করে কবি যেরকম মানবিকতা আরোপ করেছেন—তাতে লেখাটির মধ্যে একটি ক্লাসিকাল মহিমার আরোপ ঘটেছে। সভ্যতার গর্বে উদ্ধত অত্যাচারী উপনিবেশবাদীদের প্রতি কবির আন্তরিক ঘৃণার তীব্রতাও প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে—নেকড়ের চেয়ে তীব্রতর ধারালো নখের অধিকারী তারা; তারা পশু, গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ষিত করেছে আফ্রিকাকে, দস্যু-পায়ের কাঁটা মারা জুতো তাদের পায়ে। পরাধীন ভারতবাসীর ব্যথিত সমবেদনার মনোভাবে কবিতাটি সমৃদ্ধ।

'পত্রপুটে'র সতেরো নম্বর কবিতারই সমিল ছন্দোবদ্ধ রূপ হলো নবজাতকের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি। এই সময় কবিকে বাইরের কিছু ঘটনা বিচলিত করে। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া আক্রমণকে ধিক্কার জানাতে তিনি এর আগের কবিতাটি ('আফ্রিকা') লেখেন; জাপানের চীন আক্রমণকেও বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি লিখলেন এই সতেরো নম্বরের কবিতাটি, নাম দিয়েছিলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি", ১৩৪৪ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে এটি বের হয়, কবি ব্যঙ্গ করে এই কবিতায় ঘোষণা করলেন যে মানবতা রাজনীতির কাছে কোনো মূল্যবান জিনিস বলে বিবেচিত নয়, শক্তিমানের কাছে রাজনৈতিক জয়ই একমাত্র কামনার বস্তু। ধর্মের নামে মানবকল্যাণের নামে তাদের এই অনাচার অত্যাচার করতে মনে দ্বিধা জাগে না।

যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে তারা হাঁক পাড়ে, মানুষের কাঁচা মাংসে যমের

ভোজ ভরতি করতে বেরিয়ে পড়ে; অবশ্য সবার আগে দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে তাঁর পবিত্র আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নেয়, যেন হিংসার মত্ততায় তারা জয়ী হয়, ভালবাসার বাধনসূত্র যেন ছিঁড়ে ফেলতে পারে, বিদ্যানিকেতন যেন ধুলোয় লুটোয়, সুন্দরের আসনপীঠ যেন গুঁড়ো হয়। করুণাময় বুদ্ধের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে যায়—যাতে শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলতে পারে। ওদের শুধু এই প্রার্থনা—যেন বিশ্বজনের কানে মিথ্যামন্ত্র দিতে পারে, যেন বিশ্বাসে দিতে পারে বিষ মিশিয়ে।

সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠেছে তূরী ভেরি গরগর শব্দে
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

আঠারো নম্বরের কবিতাটি 'পত্রপুটে'র শেষ কবিতা, এবং এটি সমিল এবং ছন্দোবদ্ধ। 'পত্রপুটে'র বারো নম্বর কবিতাটি লেখার পর বিভিন্ন পাঠক মহলে কথা ওঠে যে কবি পরিমিত অভিব্যক্তি সম্পর্কে এখনো সচেতন নন। বারো নম্বর কবিতাটি পয়লা বৈশাখ ১৩৪৩ সাল তারিখে লেখা হয়, আর তার চার পাঁচদিন পরেই এই কবিতাটি কবি লেখেন—এটির নাম 'শেষ মৌন', রচনার তারিখ ৫ই বৈশাখ ১৩৪৩। বারো নম্বর কবিতায় "অনেক কথা, অনেক অভিযোগ, অনেক তত্ত্ব আছে—যাহাকে তিরস্কৃত করিলেন কয়েকদিন পরে লেখা 'শেষ মৌন' কবিতায়।"[১]

কবি থামতে চান, যত বেশী বলা যাবে—তত উন্মত্ততাই প্রকাশ পাবে। থামার পূর্ণতাই হলো রচনার পরিত্রাণ। নির্বাক দেবতা যখন বেদিতে এসে বসবেন—তখনই কথার দেউল কথার অতীত মৌনে চরম বাণী লাভ করবে। নির্মাণের নেশায় শুধু মেতে থাকলে সৃষ্টি গুরুভার হয়ে পড়বে—তাতে লীলা থাকবে না।

থামিবার দিন এলে থামিতে না যদি থাকে জানা

নীড় গেঁথে গেঁথে পাখি আকাশেতে উড়িবার ডানা

ব্যর্থ করি দিবে। থামো তুমি থামো।

এইভাবে কবি নিজেকে থামাবার জন্যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছেন—কবির মধ্যেকার কথক এবার তার সুর-ঝংকার থামাক!—

তোমার বীণার শত তারে

মত্ততার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝংকারে ঝংকারে

বিরাম বিশ্রামহীন—প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি

নেপথ্যে যাক সে চলে স্মরণের নির্জনের লাগি

ল'য়ে তার গীত-অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা

অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক সারা।

এই কবিতাটির একটি ভিন্নপাঠ বিশ খণ্ড রচনাবলীর পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত আছে।

শ্যামলী

১৯৪৩ সালের ভাদ্র মাসে শ্যামলীর প্রথম প্রকাশ ঘটে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের থাকার জন্যে একটি মাটির ঘর নির্মাণ করা হয়, কবি তার নামকরণ করেন 'শ্যামলী'। এ বিষয়ে আমরা 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতাটি প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। তবু 'শ্যামলী' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে আর একবার সে কথার পুনরুল্লেখ করা চলে।

শান্তিনিকেতনের মাটির ঘরটি কবির ইচ্ছানুসারেই তৈরি হয়, কবি মাটির ঘরের নাম দিলেন 'শ্যামলী'; শেষ সপ্তকের ৪৪নং কবিতায় তা বলেছেন। বঙ্গদেশের মাটির রং শ্যামল, রূপস্নিগ্ধ এই বঙ্গদেশের মেয়েকে তিনি ভালো বেসেছেন, তার চোখে মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা। বাঙালী মেয়েও তাই কবির কাছে শ্যামলী।

'শ্যামলী' গ্রন্থের শেষ কবিতাটি ঐ মাটির ঘর নিয়ে লেখা। আর 'শ্যামলী'তে যে সব প্রেমের কবিতা আছে—তাদের নায়িকাও শ্যাম-স্নিগ্ধ বাঙালী মেয়ে। শ্যাম এবং শ্যামল বর্ণের প্রতি কবির আশ্চর্য রকমের একটা প্রীতি দেখা যায়, বার বার তিনি এই রঙের অর্থদ্যোতক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বঙ্গদেশের প্রকৃতিকে তিনি শ্যামল বলেছেন, এই দেশের মেয়েকেও তিনি প্রকৃতির মতোই শ্যামস্নিগ্ধ বলে কল্পনা করেছেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের ছবির মতোই বাঙালী মেয়ে, তার বিপ্রলব্ধ প্রেমের রঙ—কবির কাছে শ্যামল বলেই মনে হয়েছে। তাই মাটির ঘরকে নিয়ে লেখা কবিতার সঙ্গে শ্যামস্নিগ্ধ মেয়েদের চাপা প্রেমের করুণ সোহাগ নিয়ে কবিতাকে যুক্ত করে দিয়ে এই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'শ্যামলী'। শুধু যে মাটির ঘরই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় —তা কিন্তু নয়। তবে 'শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান-উৎসবের পর এই

গ্রন্থের প্রকাশ—একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

শ্যামলী মাটির ঘর। মাটির ঘরে ছাদ থাকে না, কিন্তু কবির জন্যে যে মাটির ঘর হচ্ছে—অর্থাৎ এই শ্যামলী নামের ঘর, তার কিন্তু মাটিব ছাদ হচ্ছে; মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশিয়ে এই বাড়ির ছাদ তৈরি হবে ঠিক হলো। কবির তাই ইচ্ছা, সুতরাং তাকে রূপদান কবতেই হবে। এর স্থাপত্য পরিকল্পনা করলেন সুরেন্দ্রনাথ কর, এবং ভাস্কর্য হলো নন্দলাল বসুর। "কবি, স্থপতি ও ভাস্করের মিলিত প্রয়াস আছে এই গৃহ রচনায়। তবে আসলে এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথ করের।"[১]

শ্যামলীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান কবির ৭৪তম জন্মোৎসব পালনেব উৎসবেব ঠিক পরেই হয়। এই উপলক্ষে কবি সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ কবেন। কবিতাটির শেষাংশ এই রকম—

হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যামস্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোব জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুব আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমাবে করিলে তুমি দান
ধবণীব দূত হয়ে। মাটিব আসনখানি ভবি
রূপেব যে প্রতিমাবে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ; ধরার সন্তান যারা আছে
ধবার মহিমাগান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।[২]

'শ্যামলী' গ্রন্থটি শ্রীরানী মহলানবীশকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি

'শ্যামলী' গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে কিছুদিন বরানগরে অধ্যাপক মহলানবীশের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রের কবিতাতে সেই বাড়ির স্মৃতি, গৃহ সংলগ্ন উদ্যানের সৌন্দর্য,—সব কিছুকে মনে রেখেই কবির শ্যামল স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠেছে এই কবিতায়। কবিতাটি মিল দিয়ে লেখা—তাই 'শ্যামলী' গ্রন্থের অঙ্গীভূত নয়, উৎসর্গ হিসাবেই গণ্য, তবু এই কবিতায় কবিকে পুরানো দিনের প্রকৃতিরসিক কবি বলে চিনতে পারা যায়।

'শ্যামলী' গ্রন্থে নতুন ভাবধারার কবিতা বিশেষ নেই। 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' 'পত্রপুটে' যে সুর শোনা গেছে—'শ্যামলী'তেও সেই সুরেরই অনুরণন। তবে তুচ্ছতার মধ্যে গৌরব আরোপের ব্যাপারটা আরো বেশী স্পষ্ট, এবং মানবসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে কবির ভাবনাও একটা নির্দিষ্টরূপ লাভ করেছে। প্রেমের কবিতাও আছে, কাহিনী কাব্যের মাধ্যমে প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে কবির মনোভাব একই রকমের, বিরহে করুণ নায়ক নায়িকার হৃদয়-সংবেদন নিয়েই কবিতাগুলির বক্তব্য গড়ে উঠেছে। একুশটি কবিতার মধ্যে বারোটি তো প্রেমের কবিতা : দ্বৈত, শেষ পহরে, সম্ভাষণ, বিদায় বরণ, কনি, বাঁশিওয়ালা, মিলভাঙা, হঠাৎ দেখা, অমৃত, দুর্বোধ, বঞ্চিত এবং অপর পক্ষ। এ ছাড়া মানবের প্রাণ-সত্তার পরিচয় সম্পর্কিত কবির ভাবনাও কয়েকটি কবিতায় ধরা পড়েছে, মানুষের নিত্যসত্তা সম্পর্কে কবির চিন্তা রূপলাভ করেছে। এ জাতীয় কবিতার মধ্যে 'আমি' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সুরের অন্যান্য কবিতা হলো, অকাল ঘুম, প্রাণের রস, চিরযাত্রী, কাল রাত্রে। 'তেঁতুলের ফুল' কবিতাকেও এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা চলে। এছাড়া গার্হস্থ্য রসের কিছু কবিতা আছে,—সম্ভাষণ, অকাল-ঘুম, শেষ পহরে প্রভৃতি।

শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকৃতির বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, এক নতুন তাৎপর্যে প্রকৃতিকে মণ্ডিত করেছেন। প্রকৃতির ওপরে মানবিক অনুভূতি আরোপ করেছেন। সে প্রসঙ্গ পূর্বেই বিশদ করার চেষ্টা করেছি।

'শ্যামলী'তেও দেখা যায়—কবি পরিচিত জগৎকে দেখে নতুনভাবে আবার তার রূপ-সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হয়েছেন। শুধু সেই রূপমুগ্ধতায় কবি অভিনিবিষ্ট—এমন নয়; এখানে কবিব প্রকৃতি চেতনার মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সত্যোপলব্ধি ঘটেছে। 'তেঁতুলের ফুল' কবিতায় দেখি প্রৌঢ় তেঁতুল গাছেব ফুল পরিণত বয়স্ক কবির চোখে পড়েছে; শৈশবে, কৈশোবে, বাল্যে তেঁতুল গাছের ফুল কবির চোখে পড়ে নি। বসন্তের পুষ্পাবণ্যে তেঁতুল ফুলেব যে কোনো কৌলীন্য আছে—তা কখনো মনেও পড়ে নি। আজ এই ফুলেব গৌবব কবিকে বিস্মিত কবেছে; পরিণত বয়সে কবিও আত্মোপলব্ধিব এক সূক্ষ্ম আনন্দ লাভ কবেছেন। প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ লীলা ও গতিব মধ্যে আত্মনিমজ্জন কবতে পাবলে অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভেব সুযোগ ঘটে। 'শ্যামলী'ব অনেক কবিতায় প্রকৃতিব সঙ্গে একাত্মতাব অনুভূতি কবিব মনে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি কবেছে, তাঁব অধ্যাত্ম দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও সুন্দব করে দিয়েছে। প্রকৃতি যেন মানুষেব প্রেমের লীলা বিভঙ্গে অংশ নিয়েছে বলে কবির মনে হয়েছে। তাই বাঙালী শ্যামলী মেয়েব প্রতিবিম্ব প্রকৃতির মধ্যে ফুটে উঠেছে বলে কবির মনে হয়েছে। শ্যামলী মেয়েব হৃদয়বাগেব অনুরণন প্রকৃতির মধ্যেও সঞ্চাবিত। কবিও তাই নায়িকার অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকৃতিলোক থেকে উপমা আহবণ কবেন।

'শ্যামলী' গ্রন্থটিব সব কবিতাই গদ্যচ্ছন্দে লেখা। 'পুনশ্চ' পর্বেব গদ্যচ্ছন্দেব ব্যবহার মূলতঃ এই গ্রন্থেই শেষ হয়ে গেছে, যদি এর পবে আমবা আবার 'আকাশপ্রদীপ' গ্রন্থে দুটি গদ্যচ্ছন্দেব কবিতা দেখতে পাবো; ঐ দুটি কবিতা হলো—'কাঁচা আম' এবং 'ময়ূবেব দৃষ্টি'। এছাড়া ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে 'পালকি' এবং 'বাল্যদশা' নামে তিনি আরো দুটি গদ্যচ্ছন্দের কবিতা লেখেন। পবে এগুলিব বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তবে 'শ্যামলী' গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গেই কবির গদ্যচ্ছন্দেব জোয়াব শেষ হয়; এর পরে তিনি মিলের কবিতা লেখেন, তানপ্রধান ছন্দে প্রত্যাবর্তন করেন। গদ্যচ্ছন্দের প্রতি তাঁর আগ্রহ কমে যায়—সে বিষয়েও আমি

'আরোগ্য' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি।

'শ্যামলী'তে প্রেমের কবিতাই বেশী, এমন কি তত্ত্বভাবনার কবিতাতেও প্রেমের অনুচিন্তা আছে। পরিণত বয়সে কবি লিরিক রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থে, এখানে কবির লঘুচিত্ততার পরিচয়ও আছে, আবার গভীর প্রেমের আবেগও লক্ষ্য করবো।

'শ্যামলী'তে প্রেমের কাব্য দুভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কবি কখনো দাম্পত্যজীবনের মান অভিমান নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কখনো নৈর্ব্যক্তিকভাবে নারী সম্পর্কে পুরুষের কল্পনাকে রঞ্জিত করেছেন। তাই প্রেমের কবিতায় লিরিক রসের প্রাধান্য ঘটেছে। আর একটা কথা। 'শ্যামলী'র প্রেম-কবিতাগুলির মধ্যে নামের বালাই বা চরিত্র-পরিচয়ের ব্যাপার বড় একটা নেই। কবি 'তুমি-আমি'র মাধ্যমেই প্রেমের অভিব্যক্তিটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্যক্তিগত প্রেমের উপলব্ধিকে কবি স্মৃতিচারণার মাধ্যমে স্মরণ করেছেন, সেই স্মৃতিমূলক প্রেমের আবেগ নিগূঢ় উপলব্ধিতে আমাদের মনকে ভারাতুর করে তুলেছে। কখনো তিনি পূর্ণাঙ্গ লিরিকের মর্যাদায় কবিতার আবেগকে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, কখনো কাহিনীর মাধ্যমে গল্পরস সৃষ্টি করে চমক উপস্থিত করেছেন।

'শ্যামলী'র প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক দৃষ্টির মাধ্যমেই অনুভব করেছেন, প্রেম বস্তুসাপেক্ষ, কিন্তু প্রেমের বস্তুতে কল্পনার অতিরেক ঘটিয়ে প্রেমবস্তু প্রেমিকের কাছে সত্য হয়ে উঠেছে, সাধারণ নারী তাই অসাধারণ মহিমায় অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কবির পরিণত মননে ও চিন্তায় প্রেমের শাশ্বত রহস্যলীলা নানাভাবে এবং নানা কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেহেতু 'শ্যামলী'র প্রেম কবিতাগুলি তাঁর শেষজীবনের কাব্য, তাই সেগুলিতে আবেগের তীব্রতা তেমন নেই, কিন্তু কল্পনা এবং সুষমামণ্ডিত এক স্নিগ্ধ দ্যুতিতে এই কবিতাগুলি বর্ণরঙীন হয়ে উঠেছে। সাধারণ তুচ্ছ নারী অসাধারণ ও অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে। প্রতি-দিনকার সাধারণ গৃহস্থ রমণী 'চারু'—কবির কল্পনায় সহসা ক্লাসিক

যুগের 'চারুপ্রভা' হয়ে উঠেছে, এবং কবি স্বয়ং সেই অতীত ক্লাসিক যুগের 'অজিতকুমারে' রূপান্তরিত হয়েছেন। কবির চোখে 'ধবার প্রতিবেশিনী মেযে' স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসে বিহার করে থাকে। কবি রোমান্টিক দৃষ্টি মেলে অতীতের প্রণযজীবন ও প্রেমলীলার যে রূপ দর্শন করেন—তাকে প্রাত্যহিক জীবনের ওপর প্রক্ষেপ করে বাস্তবতার বিবিধ গ্লানি ও ধূলিমলিনতাকে দূরে সরিয়ে দেন, এবং বাস্তবাতীত এক প্রেমলোকে উন্নীত হন। আজকের রমণীকে দেখে তিনি কালিদাসের যুগের নারীকে সহজেই কল্পনা করেন, আজকের বর্ষণমুখর আকাশের তলে বসে—অতীত দিনের বর্ষার আকাশকে কবির মনে পড়ে।

'শ্যামলী'র প্রেম-কবিতায আবেগ যে কিছুটা কম সে কথা আগেও বলেছি। এর আগে কবি যেসব প্রেমের কবিতা লিখেছেন—তাতে আবেগের উদ্বেলতা ছিল, প্রেমের বিচিত্র ছলাকলায় নানা রঙ ও নানা রস উচ্ছল হযে পড়তো। 'শ্যামলী'র প্রেমের কবিতাগুলিতে আবেগ কমে এসেছে, পরিণত বযসের স্তিমিত অথচ নিবিড উপলব্ধির ছোঁযা রয়েছে। যেখানে নানা রঙের খেলা দেখানোর কথা, কবি সামান্য একটি রেখার টানে এক রঙা ছবি এঁকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'হারানো মন' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা চলে। কবি তাঁর প্রেমিকা সম্পর্কে বলছেন—

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছাযা,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

রঙের একটি খেলাই এখানে ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু বর্ণাঢ্যতায় তা অতুলনীয়। ঐ কবিতাতেই কবি বলেছেন যে তার প্রেয়সী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, শাড়ির আঁচলের একটুখানি দেখা যাচ্ছে, চুড়ির শব্দও কবি শুনছেন। এখানে কবির প্রণয়লক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছেন—এর আগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে এমন ঘটনা

আমরা কখনো লক্ষ্য করি নি।

তিনি শেষজীবনে তুচ্ছ জিনিসকে উচ্চমূল্যেই বিচার করেছেন, 'শ্যামলী'-তেও দেখি প্রেমিক রমণীরা সাধারণ বেশে গৃহজীবনের ঘরকন্নার পটভূমিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। সামান্য বাস্তবতার মধ্যেও কবির রোমান্টিক স্বপ্নরঙীন মন অসামান্যতা আরোপ করেছে, তাই ঘোমটা-পরা সাধারণ গৃহস্থ বউকে তিনি ঘোমটাখসা নারী করে বের করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মূল কথা হলো দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত এক অক্ষয় লোকের গান। দেহজ প্রেম মরণীয়, কিন্তু দেহাতীত প্লেটনিক চেতনার প্রেম তাঁব কাছে সর্বদাই বরণীয়। তাই সাধারণ রমণী—যে নিতান্ত ঘরোয়াভাবে কাছের, একেবারে নৈকট্যের ভুবনে ধরাছোঁয়ার মধ্যে রয়েছে, তাকে সীমার জগৎ থেকে কবি সরিয়েছেন উর্ধ্বলোকে আগুনের ডানায় ভর করিয়ে—"প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।" প্রেম রবীন্দ্রনাথের কাছে তখনই মহিমান্বিত হয়ে ওঠে, যখন অধরা ধরা পড়ে প্রেমের আলোয়। 'দ্বৈত' কবিতায় এই বোধটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত। 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায়ও দেখি প্রেমের অমর্ত্যলোকে মর্ত্য-বাসীর ডাক পড়েছে। গৃহসংসারে আবদ্ধ নিষ্কলুষ নারীকেও প্রেম পূর্ণ মহিমা দান করে, তাকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে নিয়ে নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কবে।

কাহিনী কাব্যের 'কনি', 'অমৃত', 'হঠাৎ দেখা', 'দুর্বোধ' প্রভৃতি কাহিনী কাব্যগুলির মধ্যে অতীত প্রেমের স্মৃতিটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানে প্রেমানুভূতির তীব্রতা আছে, ক্ষুব্ধতা আছে, বেদনার রোমন্থন আছে, কিন্তু ব্যাকুলতা বা হতাশার জ্বালা নেই। কবি সহজেই উপলব্ধি করেছেন—"রাতেব সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।" প্রেমের উপলব্ধি, স্মৃতিচারণা প্রেমিককে অক্ষয় স্বর্গের অমেয় আনন্দ-দান করে—সে আপাতঃ বিস্মৃতির জগতে থেকেও ভুলতে পারে না প্রেমের অমৃত যন্ত্রণাকে, তাই 'হঠাৎ-দেখা' সেই পুরাতন প্রণয়িণীর

ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে কবি সহজেই বলতে পারেন—'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' 'শ্যামলী'র প্রেম-কাব্যে যৌবনের আবেগ কমে এসেছে, কিন্তু প্রেমের স্মৃতি হারিয়ে যায় নি, মনে অনুরণন তোলে।

গদ্যচ্ছন্দের 'পুনশ্চ' গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন,—'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'বাঁশি' প্রভৃতির মধ্যে কাহিনীরস যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনই নাট্যীয় চমকও আছে। 'শ্যামলী'র কাহিনী কাব্যে তেমন জমকালো গল্পও নেই, নাটকীয় রসও অভাবিতপূর্ব উপায়ে উপস্থাপিত করা হয় নি। 'পুনশ্চে'র কাহিনী কাব্যগুলি তাই 'শ্যামলী' গ্রন্থের কাহিনী কাব্যগুলির চেয়ে বেশী আবেগপ্রবণ ও গল্পরসসমৃদ্ধ; তবে ভাষা-বৈভবের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। এই কাহিনী কাব্যগুলির মধ্যে লিরিক রসের প্রাধান্যই বেশী করে ফুটে উঠেছে। দু-একটি ক্ষেত্রে ছোটগল্পের দ্যুতি কি নাট্যীয় চমক যে নেই— তা নয়, তবু রসপরিণতির দিক থেকে এ জাতীয় লেখার সবগুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যায় না। কাহিনীকাব্য রচনা রবীন্দ্রনাথের কাছে নতুন নয়, 'কথা' গ্রন্থে ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীর কাব্যরসের কৃতিত্ব সহসা ভোলার কথা নয়। গদ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির মধ্যেও কাব্যরসের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়, তাঁর গদ্যভাষার মধ্যেও উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির প্রয়োগ এমনই আবেগসম্পন্ন—যাতে ঐ গদ্যভাষার সাদা শরীর কাব্যগুণের দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথই গল্প ও কাহিনীমূলক কবিতার মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন, তার গদ্যের মধ্যে লিরিকের সুর ধ্বনিত হয়, তাঁর অনেক গদ্যগল্পেই ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণের বালাই নেই—সেগুলিতে প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরলোকের রহস্যই উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

'কনি', 'অমৃত', 'দুর্বোধ', 'বঞ্চিত'—প্রভৃতি কবিতাগুলিতে যে কাহিনী একেবারেই নেই—এমন নয়, ছোটগল্পের প্রতিপাদ্য হতে পারে এমন বিষয়ের কথাও আছে, গল্পরসের ফোড়নও মিলবে—তবু সম্পূর্ণরূপে

এগুলিকে গল্প-কবিতা বলা যায় না। একটি বিরহ-ভাবাতুর মনের স্বল্পতরঙ্গিত দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাপা মনন যেন এগুলির গল্পরসকে প্রাধান্য লাভ করতে দেয় নি। এগুলিতে সাধারণ স্তরের জীবনের নৈকট্য অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু সেই নৈকট্যে গল্পেব দ্যুতি অপেক্ষা কাব্যসুষমারই বিচ্ছুরণ বেশী, তাই এরা যতটা ছোট গল্পের রস নিয়ে উপস্থিত হবার চেষ্টা করছে, তার চেয়ে ঢের বেশী কবিতার মাধুর্য নিয়ে হাজির হয়েছে।

কবির মনে বিশেষ সময়ে বিশেষ মুহূর্তের কতকগুলি 'মুডে'র রূপবর্ণনা নিয়েই এই কাহিনী-কাব্যগুলির সৃষ্টি। এই 'মুডে'র বর্ণনা দিতে গিয়ে দু-একটি চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু সেই চরিত্রের পূর্ণ রূপায়ণ নেই, তার রসপরিণতিদানের চেষ্টাও কবি করেন নি, কোথাও বা গল্পের আভাস লঘুভাবে রূপায়িত হয়েছে, তাতে বর্ণাঢ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করে নি। ঘটনা প্রায় কোথাও নেই; যেখানে ঘটনার আভাস আছে—তাও কাব্যের প্রয়োজনে অনুভূতিঘন দু একটি মুহূর্তেব চিত্ররূপ। আর সেই মুহূর্তগুলি অপূর্ব বাগ্‌বৈভবে কবিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'শ্যামলী'-র সব কাহিনী কাব্যেই দেখা যাবে জীবনের অতি পরিচিত, নিতান্ত সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলি অঙ্কিত হয়েছে। এর আগে দেখা গেছে যে প্রেমের কবিতা রচনায় কবি আবেগে উদ্বেল হয়েছেন, এখানে আবেগের সেই উচ্ছলতা নেই, আবেগ এখানে স্তিমিত। শুধু বাস্তব তুচ্ছতার মধ্যে কল্পনার অতিকৃতি দেখতে পাওয়া যাবে, ফলে সামান্য অসামান্য এবং অনির্বচনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'শ্যামলী'র আখ্যান কবিতাগুলি প্রেমের ভাব নিয়ে লেখা। আগেই বলেছি এগুলিতে কাহিনীব চমক তেমন নেই, চরিত্রসৃষ্টিও কবির অভিপ্রেত বস্তু নয়—প্রেমের ভাবটুকু ফুটিয়ে তোলার জন্যে যেটুকু কাহিনী ও চরিত্রেব উপস্থাপনা—শুধু সেটুকুতেই কবির মনোনিবেশ। সবগুলি কাহিনী কাব্যে কিন্তু আর একটি মিল লক্ষ্য করা যায়—বিচ্ছেদ-বেদনার অনুভবেই প্রেমের চিরন্তনতা উপলব্ধি করতে হয়—

এমন একটা বাণী যেন সব ক'টি কাহিনী কাব্যের মাধ্যমে বলার চেষ্টা হয়েছে। বিরহেই প্রেমের মুক্তি—এ তত্ত্বকথা রবীন্দ্রকাব্যের অতি পুরাতন বাণী,—সেই চিরন্তন সত্যটিই আবার নতুন করে এখানে ধরা পড়েছে মনে হয়। 'কনি', 'হঠাৎ দেখা', 'অমৃত', 'দুর্বোধ' 'মিলভাঙা' প্রভৃতি কবিতাতে দেখা যাবে অতীত প্রেমের স্মৃতিচারণা; স্মৃতি রোমন্থনের পথ বেয়ে গত দিনের প্রেমকে স্পর্শ করার একটি করুণ ব্যাকুল মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। স্মৃতিচারণার মধ্যে বিগত অপমৃত উপলব্ধিকে স্পর্শ করে পুনরুজ্জীবনের সংবেদনে কেমন যেন ভারাতুর হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলি।

'শ্যামলী'র সব কাহিনী কাব্যই প্রেমের উপলব্ধি নিয়ে লেখা। 'দ্বৈত', 'সম্ভাষণ', 'হঠাৎ দেখা'—এ সবের মধ্যে লিরিক রসই প্রধান। 'কনি'তে বাল্যপ্রেমের যে অঙ্কুর উপ্ত ছিল, তারই স্মৃতি-আলেখ্য বর্ণনার ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। আর সেই প্রেমের ব্যর্থ পরিণতি সম্পর্কে রোমান্টিক কবির মন-কেমন-করার একটুখানি ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কিছুটা গল্পরস আছে—তবে লিরিকের আধিক্যে ছোট গল্পের পরিণতি লাভ করে নি, বরং একটি তাত্ত্বিকতায় অবসিত হয়েছে। বাঞ্ছিত প্রেম অপ্রাপণীয় হলে তাকে অন্যরূপে ভাবতে পেরেছে প্রেমিকা নারী, কনির প্রেমের রূপান্তর ও মনের ভাবান্তরই উপসংহার টেনে এনেছে।

'মিলভাঙা' বিপ্রলব্ধ-প্রেমের কবিতা, গল্পের আমেজ বড় হয়ে ওঠেনি। 'বঞ্চিত' কবিতাতেও বিরহ ব্যাকুল বেদনার রূপায়ণ ঘটেছে। বিপ্রলব্ধের মন-কেমন-করা অনুরাগের ছোঁয়ায় কবিতাটি নতুন ভাবে পাঠকের হৃদয়ের কাছে ধরা পড়ে।

'অমৃত' কবিতায় গল্পের চারিত্রিক লক্ষণ কিছু বেশী আছে। কাহিনীর ঘটনায় কিছু বৈচিত্র্য আছে, নায়ক মহীতোষ ও নায়িকা অমিয়ার চরিত্রচিত্রণও অল্প পরিসরে সামান্য ফুটেছে।

'দুর্বোধ' কবিতায় ঘটনা নেই, শুধু বর্ণনা রয়েছে, কেমন যেন একটা

অব্যক্ত ব্যথাতুর হৃদয়ের অস্ফুট বেদনার্ত সুর আখ্যান ভাগকে ছাপিয়ে উঠে লিরিকের ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষায় এবং কবিতার ভাষায় পার্থক্য কমে এসেছিল,—তাই কাহিনী কাব্যগুলিতে গল্পরস অপেক্ষা লিরিক ধর্মেরই প্রাধান্য ঘটেছে; ভাষা যেমন কাব্যের, তেমনি প্রকাশেও হৃদয়ধর্মের আধিক্য। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের কাহিনী কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছি—এখানেও সেই কথা হুবহু প্রযোজ্য বলে এ প্রসঙ্গে আর বিস্তৃত আলোচনা করলাম না। পরে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি কবিতার আলোচনা করেছি—সেখানে এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য যা আছে—তার কথা আছে।

'দ্বৈত'কে প্রেমের কবিতা হিসেবেই বিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী, তাঁর প্রেমেব কবিতার মধ্যেও সৌন্দর্যেব অনুভব অপবিহার্য-ভাবেই দেখা দেয়। এই বস্তুজগতে প্রাণীর আদিম অনুভূতি হলো প্রেম, এবং প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সৌন্দর্যদৃষ্টি। প্রাণীর মধ্যে যে প্রেম—তার অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু ভাষা নেই। মানুষ প্রেমকে মহীয়ান্ করে ভাবতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, সেই অনুভব প্রকাশ করতেও পারে। অবশ্য আদিম মানুষ যেভাবে প্রেমানুভূতির প্রকাশ করেছে, আজকের মানুষের অভিব্যক্তি তা থেকে ভিন্ন। সৌন্দর্যকে প্রেমের সঙ্গে আজ মানুষ এক করে দেখে থাকে। সৌন্দর্যবাসনাও মানুষের আদিম বৃত্তি—তবু আজকের যুগে এই সৌন্দর্য লিপ্সার প্রকাশটি সুন্দরভাবে ধবা পড়েছে। মানুষ প্রেমের বস্তুতে সৌন্দর্য আরোপ করে থাকে। কবিরও তাই কাজ, তাঁর সৃষ্টি-শীল প্রতিভা প্রেম ও সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মূর্তিতে রূপান্তর করে। প্রেমিকাকে প্রেমিক যে দৃষ্টিতে দেখে—তা প্রেমিকের নিজস্ব দৃষ্টি। বিধাতা প্রেমিকাকে এক রকম করে সৃষ্টি করেছেন, সে যেন অধরা, সে যেন সম্পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে নি, কিছুটা প্রকাশিত, কিছুটা অপরিস্ফুট; কিন্তু প্রেমিকের অন্তর্লোকের বাসিন্দা বিধাতা সেই প্রেমিকাকে

যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে গড়ে না, তাকে নতুন করে সৃষ্টি করে। বিধাতার সৃষ্টি তাই প্রেমিকের দৃষ্টিতে সার্থকতর রূপলাভ করে। বিধাতার সৃষ্টি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, প্রেমিকের দৃষ্টি তাতে যুক্ত হয়ে তা আনন্দময় অমৃতে রূপান্তরিত হয়। কবির নিজের ভাবের রঙে যে সৌন্দর্য এবং প্রেমিক তার প্রেমের আবেগে যে প্রেমেব রূপ সৃষ্টি কবেন—তাই দ্বৈত সৃষ্টি, এই জন্যেই কবি এবং প্রেমিককে আদি স্রষ্টা ব্রহ্মার সগোত্র বলে ভাবা হয়, কবি সম্পর্কে অগ্নি পুরাণের সেই মূল্যবান্ উক্তিটি এখানে আর একবাব স্মবণ কবা যেতে পারে—
"কবিবেব প্রজাপতিঃ।"
'দ্বৈত' কবিতায় দেখি প্রেমিকাকে কবি নূতন কবে গড়েছেন, প্রিয়া যখন প্রথমে আবির্ভূতা, তখন তাকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না, বিধাতাব মানসলোকের বাইবে সবে তাব আবির্ভাব, প্রত্যুষের আলোর ইশারার মতো খানিকটা অচেনা, খানিকটা বা অর্ধচেনা।

যেমন ভোববেলার একটুখানি ইশাবা,
শালবনের পাতার মধ্যে উস্খুস্,
শেষ রাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি,
উষা যখন আপন-ভোলা—
যখন সে পায় নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে।

তেমনি ধাবা অসীমের ছায়া-ঘোমটা পবা অর্ধস্ফুট প্রিয়তমার পবিচয়কে কবি তথা প্রেমিক প্রেয়সীব 'রূপেব পরে মনের তুলি' বুলিয়ে তাকে পূর্ণ করে গড়ে তুলবে। কবি বলছেন—

দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।

একদিন একলা বিধাতার সৃষ্টি হিসাবে প্রেমিকা ছিল অথবা, প্রেমিক তাকে দুয়ের গ্রন্থিতে বেঁধেছেন। সাধারণ নারী প্রেমিকের চোখে

যখন প্রেমিকা হয়ে ধরা পড়ে—তখন প্রেমিক তাকে আপন মনের ভাব ও রসে নতুন করে গড়ে নেয়, এমনি করেই সে বিশ্বস্রষ্টার কারিগরখানার দোসর হয়। আর প্রেমিকের চোখে যে রূপ ধরা পড়ে—তা বিশ্বস্রষ্টার দেওয়া প্রকৃত রূপের চেয়েও সত্য, কেননা তখনই শুধু পুরুষের অন্তরে ধ্যানের মাধ্যমে নারী সৌন্দর্যের মাধুর্যটুকু চারুত্বমণ্ডিত হয়ে ওঠে। 'শ্যামলীতে' এই কবিতাটি স্থান পাবার আগে ১৯৭৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে এই কবিতাটি ভিন্ন চেহারায় প্রকাশিত হয়েছিল, বক্তব্য এক হলেও কায়াগঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৌতূহলী পাঠককে কবিতাটি পড়তে অনুরোধ করি।

'শেষ পহরে' কবিতায় কবি প্রেমের বিষণ্ণ মুহূর্তের একটি করুণ বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়ককে চলে যেতে হয়েছে দূরে, শেষ রাতের গাড়িতে, বিদায় ক্ষণে নায়িকা পড়েছে ঘুমিয়ে, নায়ক চলে গেল। বিদায় নেবার সময় নায়িকার বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাষণ "তবে আসি"-টুকুও নায়ক জানিয়ে যায় নি, এই বেদনার আবেগেই 'শেষ প্রহরে' কবিতাটি সমৃদ্ধ। বিদায়কালীন সম্ভাষণের স্মৃতিটুকু মনে জাগরূক থাকলে বিচ্ছেদ-বেদনা সইবার পক্ষে সে এক অক্ষয় সম্পদ-বিশেষ। নায়িকা সজাগ হয়েছিল, শেষ প্রহরে সে জেগে থাকবে, কিন্তু নায়কের যাবার আগেই সে পড়লো ঘুমিয়ে, নায়ক—

আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা—
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।

নায়ক সাবধানেই চলে গেছে, পাছে নায়িকার ঘুম ভাঙে,—বিদায় নেবার সামান্য দুটো কথা—তার অভাবেই নায়িকার জীবন যেন শূন্য হয়ে গেছে। নায়িকা নায়কের ঘরে গিয়ে দেখে নায়ক 'ফেলে গেছে ভুলে তার সোনা বাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা'। নায়িকার মনে হলো সময় থাকলে হয়তো খোঁজ করতে আসবে এই লাঠিগাছটার—কিন্তু না, নায়ক ফিরবে না—নায়িকার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে।

কবিতাটির সমাপ্তিতে বেদনার রূপায়ণ ঘন হয়ে উঠেছে; প্রেমের বক্র ও বিচিত্র গতির আভাস ফুটে উঠেছে। পাছে বিদায়কালে ফের দেখা হয়—'তবে আসি' বলে বিদায় নিতে হয়—তাই নায়িকার অভিমান :

মনে হল, যদি সময় থাকে
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে—
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয় নি ব'লে।

এখানে কবিরই নায়কের ভূমিকা, আর মনে হয় স্মৃতিরোমন্থনের মাধ্যমে তাঁর স্বর্গতা পত্নীকেই বুঝি নায়িকার আসনে বসিয়েছেন। তাই স্নিগ্ধ দাম্পত্য অভিমানের একটি মিষ্টি চিত্র হিসাবে এই কবিতাটিকে ধরে নিতে হবে।

এই কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মশাই বলেছেন—"কলহান্তরিতার বেদনার মিশ্রকরুণও কবিতাটির আনন্দ রস বর্ধিত করেছে। এই বেদনার অবস্থা-বিবৃতিতে যদি অমরুশতক অথবা পদাবলী আমাদের মুগ্ধ করে থাকে—এ কবিতাও নিঃসংশয়ে করবে। সংসারে পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশের বর্ণনা কল্পনার অতিকৃতি থেকে কবিতাটিকে রক্ষা করেছে।"•

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে 'শ্যামলী'তে লিরিক রসের কবিতার প্রাধান্য ঘটেছে। কিন্তু দুরূহতত্ত্বকথার কবিতা যে একেবারে অনুপস্থিত এমন নয়। 'আমি' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের দুরূহ দার্শনিক মননশীলতার ফসল হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। কবি স্বয়ং প্রবক্তারূপে অনায়াস সাবলীল ভঙ্গীতে দার্শনিক তত্ত্বকথাকে কাব্যে হাজির করেছেন, ফলে কাব্যে কবির বিরাট ব্যক্তিত্বের মহিমময় স্পর্শ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে, এবং তাতেই তত্ত্বের কাঠিন্য গলে গেছে কাব্যরসের বিগলিত উচ্ছ্বাসে, ফলে তত্ত্বকথাও লিরিক হয়ে উঠেছে। 'আমি' কবিতাটি এই উক্তির একটি যোগ্য দৃষ্টান্ত।

প্রথমে কবিতাটির তত্ত্বকথাকে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক, পরে তা কেমন করে কাব্যায়িত হয়েছে—তার আলোচনা করবো। ব্যক্তি-মানুষের অহংবোধকে কবি খুব বেশী মূল্যবান্ মনে করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি-আত্মাই বিশ্বাত্মার যথার্থ প্রতিভূ এবং বিধাতা বা বিশ্বাত্মার মতোই ব্যক্তি-আত্মা সমান সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী। বিশ্বসৃষ্টিতে যে সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রাচুর্য—তা মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির অবদান, অর্থাৎ মানুষের চিন্তালোকেই অসীমের সৌন্দর্য উপলব্ধ। এক কথায় বলতে গেলে কথাটা এই রকম দাঁড়ায় যে মানুষের অহমিকাই পৃথিবীর সৌন্দর্যের স্রষ্টা। মানুষের অহঙ্কার গর্বেই বিশ্বকর্মার শিল্প সুষমা প্রকটিত হয়েছে। মানুষ যদি ব্যক্তিত্ববিহীন অস্তিত্বের গণিততত্ত্বমাত্র হতো—তবে প্রেম ও সৌন্দর্য থেকে পৃথিবী হতো বঞ্চিত, কবিত্বহীন বিধাতা একাকিত্বের জড়তায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যেতেন। ব্যক্তি-মানুষের মনুষ্যত্ব মহিমার জয়গানই কবিতাটির অন্তর্লগ্ন রসের ফল্গুধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

কবি বলছেন—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।

কবির ভাবনা ও কল্পনার দ্বারাই বস্তুতে সৌন্দর্য আরোপিত হয়, কবির হৃদয়ের রঙেই কবির বিশ্বের রূপ, সেই রূপই কবির কাছে সত্য। কবি সৌন্দর্যের অনুভূতির মাধ্যমে বাইরের বস্তুকে গ্রহণ করেন, বস্তু-সত্যের মধ্যে যে অপূর্বতা আছে, কবি-কল্পনার প্রক্ষেপে, ভাবনার তির্যক দৃষ্টিতে সেই অপূর্বতাই সত্য হয়ে ধরা পড়ে। পান্না সবুজ, চুনি

লাল—পান্নার মধ্যে সবুজের যে অপূর্বতা আছে, কবির কাছে তাই সত্য বলে ধরা পড়ে। এই হলো এর অন্তর্নিহিত অর্থ। ওপর ওপর আব একটি সবলার্থ করা চলে; মানুষের মনোলোকে বস্তু-অস্তিত্বের যে বিকিবণ—তাতেই তার সত্যতা ধবা পড়ে। একই দ্রব্যেব বিভিন্ন বোধ বা প্রতিভাস যে বিভিন্ন প্রকৃতিব মানুষের মনে ভিন্নতর রূপ নেয় —তা এই জন্যে। এক সূর্যালোক বিকেলে যেমন আকাশে অবস্থিত মেঘের ওপর নানা বর্ণের প্রতিফলন ঘটায়, বস্তুসত্যও তেমনি বিভিন্ন প্রকৃতির মনে ভিন্নতার সৃষ্টি করে। যে মেঘেব যেমন অবস্থান, তাব রঙের বিভঙ্গও তেমন হয়। একই বস্তু তাই ভিন্ন মনে বিভিন্ন ধবনেব সত্যরূপের উপস্থিতি ঘটায়। (সত্যেব আবাব বিভিন্নতা কি—এমন প্রশ্ন জাগতে পাবে; সত্যেব উপলব্ধিব বা প্রকাশধর্মেব দিক থেকে রূপ বদল ঘটতে পাবে—ইংবেজীতে যাকে different versions of truth বলে ব্যাখ্যা কবা হয়ে থাকে।)

আকাশে আলোব অনির্বচনীয়তা, গোলাপেব সৌন্দর্যবহস্য—সবই কবিব কাছে ধবা পড়েছে বলেই না তাদেব সৌন্দর্য, তাদেব সুষমা। মনে হবে এ বুঝি তত্ত্বকথা, কিন্তু না, এ কবিব প্রত্যয়। সমস্ত মানুষেব অহংবোধেব মিলিত যোগফল নিয়েই বিশ্বস্রষ্টাব কারুকর্ম, তাঁব বিশ্ব-শিল্প। ক্ষুদ্র ব্যক্তি-আমি তাই বিবাট বিশ্ব-আমিব অন্তর্গত। তত্ত্বজ্ঞানী বাইরেব বস্তুসত্তাকে ব্যক্তিমনেব আধাবে একান্ত স্বাধীনভাবে স্বীকৃতি দিতে চায না, কিন্তু অসীম যিনি তিনি স্বয়ং মানুষেব সীমানায় সাধনা কবে চলেছেন। অর্থাৎ বিশ্বাত্মা যে অসীম রূপজগৎ সৃষ্টি কবেছেন—তাব উপভোগ ও স্বীকৃতি যখন মানবলোকে ঘটে,—তখনই তা সার্থক। বিশ্বাত্মা মানুষেব অহংবোধকে এইভাবেই তৈবি কবেছেন, যাতে সে বিশ্বসৃষ্টিব সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কবে। এই হচ্ছে 'আমি'র তত্ত্ব, এই তত্ত্বকে কেন্দ্র কবেই রূপ রস রঙ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। 'না' হলো 'হাঁ'।

সেই আমিব গহনে আলো-আঁধাবের ঘটল সংগম,

দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি যেমন আনন্দময়, মানুষও তেমনি আনন্দরূপকে প্রকাশ করতে রঙ তুলি নিয়ে স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

এর পরের অংশে কবি বৈজ্ঞানিক মনের কল্পনায় মহাপ্রলয়ের যে চিত্র আঁকা আছে—তার কথা বলেছেন। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। চন্দ্র খসে পড়বে পৃথিবীর বুকের পাঁজরে, মহাকালের নূতন খাতায় পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য।

মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।

প্রলয়ের দিনে ধ্বংস শক্তি উত্তাল হয়ে দেখা দেবে—তার না থাকবে সুর, না ছন্দ। তখন অসীমের এত প্রেম, এমন মাধুর্য, এত আলো সুর—কিছুই থাকবে না।

সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।

কবিত্বহীন হয়ে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্ব নিয়ে বিধাতা একাকীত্বের জড়তায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ বোধ করে আবার সাধনা শুরু করবেন যুগ যুগান্তর ধরে, ব্যক্তি মানুষের মনুষ্যত্ব মহিমার জয়গান করে বলবেন—'কথা কও, কথা কও?' বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর।' তিনি এইভাবে একবার সৃষ্টি করছেন, আবার সৃষ্টিলয়ের মধ্যে একাকীত্ব এড়াতে ফের নতুন পৃথিবী গড়ছেন।

সমালোচকেরা এই কবিতাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে থাকেন যে মানবসত্তার দুরবগাহতায় এবং সর্বব্যাপিতায় কবির অপরিসীম বিস্ময় কবিতাটিতে রূপায়িত হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টিকে কবি মানুষের অহংসত্তার বিকাশ বলে ভেবেছেন। বস্তুজগতের রূপ, রঙ, রস ব্যক্তিত্বের আত্ম-চেতনার মধ্যেই প্রতিফলিত।

'শ্যামলী'তে দাম্পত্য প্রেমের কিছু কবিতা আছে। 'শেষপহরে' কবিতার আলোচনার সময় আমরা স্নিগ্ধ অভিমানের একটি মিষ্টি ছবি দেখেছি। 'সম্ভাষণ' কবিতাটি দাম্পত্য-জীবনের প্রেমকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে—সন্দেহ নেই, তবু কবিতাটির ওপর কল্পনার অতিরেক ঘটায় পুরুষ যে নারীকে নিজের মনের সৌন্দর্যে অতুলনীয় মানসী করে তোলে—তার সহজ প্রত্যয়টি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। 'দ্বৈত' কবিতায় আমরা দেখেছি চেনার মধ্যে অচেনার আভাস জাগিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাকে নতুন করে গড়ে। 'সম্ভাষণ' কবিতায়ও দেখা যাবে তুচ্ছের মধ্যে উচ্চের মর্যাদা আরোপ করা হয়েছে। চেনার মধ্যে অচেনার রহস্যকে সঞ্চার করা 'শ্যামলী' কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

এই কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেন—" 'সম্ভাষণ' কবিতায় নিত্যপ্রাপ্ত দাম্পত্য প্রণয়ের বর্ণহীনতার মধ্যেকার একটি অসামান্য ক্ষণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অভ্যাসের জীর্ণতার মধ্যে সহসা এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন প্রতিদিনের পরিচিত অপরিচিতের রহস্যময় সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেয়, কবির ভাষায় তখন আসে দুর্লভ গোধূলি লগ্ন, তখন প্রাত্যহিকতার মালিন্য চলে গিয়ে প্রেমের অমরাবতী ফুটে ওঠে, এবং যে-কথা যে-সম্ভাষণ বাস্তব সংসারে হয় বেমানান, বাস্তবের কোনো বিশেষ অবসরেই তা স্বরূপে দেখা দেয়।"[৪]

সাধারণ ঘরোয়া জীবনের একঘেয়ে এক ছবি। রোজই 'চারু' নামে স্ত্রীকে ডাকি, শখ হলো আর কিছু বলি—যাকে বলে সম্ভাষণ,—সত্য-যুগের ভালবাসায় যেমন চলতো 'প্রিয়তমে' বলে। উচ্চহাসির মাধ্যমে স্ত্রী তার জবাব দিলে।

আটপৌরে নামে দোষ কি—পত্নীর জিজ্ঞাসা। কবি জবাব দিলেন—বারান্দার রেলিঙে পা তুলে বসে হঠাৎ তোমার বৈকালিক প্রসাধনের দিকে নজর পড়লো।

বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখি নি তোমাকে অনেকদিন।

আজ প্রথম কবির মনে হলো—অল্প মজুরির দিন চালানো একটা মানুষের জন্যে তার ঘরের পুরানো বউ নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে।

এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্য যুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপ বেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে—
শিখরিণীতে হোক, স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাত।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা,
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

প্রাত্যহিক গৃহজীবনের সাধারণ গেরস্ত বউ প্রাচীনকালের দূরের জগতের কল্পনালোকের অভিসারিকায় কত সহজেই না রূপান্তরিত হয়ে গেল।

কবির কাছে তাঁর 'চারু' ক্লাসিক যুগের 'চারুপ্রভা', আর তিনি ক্লাসিক যুগের 'অজিতকুমার'; 'তারাঝরা' নামে পরদেশী ফুলের গুচ্ছ নিয়ে কবি এসে বললেন—

"প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশে চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,

এনেছি আমি তাকে দয়া করে
তোমার ঐ কালো চুলে।"

দৈনন্দিন জীবনের গ্লানিমায় চিরন্তন মহিমার দ্যুতি অনেক সময় মলিন হয়ে যায়। সেই মালিন্যের অপসারণে নারী ও পুরুষ—উভয়েই তাদের অন্তরের সৌন্দর্য-সত্তার পরিচয় লাভ করে। রোমান্টিক দূরত্ব থেকে কবি প্রাচীন ক্লাসিক্যাল যুগে অতি সহজেই অবগাহন করেছেন। বর্তমান কালের দৈনন্দিন জীর্ণতা ঘুচে গিয়ে চিরকালের প্রণয়-বেদনার ব্যাকুল তরঙ্গ জেগে ওঠে।

'স্বপ্ন' কবিতাটিতে আছে নারী-সৌন্দর্যের রূপ-স্বপ্ন। রোমান্টিক কবির অতীতচারিতার আর একটি স্পষ্ট প্রমাণ এই 'স্বপ্ন' কবিতাটি। কালিদাসের কাব্য-সৌন্দর্য মন্থন করে কবি অমিয়-মদিরা তুলে এনেছেন, বৈষ্ণব কাব্যের স্বর্ণযুগেও কবির তেমনি অবগাহন, সেখানকার সৌন্দর্য-লোক থেকেও অমল পদ্মের পাপড়ি আহরণ করে এনেছেন। ছোট্ট চেনা মেয়ে তাই অতীত জগতের রাধিকার মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

এর আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' গ্রন্থের 'স্বপ্ন' কবিতাটির কথা স্মরণ করতে পারি। কালিদাসের যুগের পটভূমিতে কবির মন চলে গেছে, সেই অতীত যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কবি বেঁচে আছেন, কালিদাসের কালের যে প্রিয়ার প্রেমে তিনি ধন্য হয়েছিলেন,—আজকের এই বঙ্গদেশে জন্মে তিনি শিপ্রানদী তীরে উজ্জয়িনী পুরীতে তাঁর গত জন্মের প্রেয়সীর খোঁজে চলে গেছেন।

'শ্যামলী' গ্রন্থের 'স্বপ্ন' কবিতার সুর কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীত যুগের বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমময়ী রাধিকার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে কবির চোখে সাধারণ মুখচোরা, চোখে কাজল পরা মেয়ে মনে পড়ে যায়। আজকের দেখা এই মেয়ের রূপ-সৌন্দর্যের ভেলায় কবির অতীত যুগে উত্তরণ ঘটেছে—

আজ এই ঝোড়ো রাতে

তাকে মনে আনতে চাই—
তার সকালে, তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়,
তার চোখের চাহনিতে—
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।

তবু কবির মনে স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে না, তবু অতীতের দিনে শ্রাবণ-রাত্রির বাদলের হাওয়া এমনভাবেই বয়ে গেছে, তাই

মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

'প্রাণের রস' কবিতায় কবি বলেছেন যে বিশ্বব্যাপী নিসর্গ মহলে প্রাণের রসের অফুরন্ত প্রবাহ—পড়ন্ত বেলার নানা রঙের বর্ণাঢ্যতা, নানা সুরের অর্কেষ্ট্রা, চতুর্দিকে প্রাকৃত জগতের বিচিত্র অভিব্যক্তি, পাখির কণ্ঠে অজস্র কাকলি—এই সব কিছুর মধ্যেই কবি বিশ্বপ্রকৃতির একটা বাণী শুনতে পেয়েছেন। বিশ্বপ্রাণের অনির্বচনীয় প্রকাশের মধ্যে কবির প্রাণও অভিব্যক্ত হয়েছে—

আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে।—
এই কথাটুকু পৌঁছল আমার মর্মে।—

নিত্যকাল ধরে যে বিশ্বপ্রাণলীলা চলছে, কবির প্রাণে সেই লীলার স্পর্শ লেগেছে; প্রকৃতির আনন্দ চেতনার মধ্যে কবি ডুব দিয়েছেন, তিনি কান পেতে মন পেতে এবং চোখ মেলে বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বের মর্মবাণী অবিরাম শুনছেন, বিশ্বপ্রাণের স্পর্শলাভ করছেন নিজের প্রাণে। বিশ্বপ্রাণ প্রবাহে তাঁর প্রাণের গতিও মিশেছে।

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।

এখন আমাকে বসে থাকতে দাও,
আমি চোখ মেলে থাকি।

বর্তমান জীবনের সমস্যায় কবি নিজেকে আর জড়াতে চান না, সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিন্দা খ্যাতির উর্ধ্বে উঠে তিনি অখণ্ড প্রাণের রস পান করে আত্মোপলব্ধিব আনন্দে বিভোর হয়েছেন। আজ তিনি বর্তমান জীবন-সমস্যায় আর বিব্রত বোধ কবছেন না, মৃত্যু ভয়েও বিচলিত নন।

যে সমস্যাজাল
সংসারের চাবি দিকে পাকে পাকে জড়ানো
তাব সব গিঁঠ গেছে ঘুচে।
যাবার পথেব যাত্রী পিছনে যায় নি ফেলে
কোনো উদ্যোগ, কোনো উদ্‌বেগ, কোনো আকাঙ্ক্ষা,

প্রকৃতি যে তাঁর কাছে শুধু একটি জড় বস্তুপিণ্ড নয়—মৃত্যুহীন প্রাণেব অমৃতময় লীলা, কবি এ যেমন বুঝেছেন, তেমনি বুঝেছেন এই বিশ্ব-প্রকৃতিব সঙ্গে তাব অবিচ্ছেদ্য একাত্মতা। এই কবিতায় বিশ্ববোধ এবং আত্মোপলব্ধির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

'হারানো মন' কবিতাটির মধ্যে প্রেমচেতনাব প্রক্ষেপ ঘটেছে। কবির পরিণত অভিজ্ঞ মন অতীতের ফেলে আসা যৌবনেব স্মৃতি রোমন্থনের বিহ্বলতায় হয়তো বিভোব—তারই ক্লান্ত মধুব সুর শোনা যাচ্ছে 'হারানো মন' কবিতায়। এই কবিতাতে নায়িকা তুমি, আর নায়ক কবি স্বয়ং। দবজাব আড়ালে চৌকাঠের ওপাবে নায়িকা দাঁড়িয়ে, কবি দেখতে পেয়েছেন তার শাড়ির কালো পাড়েব নিচে তার কনক গৌর-বর্ণের পায়ের দ্বিধা। কবি আজ আর তাকে ডাকছেন না, কারণ তাঁব মন আজ সীমানা-দেওয়া নয়, তাঁর ভালবাসা আলভাঙা খেতের মতো।

এই কবিতাটি সম্পর্কে সমালোচকেরা একমত নন। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশাই একে প্রেমের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫] আর ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মশাই বলেছেন—'হারানো মন' ঠিক প্রেমের

কবিতা নয়। 'আদি'র আভাস-মিশ্রিত মুগ্ধতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়বাহী মাত্র। ···বার্ধক্যের স্বপ্নদৃষ্টি বরং ঠিক ঠিক প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণনে—

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—

আকাশ-প্রদীপের রূপকথা ও ছড়ার জগতে সঞ্চরণশীল প্রবৃত্তির মধ্যে বার্ধক্যের এই মনোমহিমা বরং লক্ষণীয়। প্রেম কবিতায় বাস্তব আবেগ-উত্তাপের মৃদুতা এবং নায়িকাকে কল্পমায়ার মূর্তিতে রূপান্তরিত করে নেওয়ার স্বভাব কবির চিরন্তন। একালে বরঞ্চ প্রত্যক্ষ রাগরঞ্জনের এবং আমাদের অভ্যস্ত মিলন-বিরহ কথার স্বাদগন্ধ অল্পবিস্তর পাওয়া যাচ্ছে।"[৬]

'চিরযাত্রী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানবসত্তাকে চিরপথিকরূপে কল্পনা করেছেন; পথিকরূপী এই মানবসত্তা বার বার জন্মমৃত্যুর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে, অপসৃতও হয়েছে। মানবপ্রাণ চিরকাল নতুন কিছুর মোহে প্রচলিত বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ে, নতুন কিছু রচনার নেশায় মত্ত হয়। এই প্রাণ হলো 'চিরবিদ্রোহীর' প্রাণসত্তা। এরা সন্ধানী বা সাধকের চেতনা নিয়ে নবীন সৃষ্টির প্রেরণায় বেরিয়ে পড়েছে, বিদ্রোহ করেছে, ধনমান তুচ্ছ করে মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। মানবসত্তা চিরপথিক।

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে,
পাথেয় ছিল পথেই।

সে ঘর বেঁধেছে, আবার ধ্বংসের দুর্বার শক্তির কাছে তার পরাজয়

ঘটেছে, তার সাত হাট থেকে জমা করা ভোগের ধন তাকে ফেলে দিতে হয়েছে।

তার রীতি, তার নীতি, তার শিকল, তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নীচে
পরযুগের কবরস্থানে।

কখনো সে ঘুমিয়ে পড়েছে, দুঃস্বপ্নের স্কন্ধকাটা অন্ধকারে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরেছে, তবু তার রক্তে বেজেছে এগিয়ে চলার ধ্বনি,—'পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো'।

কবি সেই মানবসত্তাকে চিরপথিকরূপে সম্বোধন করে বলছেন—সে যেন নামের মায়া না করে, ফলের আশায় ঘরকে না আঁকড়ে থাকে।

সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহুযুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত ;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

'বিদায়বরণ' কবিতায় বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে সৌন্দর্য-চেতনার বিশেষ নারীরূপ দেখতে পাওয়া যাবে। এটি নিছক প্রকৃতি রসের কবিতা, এখানে কোনো তত্ত্ব নেই। বৃষ্টি ভেজা রাতের পর মেঘলা সকালে কবি প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন, রাতজাগার ভারে মলিন আকাশের চোখের পাতা মুদে এসেছে, প্রহরগুলো বাদলের পিছল পথে পা টিপে টিপে চলেছে। তাদের রূপ ধরে রাখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তারা পালিয়ে যায়।

তাদের ধরি-ধরি করে মনটা,
ভাবি, বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।

সব মিলিয়ে কেমন একটা ঘোমটা পরা অভিমানিনী নারীর মুখ ফিরিয়ে চলার স্বপ্ন ছবি গড়ে ওঠে। তবু এ ছবি অসত্য নয়। কবির মন ওকে দিনান্তের সন্ধ্যাদীপ দিয়ে বিদায়বরণ করতে চায়।

'কবি-মানসী' গ্রন্থে 'বিদায় বরণ' এবং 'মিলভাঙা'—এই দুটি কবিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যমশাই বলেছেন—"কবিতা দুটিতে বৌঠানের প্রকাশ স্পষ্ট।" জগদীশবাবুর মতে বলাকার 'ছবি' কবিতাটি বৌঠানের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করে লেখা, এবং শ্যামলীর 'বিদায়বরণে'র মধ্যেও তিনি 'ঘোমটাপরা অভিমানিনী'র চিত্রে বৌঠানের রূপই লক্ষ্য করেছেন। 'বিদায়বরণ' কবিতার অংশ বিশেষ—

তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।

'ছবি' কবিতার—

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল
আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে
তার অখণ্ডের মিল—

এই দুই কবিতার দুটি ভিন্ন অংশ একই অর্থ এবং ইঙ্গিতবহ বলে জগদীশবাবু মনে করেছেন; তিনি লিখছেন—"এখানে কবি বললেন নীলে সবুজে সোনায় বিশ্বভুবনের সর্বত্রই তোমার লিপিখানি; কিন্তু শুধু বহির্ভুবনেই নয়, আমার রক্তের রাঙা রঙেও রয়েছে তোমার ছবি আঁকা অক্ষরের ওই লিপিখানি।"[৭]

শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মশাই 'বিদায়বরণ' কবিতার মধ্যে বৌঠানের কথা পাবার যে যুক্তিসূত্র উপস্থাপিত করেছেন, তার দাবি খুব জোরালো বলে মনে করা যায় না। 'ছবি' কবিতা প্রসঙ্গে তিনি

তাঁর মতের সমর্থনে যে প্রমাণ তথা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন, এখানে তিনি একটি পঙ্‌ক্তির ক্ষীণ যোগসূত্রে বৌঠানের কথা টেনে আনতে চান,—তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে অনেকের মনে নাও হতে পারে। সাধারণভাবে কবিতাটির রসগ্রহণে কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না।

'তেঁতুলের ফুল' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার একটি রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে নীতি-শিক্ষকতার ভূমিকা দান করেন নি, বরং প্রকৃতির মধ্যে এক আনন্দময় প্রাণচেতনা আরোপ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে বিশ্বব্যাপী পরম সত্তার অংশ বিশেষ হচ্ছে এই প্রকৃতি। তাই তেঁতুল গাছের ফুল কবির কাছে যেমন তুচ্ছ বিষয় নয়, তেমনই নীতি শিক্ষাদানের ভূমিকা নিয়েও হাজির হয় নি।

তেঁতুল ফুল অভিজাত ফুলের আসরে কখনোই গর্বের আসন পায় নি, তাই কবি বালক-জীবনে তেঁতুলের ফুলকে কখনো লক্ষ্যবস্তু বলে ভাবেনও নি, নিতান্ত সাধারণ নিয়মে তেঁতুল গাছে ফুল ধরেছে, ফল ধরেছে, ফুলের বাহারে ঐশ্বর্যের চমক নেই—অন্ততঃ গোলকচাঁপা বা কাঞ্চন ফুলের মতো, কুড়চি ফুলের মতো তপস্যায় মহাশ্বেতারূপেও ফুটে ওঠে নি, আজ হঠাৎ কবির চোখে পড়লো পথের ধারে তেঁতুল শাখার কোণে মৃদু বসন্তী রঙের লাজুক একটি মঞ্জরী।

বিরাটকায় তেঁতুলগাছ কোন্ অতীত দিন থেকে দিক্‌পালের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে—পরিবারের যেন পুরানো কালের কোনো সেবক। কবি এই গাছকে কেন্দ্র করে কিছু বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করেছেন, বাল্যকালে ঐ গাছ ছিল আস্তাবলের সীমানা,—ঝড়বাদলের দিনে গাছটিকে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনারত মুনির মতো মনে হতো, আজ পরিণত বয়সে গাছটিকে ফুলের পরিচয়বহনকারী সুন্দরের দূত বলে মনে হয়েছে। রূঢ় ও বৃহতের অন্তরে যে সুন্দরের নম্রতা আছে—আজ বৃদ্ধ কবি তা উপলব্ধি করছেন।

যখন বসন্তের পর বসন্ত এসেছে,

অশোক বকুল পেয়েছে সম্মান ;

ওকে জেনেছি যেন ঋতুরাজের বাহির-দেউড়ির দ্বারী—

উদাসীন, উদ্ধত।

সেদিন বসন্তের সভায় ওর-ও যে কৌলীন্য আছে জানা যায় নি। কবি আজ তা আবিষ্কার করছেন, তাই তাঁর যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সীমা নেই। তুচ্ছ তেঁতুল ফুলের মধ্যেও কবি সৌন্দর্য ও আনন্দের খনির সন্ধান পেয়েছেন।

'তেঁতুলের ফুল' কবিতাটির মধ্যে কবির আত্মকথার রূপক ঘটেছে। রূঢ় আপাতকঠোর এই প্রৌঢ় তেঁতুলগাছের গোপন যৌবনমদিরতায় কবির আত্মোপলব্ধির শিহরণ লক্ষ্য করা চলে। একটি পুষ্পমঞ্জরীর পবিচয়ে বৃক্ষের নব জাগ্রত চঞ্চলতায় কবি খুশী হয়ে উঠেছেন। রুক্ষ তেঁতুলগাছটি কবির শৈশবের স্বপ্ন কল্পনার ও পারিবারিক জীবনধারার সদাচঞ্চল পরিবর্তন স্রোতের মধ্যে চিরস্থায়িত্বের প্রতীকের মতোই অটল মহিমায় দাঁড়িয়েছিল।

চিরদিন দাঁড়িয়ে আছে

সেই আত্মসমাহিত তেঁতুলগাছ

মানব ভাগ্যের ওঠানামার প্রতি

ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

সেই তেঁতুল গাছে এল অপ্রত্যাশিত যৌবন চাঞ্চল্য, কবি বিস্মিত না হয়ে পারলেন না ; নিজের মধ্যেও তিনি অফুরন্ত প্রাণরসের অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করলেন। কবির সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব অনায়াস মহিমায় প্রতিফলিত হয়েছে ; তেঁতুল গাছটির বস্তুরূপ এবং ভাবরূপের মধ্যে চলতিকালের চঞ্চলতা এবং চিরকালের স্তব্ধতা কবির চিন্তায় মহনীয় হয়েই ধরা পড়েছে। প্রৌঢ় তেঁতুলগাছের মধ্যে যৌবন মদিরতা কবি যেভাবে অনুভব করেছেন, তাতে মনে হয় কবির নিজের বার্ধক্য-চেতনার মধ্যেও সেরকম ফেলে আসা সারা জীবনের প্রেম ও সৌন্দর্য-

চেতনা অভিনবরূপে ও রসে সঞ্জীবিত হয়ে দেখা দিয়েছে।

'অকাল ঘুম' কবিতাটি তত্ত্বমূলক বলাই উচিত হবে। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমিকা হঠাৎ নূতনরূপে ধরা পড়েছে। 'শ্যামলী'র কবিতা প্রসঙ্গে বার বার যেমন বলেছি, এই কবিতাটি সম্পর্কেও আর একবার সে কথার পুনরুক্তি করা যেতে পারে। অতি সাধারণকে অপরূপ মহিমার আবরণে অসাধারণ করে তোলা হয়েছে। চিরচেনা অতি সাধারণ গৃহস্থ রমণীর মধ্যে কবি অচেনা অনির্বচনীয় এক নারীসত্তাকে অবলোকন করেছেন। ঘরকন্নার কাজে অবসন্ন গৃহিণী অকালে ঘুমিয়ে পড়েছে, অতিপরিচিত সেই ঘুমন্ত নারীকে দেখে কবি রহস্যচেতনার দ্বারা দেখেছেন, তখন একান্তভাবে জানা সেই নারী অপরিচয়ের রহস্য-লোকে উত্তীর্ণ হয়ে কবিচিত্তে অপরূপ সৌন্দর্যের আবেগ জাগিয়েছে। প্রাত্যহিক পরিচিত সংসারজীবনের পটভূমিতে আবদ্ধ মানুষের স্বরূপ-সত্তা সহসা ধরা যায় না, কিন্তু কোনো এক আকস্মিক মুহূর্তে সেই পরিচিত মানুষটির আন্তর সত্তার রহস্যও ধরা পড়ে। কবি অকালে ঘুমিয়ে পড়া সাধারণ নারীর অস্তিত্বের রহস্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন। কবির কল্পনা এখানে অকৃপণ, পদে পদেই অলঙ্করণের সুষমা। অসমাপ্ত ঘরকন্নার একধারে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই রমণী, কবির মনে হচ্ছে—

কর্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয়নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।
ঈষৎ খোলা ঠোটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা ফুলের মধুর উদাসীনতা।
দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

আমরা কি সত্যিই মানুষের অস্তিত্বের রহস্য বুঝি? মানুষের আন্তর সত্তাকে জানি? গৃহকর্মক্লান্ত অকাল ঘুমে আচ্ছন্ন সেই নারীকে দেখে কবি ভাবতে শুরু করেন—

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানি নে,

এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।

কবির মনে জিজ্ঞাসা জাগে—

ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে

কোন্ নির্বাক রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি—

'কে তুমি।

তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে।'

নারী-সৌন্দর্যের মধ্যে কবি অনন্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন—

অপরূপের রসে রইল ঘিরে

অকাল ঘুমের একখানি ছবি—

বিশ্বসৃষ্টির চলমানতার মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্যের অখণ্ড উপলব্ধির এই আনন্দকে কবির আত্মোপলব্ধিরই আনন্দ বলা যেতে পারে।

'কনি' কাহিনী কাব্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমের সার্থকতা বিরহের মধ্যে, প্রেমকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সম্পদ হিসাবে দেখলেই প্রেমের সার্থকতা,—এ তথ্যই তিনি প্রেমের আলোচনায় উপস্থিত করেছেন। 'শ্যামলী' গ্রন্থের আখ্যান-কবিতাগুলির প্রেমের মধ্যে বিরহের ছোপ বেশ রঙীন হয়ে উঠেছে। 'কনি'-তে সেই বিরহবেদনার শুরু। এখানেও নায়ক কবি স্বয়ং, অর্থাৎ 'আমি'-র ভূমিকায় তিনি কবিতাটির বর্ণনা করেছেন। শেষের দিকে অবশ্য 'আমি'-র নামকরণ একটা হয়েছে অমল বলে। আমরাও অমল হিসেবে 'কনি'-কবিতার আমি-কে দেখবো।

কনি অমলের পাশের বাড়ির ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়ে, যেমন দুষ্টু, তেমনই চঞ্চল। অমলের ভালো ছেলে বলে ছিল সুনাম, ক্লাসের পরীক্ষায় পেত ডবল প্রমোশন। কনি অমলের এই কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই চায় না, চঞ্চল দুষ্টুমিতে অমলের পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটাতেই যেন ওর মজা; পড়ার সময় হয়তো অমলের পিঠে ছোট্ট মিষ্টি হাতের একটা কিল মেরেই দৌড়ে পালালো বেণী দুলিয়ে।

ছোট মেয়ের উৎপাতের মধ্যেই কাটল অন্য যুগ। তারপর কনি শাড়ি পরতে শিখলো, হাল ফ্যাসনের খোঁপায় জড়াল বেণী। অমলের পোশাকেও হলো বদল। কনির বাবা শিবরামবাবু কিন্তু অমলের বিদ্যেকে স্বীকার করতেই চান না। একদিন তিনি ইংরাজী সাপ্তাহিকের একটা পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। অমলের সেটা দেখতে বড় ইচ্ছা আর ঔৎসুক্য। শিবরামবাবু ঐ সাপ্তাহিকের একটা পাতা দেখিয়ে অমলকে বললেন—

'বুঝিয়ে দাও তো বাপু, এই ক'টা লাইন,
দেখি তোমার ইংবেজি বিদ্যে।'

অমলের মুখ লাল হয়ে উঠলো। কনি অমলের সেই অপমানেব সাক্ষী হয়ে থাকলো। পবদিন সকালে দেখা গেল অমলের টেবিলে শিবরাম-বাবুর সেই কাগজখানা।

এত বড়ো দুঃসাহসের গভীব বসের উৎস কোথায়
তাব মূল্য কত,
সেদিন বুঝতে পারে নি বোকা ছেলে।

বয়স বাড়তে লাগলো দুপক্ষেরই। অমলকে স্নেহ কবতেন কনির মা, কনির বাবা তাতে কষ্ট হতেন। অমলের বাবা প্রায় বলতেন রেগে—

'লক্ষ্মীছাড়া, কেন যাস ওদের বাড়ি।'
ধিক্কার হত মনে
বলতেম দাঁত কামড়ে,
'যাব না আর কখ্খনো।'

তবু যেতে হতো অমলকে, কনি হঠাৎ বলে উঠতো—'আড়ি, আড়ি, আড়ি।'

এবার এল দু-বাড়িতেই বাসা ভাঙার পালা। এঞ্জিনিয়র শিবরামবাবু কর্মব্যপদেশে চলে যাবেন পশ্চিমে, অমলেরাও যাবেন কলকাতায়।

কনি এসে বললে, 'এসো আমাদের বাগানে।'
আমি বললাম, 'কেন।'

কনি বললে, 'চুরি করব ছুজনে মিলে ;
আর তো পাব না এমন দিন।'

অমল গাছে চড়ে লিচু পাড়ছে, কনি নিচে ঝুড়িতে ভরে তুলছে সেই লিচু। হঠাৎ সে দৃশ্যে শিবরামবাবুর আবির্ভাব, গর্জন করে বললেন—' 'চুরিবিদ্যাই শেষ ভরসা।' ঝুড়িটা কেড়ে নিয়ে গেলেন কনির হাত থেকে। কনির দুচোখ দিয়ে মোটা মোটা ফোঁটায় নিঃশব্দে জল পড়তে লাগলো।

তারপর মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক। অমল বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখে—কনির বিয়ে হয়ে গেছে। একদিন কনির কাছ থেকে হঠাৎ দেখা করার অনুরোধ এসে গেল ; গ্রামের বাড়িতে ভাগনির বিয়েতে একা এসেছে সে, স্বামী ছুটি পায় নি। অমল দেশে গেল।

কনি প্রণাম ক'বে বললে, 'অমলদাদা,
থাকি দূর দেশে,
ভাইফোঁটার দিনে পাব তোমায় নেই সে আশা।
আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ, তাই ডেকেছি।'

বাগানে আসন পড়েছে, কনি অমলদাদার পায়েব কাছে লিচুভরা একটা ঝুড়ি বাখলে, বললে—'সেই লিচু।' অমল বললে—'ঠিক সে লিচু নয় বুঝি।' কনি বললে, 'কী জানি।' বলেই দ্রুত চলে গেল।

বাঙালী মেয়ের প্রেমের রূপান্তব ঘটেছে। অন্যের সংসারে গৃহবধূর ভূমিকা নিয়ে কনিব ভাবান্তরের মাধ্যমে একটি আদর্শ প্রেমের ছবি কবি উপহার দিয়েছেন ; বিরহাতুর বিষণ্ণতার মধ্যেই সার্থকতালাভ করে প্রেম—যতই বলা হোক না কেন, তবু কাহিনীকে এমন পরিণতি-দান করা বা মিলিয়ে দেওয়ায় প্রেমেব কবিতা হিসাবে রস-বিচারে কবিতাটিকে উচ্চ পর্যায়ের বলা যায় কি ?

'বাঁশিওয়ালা' কবিতার মধ্যে তত্ত্বকথা আছে—তবু একে প্রেমের কবিতা হিসাবে বিচার করা চলে। প্রেমের অক্ষয় আশীর্বাদ যদি সাধারণ নারীর জীবনে নামে, সেও অসাধারণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীর অন্তরের প্রেম হয়তো সার্থকতা লাভ করে নি, কৈশোর বা যৌবনের প্রেমের ওপর সাময়িক যবনিকা টেনে সংসার জীবনে নারীকে অন্যের ঘর করতে হয়—তবু অন্তর্জীবনে প্রথম প্রেমের যবনিকা দূরাগত বাঁশির সুরের দোলায় আন্দোলিত হয়, বিস্মৃত বহির্জগতের কর্মকঠোর লাঞ্ছনা থেকে তাকে মুক্তি দেয়। তাই 'বাশিওয়ালা' কবিতাটি এক-দিক থেকে রূপক কবিতা বলা চলে। বৈষ্ণব ভক্ত যেমন কৃষ্ণের বাঁশী শুনে 'ঘরকে বাহির করে আর বাহিরকে করে ঘর' তেমনি অন্তরের প্রেম নারীকে অমৃতলোকে উন্নীত করে। তাই বাঁশির সুর তার কাছে প্রেমের অভিজ্ঞা স্বরূপ। গৃহে আটক থাকা সামান্য নারীর মধ্যে বাঁশির সুর অর্থাৎ এই প্রেম-চেতনা এক অসামান্য শক্তির অধিকারিণী চিরন্তন নারীর আবির্ভাব ঘটায়। গৃহজীবনের তুচ্ছ সংকীর্ণ আঙিনার সীমায় যে নারী বদ্ধ—যার মধ্যে শান্ত শ্রীর একটা শ্যামল দ্যুতিমাত্র থাকে, সংসারের কাজেকর্মে ও সেবাধর্মে যে অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক, সে যখন তার অন্তস্তলে, তার মর্মলোকে বাঁশিওয়ালার ডাক শোনে, প্রেমের অমোঘ উপলব্ধি জাগে, সে আর তখন ভীরু নয়, তখন সে গরিমাময়ী মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো উঁচুতে মাথা তোলে, অমর্ত্য ভুবনে নিজের আসন খুঁজে নেয়।

বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে—বিধাতা যাকে গড়েছেন আধাআধি, করে, ভেতরে ও বাইরে এবং শক্তিতে ও ইচ্ছায় যার মিল হয় নি, প্রাত্যহিক গতানুগতিক জীবনস্রোতের আবর্তে ও ঘূর্ণিপাকের মধ্যেই তার জীবন কাটে। বাঁশিওয়ালার সুরে সে মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পায়।

শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—

যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী,

তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে

শ্রাবণের বাদলরাত্রি।

বাঁশির সুরে তার রক্তে বন্যার কি আগুনের ডাক নিয়ে আসে কিংবা

আনে 'ঘরের-শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।' শান্ত হয়ে ঘরের সংকীর্ণ সীমানায় বদ্ধ থেকে সংসারের কাজকর্মে আটকে থাকে, হঠাৎ বাঁশিওয়ালার বাঁশি বেজে ওঠে, আর তার মধ্যে জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী। কুয়াশার পর্দা ছেঁড়া তরুণ সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার জীবন। খাঁচার পাখি তখন আগুনের ডানা মেলে অজানা শূন্য পথে উড়ে চলে।

জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চারিদিকের ভীরুর ভিড়কে,
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওয়ালার সুর সাধারণ নারীকেও প্রেমের অমৃত আস্বাদের অননুভূতপূর্ব উপলব্ধিটুকু দান করে। ঘর-পোষা নির্জীব মেয়েকে অন্ধকার কোণ থেকে টেনে বের করে, ঘোমটাখসা সেই নারী 'যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির'।

নারীর মধ্যে যদি প্রেমের সঞ্চাব ঘটে, যদি সে তার অন্তরের প্রেমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—তবে সেই প্রেমেব গৌরব সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অক্ষয় অমৃতধামে বাস করতে পারে। সত্যিকারের প্রেম নারীকে কল্যাণী মূর্তিতে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, পারে তাকে শক্তিময়ী করতে, বিদ্রোহিণী করতে। বাঁশিওয়ালা কবিতাটিতে রূপকের আড়ালে কবি এই তত্ত্বকথাটুকুই বলতে চেয়েছেন।

প্রেম যদি একবার মনে জাগে, তবে সে প্রেমকে ভুলে থাকা যায় না, মনে হতে পারে কৈশোবের প্রেম বার্ধক্যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা হয় না। বিস্মৃতির ওপারে দাঁড়িয়েও বিগতদিনের ফিকে হয়ে-যাওয়া প্রেমও নতুন মূর্তি নিয়ে হাজির হয়, নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। 'মিল-ভাঙা' কবিতার মধ্যে কবি তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেমকে স্মরণ করেছেন। আজ তিনি বার্ধক্যের উপান্তে এসে হাজির হয়েছেন,—তবু প্রথম জীবনের প্রেমের নতুন

আস্বাদটুকু আজ স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'মিল ভাঙা' কবিতাটিতে কবিব বাল্যস্মৃতির রোমন্থন আছে। বিশিষ্ট সমালোচকেরা এই কবিতাটিতে কবিব অতীত জীবনের কৈশোর সঙ্গিনীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। ডঃ ক্ষুদিবাম দাস বলেছেন—'কবির কৈশোবের ক্ষণসখীর স্মৃতি নিয়ে জল্পনা'।[৮]

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশাইও এই কবিতার মধ্যে কবির প্রথম যৌবনের প্রেমের স্মৃতিব গৌবব ও উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করেছেন, এবং ব্যক্তিগত জীবনেব কতকটা ছায়া পডেছে বলেও মন্তব্য কবেছেন।[৯]

'কবি-মানসী' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মশাইও এই কবিতাটি বৌঠানেব স্মৃতি নিয়ে লেখা—সে কথা আলোচনা কবেছেন, এ বিষয়ে আমি আগেই একটু উল্লেখ কবেছি। শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মশাই বলছেন—"শ্যামলীব 'মিল-ভাঙা' কবিতাটিতে কবিচিত্তের অন্তরঙ্গ কথাটি যেমন কুণ্ঠাহীন, তেমনি বেদনামধুব। 'শেষ সপ্তকে'র তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবিব যে আত্মপবিচয় পবিস্ফুট হয়ে উঠেছে, 'শ্যামলী'ব 'মিল-ভাঙা' যেন তাবই পুনশ্চ-ভাষণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমবা দেখেছি প্লাঞ্চেট-যোগে কবি তাঁব নতুন বৌ-ঠানেব সঙ্গে যেন মুখোমুখি বসে কথা বলছেন। 'মিল-ভাঙা' কবিতাটিতেও দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলাব ভঙ্গিটি অনুসৃত হয়েছে।"[১০]

'মিল-ভাঙা' কবিতাব মোদ্দা কথা হলো—জীবনেব ভিন্ন আদর্শেব জন্যে নাবী ও পুরুষেব জীবন যখন ভিন্ন দিকে মোড় নেয়, ভিন্ন পথে চলে, তাদেব প্রেম পাবস্পবিক দান প্রতিদানে যদি সার্থক না হয়, জীবনেব চলার ছন্দেব মিল যদি ভেঙে যায়—তবু পুবানো বিগত দিনের প্রেম-সর্বস্ব স্মৃতি কারুণ্যে, বিষণ্ণতায় জীবনের প্রতি স্তবে স্তবে মোচড় দিতে থাকে।

কবির কাঁচা জীবনে হৃদয়েব প্রথম প্রেমেব বিস্ময়লাভ ঘটেছিল, আধো চেনাব ভালোবাসার মাধুবী জেগেছিল, কিন্তু মিলনেব পবিণতি ঘটলো না। চলতি মুহূর্তের উড়ে আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা ভালোবাসার

সেই নীড় জীবনের ঝড়ে ভেঙে গেল।

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ও পারের ডাঙায়।
মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিংবা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।

বার্ধক্যে পৌঁছেও কবির জীবনে তবু বাল্যের সেই প্রেমের রঙ তার বর্ণাঢ্যতা নিয়েই উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমের সার্থকতা ইন্দ্রিয়াতীত চেতনায়; তাই প্রেমের শক্তি ভুবনজয়ী শক্তি। বাল্যসখী বস্তুজগতে হারিয়ে গেলেও কবি মনে মনে তাকে দেখতে পান।

আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে-মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।

কবি এগিয়ে চলেছেন নিজের জীবন-স্রোতে—আজ পাশে নেই বাল্যের সেই প্রণয়িণী। একদা বাল্যে প্রথম যৌবনে যে নারী ছিল সঙ্গিনী, আজ কবি তার থেকে বহুদূরে সরে এসেছেন।

চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে—
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।

আজ কবির নতুন পথে যাত্রা, সেখানে বাল্যসখীর প্রত্যক্ষ সাহচর্য নেই—তবু পুরানো প্রেমের স্মৃতি জীবন-বীণার তন্ত্রীতে ধ্বনিত হচ্ছে। কবির যন্ত্রে আজ

তার চড়েছে বহুশত--
কোনোটা নয় তোমার জানা।

তবু একদিন

এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের

প্রথম দরদ ;

এর মধ্যে আছে তার জাদু।

আগেই বলেছি 'শ্যামলী'র প্রেম কাব্যে আবেগের তীব্রতা ও চঞ্চলতা নেই বটে সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতি হিসেবে প্রেমের অপরাজেয় শক্তিকে তিনি এখানে অনুভব করেছেন।

'হঠাৎ-দেখা' কবিতায় কাহিনীর একটি ক্ষীণ রেখা থাকলেও এর আবেদন প্রধানভাবে লিরিকরসজারিত। এখানের নায়কও কবি স্বয়ং, আমি-র ভূমিকায় অবতীর্ণ। নায়িকা হচ্ছে—ও। প্রেমের বিরহ-ভাবুকতা এই কাব্যেরও উপজীব্য বিষয়। অতীত প্রেমেব আবেগ আবার সজীব ও সজাগ হয়ে উঠেছে, এমনই অনুভব রয়েছে এই কবিতায়।

রেলগাড়ির কামবায় ও-র সঙ্গে কবির হঠাৎ দেখা। কালো রেশমী কাপড়ের আঁচল মাথায় তোলা, কবির মনে হলো যেন কালো রঙে একটা দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে ওব নিজের চারদিকে। হঠাৎ ও এসে কবিকে কবলে নমস্কার, আলাপ শুরু হলো—'কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার, ইত্যাদি।'

সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে

যেন কাছের দিনেব ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।

ছোট্ট দু-একটি কথায় জবাব দিচ্ছিল, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের মামুলি কথা যেন তার পছন্দের বাইরে। কবি ছিলেন অন্যবেঞ্চে, হাতের ইসারায় ও কবিকে ডাকলো কাছে, বসলেন এক বেঞ্চে ; মৃদুস্বরে ও বললে—নষ্ট করাব সময় নেই, তাই যে প্রশ্নটার জবাব থেমে আছে, সেটা আজ তোমার কাছ থেকে জানতে চাই। ও শুধোলে—

'আমাদের গেছে যে দিন

একেবারেই কি গেছে,

কিছুই কি নেই বাকি।'

কবি একটু চুপ করে থেকে পবে বললেন—'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' ও বললে—'থাক, এখন যাও ওদিকে।' সবাই পরের স্টেশনে নেমে গেল, কবি চললেন একা।

ছোট গল্পের রস-পরিণতি অপেক্ষা নাট্যীয় চমকের সঙ্গে এর লিরিক রসটুকু বেশী আস্বাদ্য।

'কালরাত্রে' তত্ত্বরসের কবিতা। বস্তুজগতে প্রাপ্তির মধ্যে জড়বাদী মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটতে পারে, বস্তুতঃ মানুষও ইন্দ্রিয়গত সীমার মধ্যে তার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়; কিন্তু সত্যকে যদি সে একবার দেখতে পায়, তবে তার ব্যাকুল ইচ্ছার রূপান্তর ঘটে। সত্যের অমল আলোয় জীবনের প্রকৃত স্বরূপ যখন উদ্ঘাটিত হয়—তখন স্থুল জগতে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার আর কিছুই থাকে না, মানুষ তখন পূর্ণতা লাভ করে। মানুষ যদি স্থান এবং কালের সীমা ছাড়িয়ে একবার সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে —তবে সে বিশ্বাত্মবোধে উদ্বোধিত হয়, হিরণ্ময় পরম পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন তাব অভাব কিংবা অপূর্ণতা আর কিছু থাকে না। এই দুর্লভ অনুভূতিটি অকস্মাৎ যদি কারুর অন্তরে উপলব্ধ হয়—সে তখন সার্থক হয়ে ওঠে।

কালরাত্রে নিবিড় বর্ষণমুখব পরিবেশে মানুষ কামনার কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিল, পরদিন প্রভাতে নবোদিত তরুণ সূর্যের আলোয় মানুষের চিত্ত অকস্মাৎ কামনাবাসনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে গেল। বর্ষাসিক্ত রাত্রে জড়ত্বে পরাভূত প্রাণ শুধু আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল ছিল।

'চাই চাই' করে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।

...

সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে—

সকালে নির্মেঘ নীলাকাশে আলোর খেলায়
মুক্তির আনন্দঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।

প্রাণ কামনা মুক্ত হয়, মন দাঁড়িয়ে উঠে বলতে পারে 'আমি পূর্ণ।' কবির কণ্ঠে ঘোষণা জাগে—

প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ।

মন প্রাণ তখন কামনার সংকীর্ণ গুহা থেকে উন্মুক্ত আকাশে পক্ষ বিস্তার করে দেয়—বলে, 'চাইনে কিছু চাইনে।'

'শ্যামলী'তে এ জাতীয় তত্ত্বগভীর কবিতা খুব বেশী নেই, তাই প্রেমের রহস্য নিয়ে রচিত কবিতাবলীর পাশে এটি বেমানান হলেও মানবসত্তার চিন্ময় ও চিরন্তন রূপের সন্ধান এখানে আছে।

'শ্যামলী'র আখ্যানমূলক কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী গল্পরস রয়েছে 'অমৃত' কবিতাটিতে। এখানে নায়িকা হচ্ছে, অমিয়া কবি-ও আমি-র ভূমিকায় নায়ক, তবে মহীভূষণ নামে আর একজন প্রতি-নায়কের উল্লেখ আছে, সে-ও নেপথ্য নিয়ন্তা হিসেবে এই কাহিনীতে আছে।

নায়িকা অমিয়া নায়কের প্রতি আসক্তিতে নিবিড়, তার প্রেমের সার্থকতা খুঁজছে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যে, কিন্তু নায়ক নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে ধন বৈষম্যের বাস্তব দিকের কথা বিচার করে। অমিয়ার কাছে নায়ক বিদায় নেবার সময় যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর দুই অভীপ্সার কথা উল্লেখ করলেন, বিশেষ করে মৈত্রেয়ী যে অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, সে বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে নায়ক জানিয়ে গেলেন—

'ভালোবাসাই সেই অমৃত,

উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ,
বুঝবে একদিন।'

বিরক্ত হয়ে অমিয়া বললে—কেন তুমি আমাকে মিথ্যা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে না, জোর নেই তোমার ? নায়কের উত্তর :

'বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।'

তারপর চললো নায়কের ধন-সাধনা, সোনার মদের নেশা মাথায় চড়ে বসে। শেষে বিত্ত বাড়লো, বাড়লো খ্যাতিও। কিন্তু ডাক্তার বললেন —শরীরের দিকে নজর দিতে, যেতে দূর দেশে সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্য-নিবাসে। কিছুকালের মধ্যেই লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন নায়ক। মনে পড়লো পিছনের জীবন, বুঝিবা অমিয়ার কথা,—

থেকে থেকে মনে পড়ছে,
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝলে উঠেছিল যে আলো।

নায়ক ফিরে এসে দেখেন যে অমিয়া নেই আগের ঠিকানায়। নায়কের চলে যাওয়ার পর থেকেই প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে অমিয়া দেশের কাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয়ে উঠেছে। নায়ক খুঁজে খুঁজে লোচন দীঘি গ্রামে গিয়ে অমিয়ার সন্ধান পেলেন, গ্রামের ইস্কুলে মানুষ তৈরীর কাজে অমিয়া ব্রতী হয়েছে, অবসর সময়ে সেলাই ফোঁড়াই করে, পাঠশালার বাগানে সব্‌জি ফলায়।

খবরে জানা গেল অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু মেয়ের বিয়ের জন্যে ধনীর ঘরের দুর্লভ দু-একটি ছেলেকে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু একগুঁয়ে অমিয়া বিয়ে করতে চায় নি। তারপর হঠাৎ মাধপাড়ার রায় বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ ইওরোপ প্রবাসের পর হাজির অমিয়ার সামনে,—পাত্র হিসাবে মহীভূষণ যে-কোনো কন্যার পিতার কাছেই আদর্শস্থল, কিন্তু মহীভূষণ সাম্যবাদী আদর্শকে বেছে নিয়েছে,

বিষয় কর্মের প্রতি তার অনীহা।

লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।

অমিয়া মহীভূষণের শিষ্যত্ব নিলে। কুঞ্জকিশোরবাবু অমিয়ার বিয়ে দিতে চাইলেন মহীভূষণের সঙ্গে, কিন্তু মহীভূষণ বললে—'কী হবে।'

বাবা রেগে বললেন, 'তবে তুমি আস কেন রোজ।'
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।'

নায়ককে তাই অমিয়া শেষ কথা জানিয়ে দেয়,—

'এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।'
আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললে,—'জেলখানায়।'

ছোট গল্পের রস যে একেবারে অনুপস্থিত—তা বলা যায় না, ঘটনা পরিণামের দিকে কবির যেমন নজর আছে, চরিত্রসৃষ্টির প্রতিও তাঁর তেমনই মনোনিবেশ দেখা যায়। তবু গল্প হিসেবে এই কাহিনীর রসবিচারের সার্থকতা বড় দেখা যায় না। অমিয়ার জীবনে নায়কের যতখানি স্থান জুড়ে থাকার কথা, কবিতাটির শেষাংশে মহীভূষণের স্থান তার চেয়ে ঢের বেশী হয়েছে, সাম্যবাদী আদর্শে অমিয়ার উদ্বোধনেই তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তার প্রস্তুতিপর্ব নেই কাহিনীর বিন্যাসে। তবু মহীভূষণের চরিত্রটি স্বল্প কথায় পূর্ণতা লাভ করেছে, বিশেষ করে শেষ পঙ্‌ক্তিতে আবিষ্কার করা গেল যে সে জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছে। লিরিক অপেক্ষা গল্পরসই এখানে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্যলাভ করেছে, 'শ্যামলী'র কাহিনী কাব্যগুলির মধ্যে তাই 'অমৃত' একটু স্বতন্ত্রধরনের, অর্থাৎ ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত।

'দুর্বোধ' কাহিনীমূলক কবিতা হলেও নরনারীর আচরণে কেমন করে কখন যে দুর্বোধ্য ব্যাপার ঘটে, তা বোঝা যায় না। প্রেমিকার সংযত

আচরণের মধ্যেও কখনো সখনো অভিমান জাগে, নায়কের কাছ থেকে সে নীরবে যায় সরে। অনাসক্ত নায়কের আচরণও কখনো সখনো ব্যাখ্যার অগম হয়ে ওঠে। যে নায়িকাকে গোড়াতে ভালো লাগতো না, তার প্রতি মমতায় আকাংখায় ব্যাকুল বোধ করতে থাকে, অনাদৃতার জন্য মন কেমন করতে থাকে, তাকেই সমৃদ্ধ ভালবাসার সার্বিক উপঢৌকন উজাড় করে দিয়ে নিবেদিতচিত্ত হয়— কেন, তা সহজে বোঝা যায় না। নারী-পুরুষের এই আচরণ সত্যিই দুর্বোধ।

নায়ক কুশল সেন, আর নায়িকা নবনী। নবনী ভালবাসতো কুশলকে আর কুশল প্রশ্রয় দিত সেই প্রেমকে, কারণ নবনীর অর্থেই তাকে বিলেত যেতে হবে। নবনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বিলেত গেল, চার বছর পরে ফিরে এসে তাদের বিয়ে হবে। নবনীর মনে হলো, এ যেন চার বছরের মৃত্যুদণ্ড। নবনীর সাধনা ছিল সে কুশলের হৃদয় জয় করবেই। নবনী—

ভেবেছিল দীনা বলেই একদিন হবে ওর জয়,
ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।
এ যেন ছিল ওর ভালোবাসার শিল্পরচনা,
নির্দয় পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।
ওদের দুজনের যোগাযোগ ছিল অব্যাহত চিঠি লেখার সাঁকো বেয়ে।
কিন্তু নবনী তো সাজিয়ে লিখতে জানে না মনের কথা,
ও কেবল যত্নের স্বাদ লাগাতে জানে সেবাতে
অর্‌কিডের চমক দিয়ে যেতে ফুলদানির 'পরে
কুশলের চোখের আড়ালে,
গোপনে বিছিয়ে আসতে
নিজের-হাতে-কাজ-করা আসন
যেখানে কুশল পা রাখে।

কুশল ফিরে এসেই বিয়ের দিন স্থির করলো। বিলেত থেকে নবনীর জন্যে কুশল যে আংটি এনেছে, তা পরাতে গেল নবনীর হাতে, গিয়ে দেখে নবনী নেই, সে নিরুদ্দেশ। তার ডায়েরিতে লেখা,—

'যাকে ভালোবেসেছি সে ছিল অন্য মানুষ ;
চিঠিতে যার প্রকাশ, এ তো সে নয়।'

কুশল ধীরে ধীরে ধরা পড়েছে নবনীর হৃদয়ের কাছে, নবনীর চিঠিগুলিকে তার মনে হয়েছে গদ্যে লেখা মেঘদূত, বিরহীদের চিরসম্পদ। কুশল বুঝতে পারলো যে মমতাজ চলে গেছে, চিঠির মধ্যে রয়ে গেল তাজমহল, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক' আখ্যা দিয়ে তা ছাপালে।

নবনী কেন যে চলে গেল—তার ব্যাখ্যা কি? আবার কুশলই বা পোষ মানলো কোন্ মন্ত্রে—তারই বা কারণ কি?

কুশল বলে, 'নবনী চার বছর ছিল দৃষ্টির বাইরে,
যেন নেমে গেল সৃষ্টির বাইরেতেই ;
ওর মাধুর্যটুকুই রইল মনে,
আর সব-কিছু হল গৌণ।

আসলে নারী বা পুরুষের মন কখন অনুরক্ত আর কখন বা বিরক্ত—তা বোঝা যায় না।

লিরিক রস দিয়ে লেখা বিন্যাসধর্মী ছোটগল্প হিসেবে 'বঞ্চিত' কবিতাকে বিচার করা চলে। বিন্যাসরসের গল্পে বর্ণনাই আসল, কাহিনীর বুনন গৌণ। 'বঞ্চিত' কবিতায়ও তাই। দয়িতের নিমন্ত্রণ রাখতে প্রেমিকার ব্যাকুল মানসিকতার বর্ণনার মধ্যেই কবিতাটির রস। প্রেমিকের আহ্বান, কোলকাতায় যাবার জন্যে ব্যস্ততা, ট্রেনের সামান্য বিলম্বের ব্যাপারটার মধ্যে যে তীব্র অসহনীয়তা,—শেষে প্রত্যুদ্‌গমনের জন্যে যার আসার কথা, তার অনুপস্থিতি—সব মিলিয়ে যে করুণ অসহায় অবস্থা মেয়েটির—তার নিটোল বর্ণনারসের মধ্যেই 'বঞ্চিত' কবিতাটি সার্থকতা লাভ করেছে। মিলনের জন্য সংকেত স্থানে এসে নায়কের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় বিপ্রলব্ধা নায়িকার যে দশা—তা আমরা বৈষ্ণব

কাব্যের দৌলতে জানি, প্রাত্যহিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা আর একবার আমাদের বিপ্রলব্ধার বেদনা ও রহস্যের উপলব্ধিকে সজাগ করে তুললো।

পোস্টকার্ডখানা পেয়েই দ্রুত, ব্যস্ত ও তৎপর হয়েছে মেয়েটি কোলকাতায় যাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, ট্রেনের নির্দিষ্ট গতিকে মনে হয়েছে ঢিলেমি, বিরহের আসন্ন অবসানের ব্যাকুল বাসনায় সময়কে ঠেকছে ভারী; ট্রেন ঠিক ছুটলেও জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে, ফিরে আর পায় কি না পায়,—তাই চারিদিকে বুঝি এমনি মন্থরতার আবেশ। ট্রেনের কামরায় দেখা গেল বিয়ের বর কনে। হাওড়ায় এসে গাড়ি পৌঁছল, সবাই নেমে গেল। সে কল্পনা করে আছে—

খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে,
তারপরে দুজনের হাসি।

অথচ মেয়েটিকে নেবার জন্যে কেউ আসে নি। সে আর একবার পোস্টকার্ডখানা পড়ে দেখলে—ভুল করে নি তো। না, ভুল হয় নি। তখন আর ফেরার কোনো গাড়ি নেই। বঞ্চিত নায়িকার বিপ্রলব্ধ দশা।

এই কবিতাটি এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে 'অপরপক্ষ' কবিতার সঙ্গে। এই দুটি কবিতা একে অন্যের পরিপূরক। এই অভিসারিকা কেন বঞ্চিতা ও বিপ্রলব্ধা, নায়ক কেন যথাসময়ে সংকেত স্থলে আসতে পারে নি এবং নায়িকাকে হাওড়া স্টেশনে এসে অভ্যর্থনা জানানোর ব্যাপারে কি ঝঞ্ঝাট—'অপর পক্ষ' কবিতায় তাই বর্ণিত হয়েছে।

লঘু তরল ভঙ্গিতে এটিও লিখিত; নায়কও ব্যস্ত হয়েছে হাওড়ায় যাবে নায়িকাকে আনতে, কিন্তু বেরোবার পূর্বমুহূর্তে তার বাবা তার ভাগ্নীর জন্যে পাত্রের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। যদিও বা পথে বেরোনো গেল, ট্যাক্সি চেপে হাওড়ায় পৌঁছুবার পথে ট্রাফিক জ্যাম, পাট বোঝাই গরুর গাড়ির মিছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে পায়ে

হেঁটে যখন হাওড়ায় আসা গেল তখন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে।

কী জানি, আজ থেকে টাইমটেবিলের

সময় যদি পিছিয়ে থাকে।

ঢুকে পড়লুম ভিতরে।

দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—

যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,

যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা

অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।

নায়ককেও ফিরতে হলো বিফল হয়ে। স্থূল বাস্তব জগতের অতি সত্য কিছু ঘটনায় বিপর্যস্ত নায়কের মর্মবেদনার মধ্যে সাফাই কিছু নেই বটে, কিন্তু বাস্তব ঘটনার রসিকতায় তার আত্মগ্লানিটুকু সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'বঞ্চিতা' এবং 'অপর পক্ষ' হাল্কা চালের কবিতা হলেও প্রেমিক প্রেমিকার মানসিক ব্যাকুলতার ছবিটি সুন্দবভাবে ফুটেছে, প্রেমানুভূতির সবরকমের রহস্যই উভয়ের ব্যবহারের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধবা পড়েছে।

'বঞ্চিত' এবং 'অপর পক্ষ' এই যুগ্ম-কবিতা "পাত্রপাত্রী ১) চন্দ্র মল্লিকা ২) অপর পক্ষ" এই নাম দিয়ে ১৩৪৩ সালের বৈশাখ মাসের পরিচয়ে বের হয়।

সর্বশেষে 'শ্যামলী' কবিতা। এটি যদিও গ্রন্থেব শেষে সন্নিবিষ্ট, তবু গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে এই কবিতাটির অল্প আলোচনা গোড়াতেই কবেছি। প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের ছবির মতোই বাঙালী মেয়ে, তার বিপ্রলব্ধ প্রেমের রঙ কবির কাছে ঠেকেছে শ্যামল। তাই মাটির ঘরকে নিয়ে লেখা কবিতার সঙ্গে শ্যামস্নিগ্ধ মেয়েদের চাপা প্রেমের করুণ সোহাগ নিয়ে কবিতাকে যুক্ত করে দিয়ে এই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'শ্যামলী'।

'শ্যামলী' কবিতাটিকেও মাটির ঘর 'শ্যামলী' আর বাঙালী মেয়ে একেবারে এক হয়ে গেছে। ঘন বর্ষার দাপটে মাটির ঘর 'শ্যামলী'

কবিকে আশ্রয় দিতে পারলো না, চুপ করে থাকা বাঙালী মেয়েটির ভিজে চোখের পাতায় যেমন মনের কথাটি বাজে, তেমনি কবির মাটির বাসা শ্যামলী। দেবতা-পাড়ায় বেদে মেয়ের মতো মাটির ঘরের স্থায়িত্ব, ঘন বর্ষণে তার স্থিতি নেই, বেদে মেয়েও তো বাসা ভাঙে বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড়ে পথে। কবি বললেন—

মুখোমুখি বসব ব'লে বেঁধেছিলেম মাটির বাসা
তোমার কাঁচা-বেড়া-দেওয়া আঙিনাতে।

শ্রাবণ ধারায় শ্যামলীর মাটি গেল গলে, মাটির বাসা কবির কানে কানে জানালে—'আর নয়, এবার তোলো বাসা।' একই সাহানাবই সুর বাজে শ্যামলীর বাঁশীতে—কি গৃহপ্রবেশে কি সেখান থেকে নিষ্ক্রমণে।

এই কবিতাটি 'শেষ সপ্তকের' ৪৪নং কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া উচিত। কবি সেখানে শ্যামল মাটির প্রতি আকর্ষণ ব্যক্ত করেছেন। পূর্ববীতেও তিনি ঘোষণা করেছেন "আজকে খবর পেলেম খাঁটি। মা যে আমার এই শ্যামল মাটি,"[১১] সেই ভাবেরই অনুরণন ধ্বনিত হয়েছে।

খাপছাড়া

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তিনি গভীর ও দুরূহ বিষয়ে মনোযোগী হয়েও অবকাশ সময়ে হাল্কা সুর ও মেজাজের পরিচয় দিয়ে রঙ্গরসিকতা করতেন, লঘুচাপল্যে মনের শৈশবকে উন্মুক্ত করতেন। গম্ভীর কাজের মধ্যেও মনের রাশ আলগা করে অনাবিল হাস্যরসের আমদানি করতে পারতেন। 'খাপছাড়া'র কবিতাগুলি তাঁর এমনি মনের ফসল। অবকাশ সময়ে তিনি তুলি নিয়েও আপন ভাবের সঙ্গে খেলা করতেন রেখা টেনে টেনে, কিংবা কলমে ধরে রাখতেন হাল্কা ছন্দের অভাবিতপূর্ব মিলের চমক। 'খাপছাড়া' গ্রন্থটি এই দুই জাতীয় খেলার ফলশ্রুতি। বিরাট প্রতিভার হাল্কা চালের খেলা যে কী রকম—তার জ্বলন্ত উদাহরণ দিই।

'খাপছাড়া'য় ছড়া জাতীয় আজগুবি ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে ছন্দ ও মিলের সৌন্দর্যপ্রকাশক সুন্দর সুন্দর টুকরো কবিতা আছে। ইংরেজীতে যাকে লিমেরিক জাতীয় ছড়া বলে—'খাপছাড়া'র কবিতা-গুলিতে লিমেরিকেরও রস পাওয়া যাবে। এমনকি এডওয়ার্ড লীয়রের দু'একটি লিমেরিকের কথা মনে পড়াও অস্বাভাবিক নয়।

'খাপছাড়া'র কবিতাগুলি ছোটদের উপযোগী করে লেখা, এবং প্রত্যেকটিতেই হাসির ও আনন্দের খোরাক আছে। বিষয়বস্তুতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে, যা সাধারণতঃ ঘটে না, যা ঘটা সম্ভব নয়, যা সম্পূর্ণ অনুচিত তাকেই ঘটানো হয়েছে। অনুচিত বিষয়কে উপযুক্ত ছন্দের পোশাক পরিয়ে উজ্জ্বল মনোরম মিলের তক্‌মা এঁটে হাজির করা হয়েছে এমন কৌশলে—যাতে শুধু ছোটদের নয়, ছোটদের অভিভাবকবর্গকেও তৃপ্তি না দিয়ে পারে না। অদ্ভুত, আজগুবি সুন্দরের পোশাক পরে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ভোজবিদ্যায় পারদর্শী জাদুকর যেমন ধাঁধা সৃষ্টি করে জাদু দেখায়, কবি আজ ছন্দের সম্মোহিত জাদুবিদ্যায় তেমনি কথার তামাশা দেখাতে চেয়েছেন। বৃদ্ধ জাদুকর পথের ধারে চাদর বিছিয়ে যা-তা মন্ত্র আউড়ে চাদর তুলে ফেলে—তার মধ্যে থেকে অনেক কিছু বের করে, বেগুন, চড়ুইছানা, আমের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি, ধুনুচি—তেমনি বৃদ্ধ ছন্দজাদুকর ক্ষণকালের ভোজবাজীর ঠাট্টায় মেতে উঠলেন—যার ফসল হলো খাপছাড়া গ্রন্থ, আর গদ্য গল্প-গ্রন্থ 'সে'। জাদুকর চাদরের তলা থেকে অনেক কিছুর সঙ্গে নিচের সামগ্রীও বের করলেন—

'টুকরো বাসন চিনেমাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়কে কাঠির,
নলচে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠ্‌টা—
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।'

গ্রন্থ ভূমিকায় কবি তাই জানিয়ে দিলেন এখানে তাঁর আজগুবি রস নিয়েই কারবার।

এগুলিকে ঠিক 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের সগোত্র বা Nonsense verse বলা যায় না, খাপছাড়া একরকমের উদ্ভট বই বলা চলে। পারম্পর্যহীন অসংলগ্ন আতিশয্য নিয়ে কাব্যের নিয়মতান্ত্রিক ঔচিত্য রক্ষা করে এ এক নতুন ধরনের বিশেষ সৃষ্টি। সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গে গোত্রগত মিল খুঁজলে হয়তো একটা ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র বের করা চলে—তাও শুধু আয়তনের দিক থেকে।

হীরকখণ্ডের মধ্যে যেমন অলৌকিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে—কিংবা পাহাড়ের স্বভাব নির্ঝরের জলধারা যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাস বিকীর্ণ হতে করে আপন মনে—'খাপছাড়া'র কবিতাগুলির কাজ কতকটা সেই ধরনের।

অদ্ভুত ও হাস্যরসের প্রাধান্য বলেই বোধহয় ছোট গল্পের ক্ষেত্রে

হাস্যরসের রাজা পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু মশাইকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে; গল্পসাহিত্যে তিনি খাপছাড়ামূলক হাস্যরসকে পোক্ত করেছেন বলেই বোধহয় কবি তাঁকেই এই বই উৎসর্গ করেছেন।

'যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে সিদ্ধেব,
... ...
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বসিয়া'। 'খাপছাড়া'র ছড়াগুলিব সঙ্গে কবির আঁকা কিছু কিছু ছবিব সংমিশ্রণ ঘটেছে, তাতে বুইটির গৌরব আবো বেড়েছে। ছড়াগুলিব ছন্দেব আকর্ষণ যেমন, তেমনি আজগুবি রসেরও আমন্ত্রণ। তবে কয়েকটি ছড়া কিশোর মনের পক্ষে বসগ্রহণের অনুকূল নয়, যেমন—

ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিবাধার সত্যেবে ভজো রে।
এত বলি যত চায় শূন্যেতে ওড়াটা
কিছুতে কিছু-না-পানে পৌঁছে না ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
ছুটে মবে সাবারাত, ছুটে মরে সারাদিন—
হয়রান হয়ে আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।

'আমিহীন ঘোড়াহীন' যে-আত্মস্বরূপ—সেই 'আপনারে' শিশুদের 'নজরে' পড়ার কথা নয়। অবশ্য বেশীর ভাগ ছড়া—কবিতাই কিশোর

বয়সের উপযোগী। যেগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত, সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য দু' একটি ছড়ার উল্লেখ করি—

'পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী ;
বলে, 'পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি'।
শেষকালে একদিন
গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিড়ে
ভাসালো মা-গঙ্গায়,
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি—
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি।

কিংবা,

পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইট কিনি,
রাঁধুনিমহল-তরে করোগেট-শীট্ কিনি।
ধার ক'রে মিস্ত্রির সিকি বিল চুকিয়েছি,
পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত লুকিয়েছি,
শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিনরাত দুড়্‌দাড়্ কী বিষম শব্দ যে,
তিনটে পাড়ার লোক হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্‌খিট্ খিটকিনি।
কী করি না ভেবে পেয়ে মথুরায় দিনু পাড়ি,
বাজে খরচের ভয়ে আরেকটা পাকাবাড়ি,
বানাবার মতলবে পোড়ো এক ভিট কিনি।
তিনতলা ইমারত শোভা পায় নবাবেরই,

সিঁড়িটা বইল বাকি চিহ্ন সে অভাবেবই,
তাই নিয়ে গৃহিণীব কী যে নাক সিট্‌কিনি।

'খাপছাড়া' আব 'সে' একই সময়ে লেখা—একই মানস অনুবর্তন রয়েছে উভয় গ্রন্থে। উদ্ভট আজগুবি অসম্ভব দরিয়ায় কবি কল্পনার পান্সী ভাসিযে দিয়েছেন, তাই 'সে' গ্রন্থে তিনি এই জাতীয় গ্রন্থেব পবিচয় দিতে গিযে 'সে'-ব মুখ দিয়ে বলিযেছেন—"হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই, মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা কিছু।" গল্পেব সেই একটা 'একটা-কিছু'র ফসল 'সে', আর সেই মানসেব ফলশ্রুতি হলো 'খাপছাড়া'।[১] এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পী ও সমালোচক স্বর্গত নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উক্তি মনে পড়ছে, তিনি এই দুটি বই সম্পর্কে ('সে' এবং 'খাপছাড়া') বলেছেন—"প্রথম বইটিতে ব্রহ্মাব খেয়ালেব স্বপ্ন, দ্বিতীয়টিতে তাঁব পাগলেব অট্টহাসি। কিন্তু দুই-ই এক। অবসবেব আনন্দে, খেলাব খুশিতে, স্বপ্নেব জাল বোনবাব খেযালিপনায়, ববীন্দ্রনাথেব উত্তব-জীবনে এই বই দুখানিব আবির্ভাব।"[২]

ছড়ার ছবি

'ছড়ার ছবি'-র প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩৪৪ সাল (ইংরাজী ১৯৩৭)। এই গ্রন্থটি ছোটদের জন্যে লেখা কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলির মধ্যে কাহিনী আছে, এবং যেহেতু ছোটদের উপযোগী করে লেখা, কবি তাই এখানে ছন্দের প্রতি বিশেষ মনোযোগী। ছড়া লেখাই হয়তো কবির উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু গল্পরস জমে উঠেছে কাব্যের আশ্রয়ে, ফলে কবিতার মাধ্যমে লেখা ছোটদের উপযোগী এই ছবিগুলি নিয়েই তিনি 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থ রচনা করলেন। এখানে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের দোলা আছে, তার ওপর আছে অভাবিতপূর্ব মিলের অভিনবত্ব শিশুদের তো বটেই, বড়দেরও আনন্দ দেয় কবিতাগুলি। এ ছাড়া যারা একটু কল্পনাপ্রবণ, তাদেরও 'ছড়ার ছবি'-র গল্প-কবিতাগুলি পড়ে মনের দোরগোড়ায় কিছু কিছু ছবি জেগে উঠবে।

মূলতঃ ছোটদের জন্যে লেখা হলেও 'ছড়ার ছবি' যে বড়দেরও পাঠ্য এবং রীতিমতো আস্বাদ্য—সে ইঙ্গিতও কবি এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করে বলেছেন—"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।" উদাহরণ হিসেবে 'পিছুডাকা' কবিতাটির উল্লেখ করি। অস্ত-সাগরের তলায় অনেক সূর্য ডোবার পরিচিত জগৎ ও জীবনের অনেক কিছু হারানোর অদৃশ্য বেদনার উপলব্ধি ঠিক শিশুদের জন্যে নয়, তবু কবিতাটির শেষাংশে ছড়ার রস ঘন হয়ে জমে উঠেছে,—চির অপসুয়মাণ পলায়নতৎপর জগৎ থেকে চলে যাওয়ার বেদনাটুকুর ভার

অনেকখানি কমে যায়।

এই সময়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মতো 'ছড়ার ছবি'তেও কবির স্মৃতি-অনুধ্যান রয়েছে—'কাঠের সিঙ্গি', 'প্রবাসে', 'পদ্মায়', 'বালক', 'আতার যিচি' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায়। বাল্যস্মৃতির আবেশে কবি বিভোর। সে সম্পর্কে কবি নিজেও সজ্ঞান। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি সে কথা কবুলও করেছেন। "কিছুকাল হল, একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের।"[১]

ছড়ার জগতে সম্ভবের পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে অসম্ভব, কোথাও বাধো বাধো ঠেকে না। তাই ছড়ার জগতে অর্থসংলগ্নতার প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয় না, ছড়ার রস অজানিতকে হঠাৎ পাওয়ার এক বিচিত্র আনন্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, মনভোমরা তার খোঁজ পেলে তবেই না ছড়ার আনন্দ! কিন্তু সেই আনন্দ 'খাপছাড়া' গ্রন্থে যতটা পাওয়া যায়, 'ছড়ার ছবি'তে ততটা নয়।

বয়স্ক কবি এখানে যেন তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর স্মৃতিচারণায় হারানো শৈশব ফের ফিরে এসেছে,—তাঁর চেতন এবং অবচেতন মন যেন এক হয়ে গেছে। তাই 'ছড়ার ছবি'তে আনন্দ, বিষাদ, বিস্ময়, কারুণ্য—সব একাকার হয়ে ধরা পড়েছে।

'ছড়ার ছবি'র এক প্রচণ্ড আকর্ষণ হলো কবিতার সঙ্গে শিল্পী নন্দলাল বসু-র আঁকা ছবিগুলি। শব্দের রেখায় কবি যে চিত্র এঁকেছেন পড়ুয়ার মনের কল্পনার ক্যানভাসে, শিল্পী নন্দলাল সে কাজ সহজে তুলির টানে প্রত্যক্ষ করে ফুটিয়ে তুলেছেন, ফলে কবিতাগুলি যেমন বার বার পড়তে ইচ্ছা করে, তেমনি ছবিগুলিও দেখে আশা মেটে না, বার বার দেখার জন্যে মন ব্যাকুল হয়।

আলমোড়ায় বিশ্রাম নেবার জন্য গিয়ে কবি এই বইয়ের বেশীর ভাগ কবিতা রচনা করেন। চৌত্রিশ বছর আগে এই আলমোড়াতে বসেই

কবি 'শিশু' গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখেন। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও 'শিশু' এবং 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থদ্বয়ে একটা মিল দেখা গেল যে উভয় গ্রন্থেই কবি ছোটদের জন্যে কবিতা রচনা করেছেন।

'ছড়ার ছবি'র ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার শব্দ নিয়ে এর দেহ গড়া। চার মাত্রার পর্বযুক্ত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে লেখা। এই ছন্দের ডাকনাম হচ্ছে ছড়ার ছন্দ। চলতি ভাষার পুঁজি নিয়েই এই ছন্দের কারবার। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা— শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম। বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাত্‌লা আঁজ্‌লা, বাদ্‌লা, পাপ্‌ড়ি, চাঁদ্‌নি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক। সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়; বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।"

'জলযাত্রা' কবিতাটি চিত্রধর্মী, নৌকা করে শীতের বেলা থাকতে মহেশগঞ্জে যেতে হবে, পাশের গাঁয়ে ভাগ্নে বলাই থাকে, তার আড়তে খেতের নতুন কলাই বেচতে যাওয়া। সেখান থেকে বিবিধ কাজ সারা, বাদুড়ঘাটায় যদু ঘোষের দোকান থেকে খইয়ের মোয়া নিয়ে মালসি যেতে হবে, সেখানে দুপুরের আহারাদি সেরে—

> 'এক পহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,
> যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
> সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন,
> তার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাত্রিযাপন।'

পরদিনও প্রাতে পূর্বযাত্রা, নদীতে স্নান সেরে বালিতে রোদ্দুরে কাপড় শুকিয়ে নেওয়া, ভজনঘাটা গিয়ে বেগুনপটল, মুলো, সজনে ডাঁটা কেনা, কোকিলডাকা বকুলতলায় নিজের হাতে রান্না করা, কলাপাতায় খেয়ে নেওয়া। তারপর—

মাখ্‌নাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে ;
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন।

সুন্দর একটি ছবি, ছড়ার সুরে ধরা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি—ছোটদের উপাদেয় হলেও এই কবিতায় বড়দের খোরাকও কম নেই। শেষের দুটি পঙ্‌ক্তির যে ছবি—সন্ধ্যার বিস্ফারিত ঘনায়মান অন্ধকারে ভাঙা ডিঙির মতো দিন হেলে পড়েছে—তার রসে মনকে সিক্ত করতে যে সংবেদনশীলতার দরকার, ক'জনই বা সেই সংবেদনের অনুশীলন করে থাকেন ?

'ভজহরি' কবিতাটি অপেক্ষাকৃত মজার, এবং ছোটদেরই বেশী উপভোগ্য। ভজহরি-র কাজ পোষমানা পাখির জন্যে ফড়িং ধরে আনা। পাড়ার তামাম খাঁচার পাখিকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যেন তার,

কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান ;
অসুখ করলে হলুদজলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরত্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার, কেবলই ধরপাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।"

এ হেন ভজু ঘোষণা করলে তার মেয়ের বিয়ে।

'একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
"গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।"
শুনে আমার লাগল ভারি মজা—
এই আমাদের ভজা,

এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।

পাখির রাজ্যে ধুম পড়ে যাবে তখন। মোটা ফড়িং, ছাতুর সঙ্গে দই, ভিজে ছোলা দেব। ময়না লঙ্কা খেয়ে গলা খুলে চেঁচাবে, কাকাতুয়া চিৎকারে পাড়া মাৎ করবে, পায়রা বক্‌বকম্‌ করবে, শালিখ, কোকিল, চন্দনা—সকলের কূজনে কেউ মন্ত্র শুনতে পাবে না। 'ডাকবে যখন টিয়ে, বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে।'

এবার 'পিস্‌নি' কবিতা। কিশোর গাঁ ছেড়ে বিধবা পিস্‌নি বুড়ি চলে যাচ্ছে, একদা যখন তার ষোলো বছর বয়স ছিল, তার কদর ছিল। স্বামী মরতেই তার বাস অসহ্য হয়ে উঠলো। ছোট বোঝাটাকে অনেক অসম্ভব আশা দিয়ে বেঁধে সে বেরিয়ে পড়লো।

বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,
মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধূলির তলে।
সুধাই যবে, কোন্‌ দেশেতে যাবে
মুখে ক্ষণেক চায় সকরুণ ভাবে।

কখনো বা দ্বিধাভরে জবাব দেয়—আলমডাঙা, কি পাটনা বা কাশী যাবে। গ্রাম-সুবাদে এখানে কারুর সে মাসি বা দিদিমা হয়ে ছিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই এই অদরকারী বুড়িটি গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, পাছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে ফেলে—এই ভাবনায়।

'চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপ্‌সা যে তার মন,
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।

পিস্‌নি বুড়ির বিষণ্ণ একটি ছবি ফুটে উঠেছে এই কবিতায়, জীবনের অবসন্ন গোধূলি বেলায় বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে পিস্‌নির গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার করুণ চিত্রটি সত্যিই মনকে ব্যথাতুর করে তোলে।

'কাঠের সিঙ্গি' রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও এই কাঠের খেলনাটির উল্লেখ আছে, (আরও একটা লেখা

ছিল সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে।[২]) এর বলিদান প্রসঙ্গে শিশু কবি যে মন্ত্র রচনা করেছিলেন—তারও উল্লেখ আছে—

সিঙ্গি মামা কাটুম্,
আন্দিবোসের বাটুম্,
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম কুড়কুড়
আখরোট বাখ্‌রোট খট্‌খট্ খটাস—
পট্ পট্ প্‌টাস্।[৩]

সেই কাঠের সিংহ নিয়ে শিশু বয়সে তাঁর পৌরুষমাখা খেলার বিবরণ দিয়েই এই কবিতায় সে ছবিটি আঁকা হয়েছে।

'ঝড়' কবিতাটি ঝড়ের বর্ণনা দিয়ে শুরু। আকাশে ও নদীতে ঝড়ের রূপ কি এবং দখল নেবার পদ্ধতিই বা কি রকম—তারই সহজ সুন্দর বর্ণনা। প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই এক একটি আল্‌গা ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন—

'বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনিটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চমকে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।'

'খাটুলি' আসলে কিন্তু খাটিয়াকে নিয়ে লেখা নয়, খাটুলিতে যে করুণ দরিদ্র বৃদ্ধটি বসে, আপন মনে যে ফেলে আসা জীবনের হিসেব নিকেশ করে কখনো সখনো—তারই এক বিষণ্ণ ছবি হলো ওই কবিতাটি। কাজকর্মের পরে অবসর সময়ে বটগাছতলায় খাটুলির ওপর আপন মনে সে এসে বসে।

'আমের কাঠের নড়্‌নড়ে এক তক্তপোষের 'পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের সেলাই করা কাঁথা।'

তার নাতনী চলে গেছে, কিন্তু নাতনীর পোষা ময়নাটির তদারক করার ভার তার ওপর, নাতনীর মতো কচি গলায় ওকে দাদু বলেই ডাকে ঐ ময়নাটি। জীবনের আরো বিপর্যয় ও বিষণ্ণতার তালিকা আছে, ছেলে পচে মরছে জেলে দাঙ্গা করার অপবাধে। মেয়ের বিয়ে দিতে হয়তো

গোরুই বেচতে হবে।

ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ওই বছরের শেষে—
শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে।

কবিতাটির অংগী রস করুণ। কবি জীবন-সায়াহ্নে বসে পিছনের দীর্ঘ গোটা জীবনের দিকে তাকিয়ে কি অসহায় কারুণ্যের দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন? এই গ্রন্থের শেষ কবিতা 'আকাশ প্রদীপ' কবিতাটিও করুণ রসে ভরা।

'ঘরের খেয়া' কবিতাটির উপলব্ধি অল্পবয়সীদের জন্য নয়, অনন্তের, মধ্যে নিজের স্থান কোথায়—তার উপলব্ধিই হচ্ছে এই কবিতার মূল কথা। বাসার সন্ধানে আমরা চলি বটে, কিন্তু ঠিক কি বাসার সন্ধান পাওয়া যায়?

যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।
হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে,
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের খবর জানে।

কিন্তু সংসারী মানুষ তার গন্তব্যস্থলের খবর কি জানে? কিংবা, কবি নিজের যাত্রাপথের হদিস পাচ্ছেন না—সেই ইঙ্গিত আছে?

'যোগীনদা' কবিতাটি চিত্রধর্মী বটে, আবার চরিত্রধর্মীও। যোগীনদাদা মিলিটারি জরিপের কাজের পর শিশুদের আসর জাঁকিয়ে বসলেন। ছোটদের সকলেই তার স্নেহভাজন। ষাটবছর পার করলেও যোগীনদার দেহ ছিল বেশ শক্ত। চওড়া কপাল, মাথায় টাক ইয়া বড় গোঁফ। সন্ধ্যার সময় আজগুবি কত গল্পই না হত। যোগীনদাদার জীবনের এক কাহিনীই এই কবিতার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে, কি করে জৌনপুরের হারানো এক রাজপুত্র ভেবে তাঁকে সসম্মানে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হলো, আর কি করে সেখান থেকে তিনি এলেন

পালিয়ে—রাজপুত্র হওয়া যে সহজ কাজ নয়—তা দেখে, সেই গল্প দিয়েই কবিতাটির উপসংহার।

'বুধু' গাঁয়ের মোড়ল, দুচার কথায় কবি তার চরিত্রটি উপস্থিত করেছেন এখানে। এই জাতীয় রচনায় ছোট গল্পের আমেজ আসে। অচিন্তিত-পূর্ব সমাপ্তির চমক থাকে না বটে, কিন্তু চরিত্রচিত্রণের বিন্যাসে গল্পের রস পরিবেশন করাই লেখকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যোগীনদা-র প্রসঙ্গেও একথা সম্পূর্ণ খাটে, বুধুর বেলাতেও খাটে।

সাতপুরিয়া গ্রামের মোড়ল বুধু বড্ড কৃপণ। তার নাতি মোগলু নাতিটার জন্যে। গুটি তিনেক নাতির মৃত্যুর পরে এটি এসেছে। তাই সে তার নয়নমণি। এই নাতিটার জন্যেই সে খরচ করতে পারে না, তার যা-কিছু তা যে সব ঐ মোগলুরই।

পয়সাটা তার বুকের রক্ত, কারণটা তার ওই—
এক পয়সা আর কারো নয়, ঐ ছেলেটার বই।

পাছে মোগলুকে দেবতা কেড়ে নেন তাই তাকে ডাকনামেই ডাকা হয়, ভালো নাম রাখা হয় নি, নিষ্ঠুর দেবতাকে ফাঁকি দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

'চড়িভাতি' কবিতাটির গোড়াতে ছোটদের চড়িভাতি করার আনন্দ, একটা দিনের বন-ভোজনের নিষ্কলুষ চিত্র, যে যার আনা বিভিন্ন রকমের ডাল চাল মিশিয়ে চড়িভাতি করতে বসছে, কেউ ঘটি ভরে জল আনে, তিন কন্যে রান্না করার কাজে লেগে যায়!

'সকল-কর্ম-ভোলা
দিনটা যেন ছুটির নৌকা বাঁধন-রশি-খোলা'

এই রকম একটি দিনের আনন্দ-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবির মনে পড়ে আদিম যুগে—মানুষ যখন দেওয়াল তোলে নি প্রকৃতির বুকে,—তখনকার পৃথিবীর দাক্ষিণ্য কত উদার ছিল! সহজ একটি ছবি আঁকতে গিয়েও কবি সৃষ্টির আদিম যুগের প্রকৃতির অবারিত প্রান্তরের বিষয়টির প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রীতি নিবেদন করেছেন।

'কাশী' কবিতাটি ছোট গল্পেরই সগোত্র, ছোটদের উপযোগী করে ছন্দে বলা। যোগীনদা-র মুখে ছোট বয়সে শোনা এই গল্প। রাত্রে চোর চুরি করতে এলে খুড়ি কি করে তাকে জব্দ করেছিলেন, সেই খবর থেকে. যোগীনদা নিজে একবার গুণ্ডা দলে পড়েছিলেন কাশীতে, কি করে সেখান থেকে ছাড়ান পেলেন—তার রোমাঞ্চকর কাহিনীই এখানে বর্ণিত হয়েছে। কবিতাটিতে ছোট গল্পের সরসতাই সবত্র ছড়িয়ে আছে।

'প্রবাসে' কবিতাটি চিত্রধর্মী। কবির মন বিদেশে ঘুরতে চায়। তিনি বঙ্গদেশের বাইরে গেলেন বেড়াতে, পথের দৃশ্য কথার রেখায় সুন্দর হয়ে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। আলমোড়ায় বসে তাঁর মনে পড়েছে এই রকম এক বিদেশ ভ্রমণ, সেখানকার প্রবাসী জীবনও তাঁর স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল—

অশথতলায় বসে তাকাই ধেনুচারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে।

'পদ্মায়' কবিতাটিও স্মৃতি-চিত্র। পদ্মার তীরে এবং পদ্মার উপর কবির যে দিনগুলি কেটেছে—তার কথাই তিনি মনে করছেন। শুধু প্রকৃতির ছবি ও পরিবেশের ছবিই এখানে আঁকা হয়েছে। পদ্মার তীরে অলস দিনের উড়নিখানা আকাশ থেকে মায়া-মন্ত্রের স্পর্শ দিয়ে যেত কবির মনে।

'বালক' স্মৃতি কথায় পূর্ণ। 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি তাঁর বাল্যকালের যে বর্ণনা দিয়েছেন, 'বালক' কবিতায় তারই অনুরণন। সামান্য একটু-আধটু বর্ণনার হেরফের ঘটেছে এই মাত্র, যেমন—

'কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে ;
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।'

এই 'কঙ্কালী চাটুজ্জে' কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'র 'কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়'। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে—"এ হেন সঙ্কটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্জ্যে আসিয়া দাশু রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি

দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূবণ করিয়া গেল।"

'দেশান্তবী' কবিতাটি চিত্রধর্মী বটে, কিন্তু এখানে খেটে খাওয়া মানুষেব প্রতি কবিব সহানুভূতিবই প্রকাশ ঘটেছে। গাঁয়ে আকাল—সংসার চালাতে না পেবে গাঁয়েব একজন মানুষ দেশান্তরে যাচ্ছে গ্রাসাচ্ছাদনেব আশায়, ছেলে বউ মা রইলো গাঁয়ে, অন্ততঃ দিন-মজুবের যে কোনো একটা কাজ জুটে যাবে, এই আশাতেই—

দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্যজয়ে,
মা ডাকে না পিছুব ডাকে অমঙ্গলেব ভযে।

'অচলা বুড়ি' কবিতাটিতে অচল বুডিব অপূর্ব চবিত্রেব বর্ণনা সহজ কথায প্রকাশ করা হযেছে। অচল বুডিব প্রাণে দযামায়া আছে, গাড়ি চাপা পড়া মুমূর্ষু কুকুরকে পথ থেকে কুডিয়ে তাব প্রাণ বাঁচায়, নিজেব কাছে রাখে, অন্ধ মযেকে সে নিজেব ঝি যেব কাজ দেয়। সাঁতরাপাড়াব এক কাযেত বাড়ব এক বিধবা মেয়ে যখন পিতৃহীন হলো, ভাইযেবা যখন তাকে দেখলো না, তখন অচলী বুডিব উদ্যোগ আব চেষ্টায় সে হাসপাতালে বোগীব সেবাব কাজে বহাল হয়ে গেল, এতে গাঁয়ের লোক মেযেটাকে জাতিচ্যুত করলেও তাব প্রতি অচল বুড়ির আদব একটুও কমলো না।

সে বলে, "তুই বেশ কবেছিস যা বলুক-না যেবা,
ভিক্ষা মাগাব চেযে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।"

রাইডোমনিব ছেলে জমিদাবের মায়েব শ্রাদ্ধে বেগার খাটতে যেতে পাবে নি নিজেব কাজেব চাপে, তাই তাকে ডাক-লুঠেব এক মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ফেলে সাত বছবেব মেয়াদে জেলে পাঠানো হল।

'ছেলেব নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি
ডোম্‌নি গেল ভিন্‌ গাঁয়েতে, পাততে নতুন বাড়ি।'

অচল বুডি প্রতি মাসে তাকে মাসকাবারেব জিনিস কিনে দিয়ে আসে।

বুড়ি বললে, "যারা ওকে দিল দুঃখরাশি
তাদেব পাপেব বোঝা আমি হাল্কা করে আসি।"

দিনরাত জেগে পাতানো এক নাতনীর রোগের সেবার পর অচল বুড়ির শরীর ভেঙে গেল, দেবতা তাকে ডেকে নিলে। দেখা গেল—তার জমানো সব টাকা সে রাইডোম্নিকে দিয়ে গেছে, অন্ধ ঝি-কে তার অন্য সব জিনিসপত্রের সঙ্গে কুকুরটিকেও দিয়ে গেছে।
'সুধিয়া' কাহিনী কবিতা। শিউনন্দন সম্পন্ন গোয়ালা, কিন্তু অনাবৃষ্টি মন্বন্তর এবং শেষে শোণ নদীর বন্যায় তার ঘরবাড়ি গেল ডুবে, গোরু-গুলো সব ভেসে গেল। তিনটে শিশুর খোঁজ নেই, তার স্ত্রীও ভেসে গেছে। তার জোয়ান এক ছেলে—সামরু তার নাম—সে প্রথমে খোঁজ করে তিনটে গরু নিয়ে এল, পরে আরো পাঁচটি গরু উদ্ধার করে আনলে।

এ দিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এগোয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনাপাওনা দিনরাত্রি জোয়ার-ভাঁটা খেলে।

এদিকে দুনিয়াচাঁদ বেনে তার দশ বছরের ছেলেকে সঙ্গে করে মাল-পত্তরের তদন্তে এল, ছেলেটা বায়না ধরলে—ঐ সুধিয়া গাইটা তার চাই, সে পুষবে।

সামরু বলে, "তোমার ঘরে কী ধন আছে কত
আমাদের এই সুধিয়াকে কিনে নেবার মতো।"

দুনিয়াচাঁদেরও জেদ বেড়ে গেল, বললে—দেখো, দু-চার মাসের মধ্যেই সুধিয়ার ঠাঁই আমার গোয়াল ঘরে।
সামরুর ছিলো পালোয়ানের নেশা, নবাব বাড়ি থেকে ভিন্‌দেশীর সঙ্গে কুস্তি লড়ার নিমন্ত্রণ এল। সামরু বাবাকে বলে গেল—সাতদিনের ভেতর ফিরবো, এই কটা দিন সুধিয়াকে দেখো। কিন্তু এক হপ্তা পরে ফিরে সে দেখে যে দুনিয়াচাঁদ ডিক্রী জারি করে সুধিয়াকে নিয়ে গেছে। ভোজালি হাতে তখনই সামরু ছুটলো সুধিয়াকে ফিরিয়ে আনতে :

"সুধিয়া রে" "সুধিয়া রে" সামরু দিল হাঁক,

পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।

চেনা সুরের হাম্বাধ্বনি কোথায় জেগে উঠে,

দড়ি ছিঁড়ে সুধিয়া ওই হঠাৎ এল ছুটে।

দুনিয়াচাঁদ তো রেগে আগুন। সামরু বললে—টাকায় দুনিয়া কেনা যায়, কিন্তু পশুর ভালবাসা কেনা যায় না, সুধিয়া নিজের ইচ্ছায় যদি থাকে, সামরু রেখে যাবে, কিন্তু সুধিয়ার সে ইচ্ছে নয়, সামরু বললে—পুলিশ ডাকতে চাও ডেকো, দশ বছর না হয় জেল খাটবো, ফাঁসিরও ভয় করিনে, কিন্তু সুধিয়াকে রেখে যেতে পারছিনে।

'মাধো'-ও কাহিনীমূলক কবিতা, তবে মাধোর চরিত্র এতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে মুক্তপ্রাণ, প্রকৃতির পটভূমিকে সে পছন্দ করে। তার বাবা জগন্নাথ রায়বাহাদুর কিষেণলালের বাড়ির স্যাকরা; মাধোকে চেষ্টা করেও জগন্নাথ গয়না গড়াবার কাজ শেখাতে পারে নি। সে আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে ফাঁকা মাঠে খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে। কিষেণলালের ছেলের বেয়াদপি সহ্য না করে তার বেত ভেঙে দিয়েছে, ফলে তার ওপর নির্যাতন হয়েছে, দেশ ছাড়া হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। সেখানে গিয়ে সে ঘর বেঁধেছে, ছেলে-বউ নিয়ে সংসার করেছে, জুটমিলে কুলির সর্দারির কাজ নিয়েছে। কিন্তু ধর্মঘটের সময় সাহেবের হুকুমমতো সে বেইমানি করতে পারে নি; মাধো বলেছে—"সবাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"

মাধো বললে, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,

অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।"

তারপর সে সপরিবারে নিজেই দেশে ফিরে গেল।

পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি,

ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি॥

'আতার বিচি' কবিতাটি স্মৃতিমূলক। শিশুকালের কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ছোটদের উপযোগী করে কবি ছোটবয়সের যথার্থ ঘটনারই বর্ণনা করা হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তেও তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন—

"বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে একথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় ও ঔৎসুক্য জন্মিত।" 'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

আতার বিচি পুঁতে তা থেকে গাছ এবং পরে ফল কি করে হয়—তা দেখার কৌতূহল ছিল বালক-কবির। দোতলার পড়ার ঘরের বারান্দার কোণে ধুলোবালি জড়ো করে বিচি পুঁতেছিলেন, পড়ার চেয়ে কবির মনোযোগ সেদিকেই বেশী ছিল।

পড়তে পড়তে বারে বারে চোখ যেত ওই দিকে,
গোল হত সব বানানেতে. ভুল হত সব ঠিকে।

মাসছয়েকের মধ্যে বিচি অঙ্কুরিত হলো, শিশুকবি নাম দিলেন 'আতাগাছের খুকু'।

কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচি কচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড,
আমার পড়ার ত্রুটির জন্য দায়ী করলেন ওকে,
বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে।

একটু সবুর করলে কি ক্ষতি হতো, দুদিন বাদেই ও শুকিয়ে যেত! এই কবিতায় শিশুমনের রহস্য রূপ পেয়েছে।

'মাকাল' কবিতাটি লঘু সুরের, একেবারে ছেলেদের উপযোগী, আলমোড়ায় 'ছড়ার ছবি'র অন্যান্য কবিতাগুলি লেখা হলেও এটি প্রায় বছর ছয়েক আগের লেখা।

শ্রীযুক্ত রাখাল দ্বিতীয়ভাগ শেষ করতেই ছ'মাস নাকাল হওয়ায় গুরুমশাই রাগ করে তার নাম দিলেন—মাকাল। রাখাল তো ভারি খুশি এই নাম পেয়ে, বাড়িতে দাদা বললে—তোকে গুরুমশাই গাল দিয়েছেন।

রাখাল বলে, "কথ্খোনো না,
মা যে আমায় বলেন 'সোনা'

সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে।

আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব চলো তো ঐখানে।

রাখাল দাদাকে টেনে নিয়ে গেল পুকুর পাড়ের কাছে, যেখানে মাকাল ফলে আছে। রাখাল বললে—গাল বুঝি গাছে ফলেছে? রাখাল খুব খুশী—দোয়াত কলম খাতা নিয়ে লাইন টেনে সে শুধু লিখে চলেছে—মাকাল চন্দ্র রায়।

কবিতাটি কৌতুক রসে ভরা। হাসির কবিতায় অনাবিল পরিচ্ছন্নতার একটি সহজ সুর 'মাকাল' কবিতাটিকে আনন্দময় করে তুলেছে।

'পাথরপিণ্ড' কবিতাটি কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক, ছোটদের উপযোগী করে লেখা। কবি আলমোড়ায় গেছেন বিশ্রাম করতে, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে, কিন্তু বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়কে সহজ করে পরিবেশন করার জন্য লিখেছেন 'বিশ্বপরিচয়'। এই কবিতাতেও সেই আমেজটুকু ধরা পড়েছে।

প্রস্তরময় সমুদ্রতীরের পাথরপিণ্ড মাথা উঁচিয়ে আকাশকে যেন ঢুঁ মারতে চায়, কিন্তু আকাশ শান্ত থাকে, কোনো জবাব দেয় না, এবড়ো-খেবড়ো পাথরপিণ্ডের আকৃতিটা যেন ঢুঁ মারার মতো।

ঢুঁ-মারা এই ভঙ্গীখানা কোটিবছর থেকে

ব্যঙ্গ ক'রে কপালে তার কে দিল ওই এঁকে।

পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস বের করেছেন খুঁজি;

শুনি তাহা, কতক বুঝি নাইবা কতক বুঝি।

নীহারিকাপিণ্ড থেকে খসে পড়া পাগলা বাষ্পরাশি শূন্য থেকে ধরিত্রীতে এসে জেঁকে বসলো—

দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে

আড়ষ্ট এক পাথর হয়ে কখন গেল জমে।

তার চিৎকার স্তব্ধ হলো। যার পাথায় আগুন ছিল, আজ সে মাটির খাঁচায় বন্দী, ঢেউএর কলস্বর শোনার জন্য তার ব্যগ্রতা, তার ব্যর্থ বধিরতারই নামান্তর মাত্র।

'তালগাছ' নিয়ে কবির আরো কবিতা আছে, কিন্তু এই কবিতায় তালগাছ সম্পর্কে কবির কল্পনা মুক্ত পক্ষ হয়ে যথেচ্ছ বিহার করছে। তালগাছ তার সঙ্গিনী শ্যামল ছায়াকে নিয়ে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে দূরে তাকিয়ে থাকে, সে যে মাটির সঙ্গী নয়—এমনতর তার ভাব। সে তারার দিকে চেয়ে থাকে, জোনাকিদের পাত্তা দেয় না, তাদের প্রতি গভীর অবহেলা দেখায়।

উলঙ্গ সুদীর্ঘ দেহে সামান্য সম্বলে
তার যেন ঠাঁই ঊর্ধ্ব বাহু সন্ন্যাসীদের দলে।

'শনির দশা' কবিতাটি গম্ভীব চালে লেখা বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন হাসির রসে ভরা। আধবুড়ো একজন বিদেশবাসী কর্মচারীর আপাত গম্ভীর মুখ দেখে মনে করা গেল বুঝি বা বাড়ি যাবাব জন্যে সে ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো ওর কন্যা উমারানীব ছেলেব অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ওকে বাড়ি যেতে লিখেছে, কিন্তু বড়সাহেব মাসকাবারের অনেক কাজ বাকী বলে ছুটি মঞ্জুব করেন নি, তাই দুর্ভাবনায় সে বুঝি কাতর। কিন্তু না, তাকে জিজ্ঞাসা করে জবাব পাওয়া গেল যে সে শনির দশায় আছে।

বললে বুড়ো, "কিচ্ছুই নয়, মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়।
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকা বাজি ফেলে দেবার।

রেসের টিকিট কেনা নিয়েই ভাব দুর্ভাবনা। বেশ নাটকীয় চমকের মধ্যে দিয়েই কবিতাটির উন্মোচন এবং সমাপ্তি।

'রিক্ত' কবিতায় প্রকৃতির ছবি আঁকা হয়েছে। কখনো খরা, কখনো ঝরা। শূন্য বিজন মাঠে শীর্ণতোয়া নদী বালির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে, কখনো তাতে বন্যা। শুধু নদী নয় প্রকৃতির সর্বত্র কখনো রুক্ষতা, কখনো উগ্রতা।

'বাসাবাড়ি' কবিতাটির মধ্যে কবি চাপা বেদনার কারুণ্যকে প্রকাশ করেছেন। বাসাবাড়ির সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

পান্থশালায় বিশ্রামের মতোই ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়াটেরা অবস্থান করে—

চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি, কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস ;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউ বা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।

কবি যেন জিজ্ঞাসা করেন—এখানে কি সত্যি কেউ আছে, সত্যি কি এখানে জায়গা পাওয়া যাবে? তাঁর মনে হয়, যেন জবাব এল—"আমরা নাই নাই।"

সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।

সকলের কাজে, কথায়, জীবনস্পন্দনে ওই একটি ধ্বনি—"আমবা নাই, নাই।" কেন যে এখানে এসে জুটেছে, কারও কোনো সত্ত্বস্তব নেই। এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে যে কেউ আসে নি, বাসাবাড়ির মতোই এই পৃথিবী—এখানে চারিদিকে না থাকার বেদনাহত সুর—এইরকম একটা তাৎপর্য কবিতাটিতে অনায়াসে আরোপ করা চলে।

'আকাশ' কবিতাটির গোড়ার দিকে স্মৃতি, শেষের দিকে ঝড়ের মূর্তির রূপ। ছোটবয়সে দেয়াল-ঘেরা ঘরের কোণ থেকে দেখা আকাশ। লুকিয়ে ছাদে গিয়ে আকাশের সোনার রঙ চুরি কবা--ব্যাকুল চোখ দুটি নীল অমৃতের সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া—কবির মনে পড়ছে। শেষের দিকে ঝড়েব আকাশের রূপ-বর্ণনা।

আবার যখন ঝঞ্ঝা, যেন প্রকাণ্ড এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল।

'খেলা'তে যেমন প্রকৃতির রূপবর্ণনা, তেমনি বিশ্বজগতের খেলার নিয়মের মূল তত্ত্বের কথা। বিশ্বস্রষ্টা কাজের সঙ্গে খেলাকে মিশিয়ে রেখেছেন, তাঁর সাম্রাজ্যে কাজও চাই, খেলাও চাই। প্রকৃতির রাজ্যে তাই দেখা যায়—

ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে—
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথার থেকে পেলে।

আল্‌মোড়ার হিমালয়ের কোলে কবি প্রকৃতির এই খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

'ছবি-আঁকিয়ে' কবিতাটি শিল্পীর প্রতি কবির এক হিসেবে স্বীকৃতি তথা অভিনন্দন। তুচ্ছ, অবহেলিত এবং অনবহিত যা—তা যে মোটেও দেখার অযোগ্য নয়—তুলির রেখায় শিল্পী তা রচনা করেন। রাজা মহারাজা অর্থের দৌলতে নিজেদের ছবি আঁকান, কিন্তু তাতে সাজ-সজ্জার ঔজ্জ্বল্য চোখকে ধাঁধায়, কিন্তু শিল্পী যখন সাধারণ মানুষের রূপ শিল্পে ধরে রাখেন—তা যথার্থ আর্ট হয়ে ওঠে।

ওই যে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম,
নেই বললেই হয় ওরা সব, পৌঁছে না কেউ নাম—
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো।
অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো।

একটি ছাগলের ছবিকে উপলক্ষ করেই এই কবিতাটি লেখা। এই কবিতাটির বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন—"আর্টিস্টের দৃষ্টিশক্তির অপরূপ রহস্যের কথা ব্যক্ত হইয়াছে ছোটো এই কবিতাটির মধ্যে। সাধারণ লোকের দৃষ্টি যাহাদের উপর পড়ে না, সেই অভাজনদের দল জীবন্ত, অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে শিল্পীর তুলির লিখনে। শিল্পীর রূপসৃষ্টিকে কবি আজ শব্দের প্রতীকদ্বারা ছন্দের সাহায্যে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছেন।"[৪]

'অজয় নদী' চিত্রধর্মী কবিতা, একদা প্রবল নদী বালির চাপে নিজের আসন ছেড়ে অনুচরের মতো বালির আনুগত্য স্বীকার করে নিলে,

শুধু বর্ষার ঘোলাজলের প্রতাপে নিজের ক্ষণিক উন্মত্ততা, তারপর আবার শরতে শুভ্রতার উৎসবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না, নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অজয়।

'পিছুডাকা' কবিতায় প্রচ্ছন্নভাবে কবির ফেলে-আসা জীবনের প্রতি মমতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি চলে যাওয়ার বেদনাও বুঝি ধরা পড়েছে। প্রকৃতির সাজানো ঘরে মানুষের কীর্তির স্থান বড়ই সাময়িক। যা-কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ, তার চিরন্তন অপূর্বতায় শক্তি-মানের অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয় হারিয়ে যায়।

ওই যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

'ভ্রমণী' কবিতায় কবি মাটির কাছাকাছি যেসব মানুষ—ঘরছাড়া হয়ে পৃথিবীর বুকেই যাদের হাঁটাচলা, যারা অপথেও পথের খোঁজ পায়, কোনো মানা যারা মানে না—তাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বীজয়ী।

'আকাশপ্রদীপ' কবিতাটি কারুণ্যে ভরা। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগ্রন্থে একই সুরের কবিতা সংকলিত থাকে না, রচনা কালানুক্রমিক ধারা অনুসারে কবিতাগুলি গ্রন্থভুক্ত, বিষয়ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়ে ওঠে না; তাই ছড়ার ছবি-তে এই কবিতাটি হৃদয়কে বেদনাভারাতুর করে তোলে, এই বইয়ের অন্য কবিতাগুলির সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি আছে এর সঙ্গে, ফলে 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যচ্যুত নয়।

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাতৃহীন একটি বালিকা আকাশ প্রদীপ

জ্বালিয়ে দিয়েছে এই বিশ্বাসে যে তার মা ঐ প্রদীপের খেয়া বেয়ে স্বর্গ থেকে অচেনা কত নদনদী জনপদ পেরিয়ে ছোট্ট দুটি ভাইবোনকে বুঝি অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে,
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরেব থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
বাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে।

—

নির্দেশিকা

অবতরণিকা

১. 'সন্ধ্যা সংগীতের ভূমিকা
২. 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের ভূমিকা
৩. 'বলাকা'র ৩৭ নম্বর কবিতা
৪. 'সোনার তরী'র 'মানস-সুন্দরী' কবিতা
৫. 'কল্পনা'র 'অশেষ' কবিতা
৬. 'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতা
৭. 'আরোগ্যে'র ৩৮ নম্বর কবিতা
৮ Father as I knew him (The Viswa Bharati Quarterly, 1953)
৯. রবীন্দ্র-জীবনী (তৃতীয় খণ্ড, ১ম প্রকাশ)--শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১০. 'পরিশেষে'র 'বর্ষশেষ' কবিতা
১১. 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ১৩ নম্বর পত্র
১২. 'পরিশেষে'র 'জন্মদিন' কবিতা
১৩. 'পরিশেষে'র 'প্রণাম' কবিতা
১৪. 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতা
১৫. 'সেঁজুতি'র 'পরিচয়' কবিতা
১৬. গণতন্ত্রের কবি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিচয়' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২৭
১৭. রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য (পৃঃ ২২)—ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ
১৮. 'কবিতা' আশ্বিন ১৩৫৩ সাল
১৯. রবীন্দ্রনাথ (৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৮)—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

পরিশেষ

১. কবিকথা (পৃঃ ১১৯)—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

২. রবীন্দ্র-জীবনী (তৃতীয় খণ্ড, ১ম প্রকাশ)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৩০৮)

৩. 'যাত্রী' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৩৬)

৪. রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ২৯৮)

৫. ঐ ঐ ঐ (পৃঃ ৩১৪)

৬. ঐ ঐ ঐ (পৃঃ ৩১৯)

৭. ঐ ঐ ঐ (পৃঃ ১৮০)

৮. 'যাত্রী' (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৯. 'পথে ও পথের প্রান্তে' ২৬শে ভাদ্রে (১৩৩৫) লিখিত পত্র

পুনশ্চ

১. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস (১ম সং পৃঃ ৪১৭)

২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (২য় খণ্ড, ২য় সং পৃঃ ৪০৯)

৩ বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম সং পৃঃ ২১২)

৪. তদেব (পৃঃ ২১৩)

৫. 'পুনশ্চে'র ভূমিকা

৬ তদেব

৭. প্রবাসী, ১৩৪৩ আষাঢ় সংখ্যা (পৃঃ ৪৫৩)

৮. ১৭ মে ১৯৩৫ তারিখে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্র (দ্রষ্টব্য —'ছন্দ' গ্রন্থ পৃঃ ২১০)

৯. রবীন্দ্রনাথ—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (পৃঃ ১৩৮)

১০. 'পথে ও পথের প্রান্তে'—৩৯ সংখ্যক পত্র

১১. 'পূরবী'র 'আশা' কবিতা

১২. নির্বাণ—প্রতিমা ঠাকুর (পৃঃ ৪-৫)

১৩. তদেব (পৃঃ ৬)

১৪. 'পথে ও পথের প্রান্তে'—৩৮ সংখ্যক পত্র

১৫. রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩০)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৬. তদেব

১৭. তদেব (এটি ভ্রমবশতঃ ১৭৫ পৃঃ '১৪' সংখ্যক বলে মুদ্রিত হয়েছে)

বিচিত্রিতা

১. রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (পৃঃ ৩৮৯)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
৩. রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০১)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫. কবি মানসী (পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচায

শেষ সপ্তক

১. চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড)—৫৭নং পত্র
২. বাংলা সাহিত্যের কথা (পৃঃ ২২৪)—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪. চিত্রগীতময় রবীন্দ্র-বাণী (পৃঃ ২৪১)—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
৫. পথে ও পথের প্রান্তে—২৭নং পত্র (রবীন্দ্র রচনাবলী-দশম খণ্ড, পৃঃ ৮২৭)
৬. বাংলা সাহিত্যের কথা (পৃঃ ২০৯-২১০)—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (পৃঃ ২৫৪)—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
৮. তদেব (পৃঃ ২৬০)
৯. রবীন্দ্র-জীবন (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১০. 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতা।
১১. বাংলা সাহিত্যের কথা (পৃঃ ২২২)—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২. ভানু সিংহের পত্রাবলী'র ৫৪নং পত্র (রবীন্দ্র রচনাবলী—একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩)

বীথিকা

১. কবি-মানসী (পৃঃ ৩৭৩)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
২. রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবংগ সরকার, ১০ম খণ্ড পৃঃ ৫৪৮)
৩. কবি মানসী (পৃঃ ৩৯১)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
৪. রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ২৩)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯০)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
৬. কবি-মানসী (পৃঃ ৩৭৯)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
৭. রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৮. 'ছেলেবেলা'

৯. কবিমানসী (পৃঃ ৩৮৮)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

১০. রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১১. চিঠিপত্র (৪র্থ খণ্ড)—৬৬নং পত্র

১২. রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পত্রপুট

১. রবীন্দ্র সাহিত্যেব ভূমিকা (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৭)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

২. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী (পৃঃ ২৬৪)—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

৩. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭)—ডঃ নীহারবঞ্জন রায়

৪. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় (পৃঃ ৪৩৫)—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

৫. ঈশোপনিষদ ১৫

৬. রবীন্দ্র বচনাবলী (পঃ বঃ সরকার ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩) পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

৭. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস (পৃঃ ২৭২)

৮. রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮০)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায

৯. তদেব (পৃঃ ৫৫)

শ্যামলী

১. রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯ —শ্রীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়

২. প্রবাসী, ১৩৪২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

৩. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী (পৃঃ ২৭৭)—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

৪. তদেব (পৃঃ ২৭৭)

৫. ববীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমা (২য় সং, পৃঃ ৭১৫)—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৬. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (পৃঃ ২৭৮)—ডঃ ক্ষুদিবাম দাস

৭. কবি-মানসী (পৃঃ ৪০২)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

৮. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (পৃঃ ২৮০)—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

৯. ববীন্দ্রকাব্য পবিক্রমা (পৃঃ ৭১৯)—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১০. কবি-মানসী (পৃঃ,৪০৪)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

১১. 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতা

খাপছাড়া

১. সে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. কথা কোবিদ্ রবীন্দ্রনাথ (পৃঃ ৮৮)—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছড়ার ছবি

১. 'ছেলেবেলা'র ভূমিকা

২. 'ছেলেবেলা'

৩. তদেব

৪ রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৯)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরবর্তী প্রকাশন

সঞ্জীব-রচনাবলী

সম্পাদনা

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়